ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বেদের নানা স্থান হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া অগ্নির সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের একটা প্রত্যয় জন্মানর চেষ্টা করিয়াছি। সর্ব্বভূতেই প্রাতনিয়ত যজ্ঞ বা অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে—এ কথাটার প্রমাণ যথাসম্ভব নব্য বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করিতে কসুর করি নাই। অগ্নিকে তাপ ভাবিলে কথাটা চলিয়া যাইতে পারে,—সৌদামিনী ভাবিলে ত আর কথাই নাই। নব্য বিজ্ঞানে একেশ্বরবাদ প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, এবং বিজ্ঞান যে এক দেবতার অর্চ্চনায় সম্প্রতি মন-প্রাণ সবই ঢালিয়া দিতেছেন, সে দেবতা সৌদামিনী। এই বিদ্যুৎ বা সৌদামিনীর এলেকার বাহিরে কোনও জগৎ মানিতে বিজ্ঞান যেন গররাজি! অণুগুলার প্রসূতিও এই সৌদামিনী। অগ্নিকে তাড়িত ভাবে লইলে, অণুগুলার অন্দরমহলেও অগ্নিকাণ্ড প্রতি-নিয়ত চলিতেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের নাম radiation বা তেজোবিকীরণ। সেদিন অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ বুঝিতে গিয়া আমরা এই আণবিক অগ্নিকাণ্ডের কতকটা সমাচার লইয়াছিলাম। রেডিও-একটিভ পদার্থগুলিতে তেজো-বিকীরণের মুখ্য ত্রিধারা আমরা বিশেষভাবে ধরিতে পারি। সেদিন সেই মুখ্য ত্রিধারার নক্‌সা আঁকিয়া আপনাদের দেখাইয়াছিলাম। এই আণবিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে অণু-গুলা খণ্ডিত, বিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং রেডিয়াম বোধ হয় এই বিশ্বব্যাপী পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কল্যাণে ইউ-রেনিয়াম নামক পদার্থান্তর হইতে জন্মিয়াছেন। তাঁহার ভিতরেও যজ্ঞ অবিরত চলিতেছে; ফলে তিনিও অন্য-কিছু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছেন। এই বিরাট যজ্ঞ না হইলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় না। কারণ, রেডিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম প্রভৃতি দু'চারিটা জিনিসেই এই আণবিক অগ্নিকাণ্ড এবং ঢালাই গড়ন আবদ্ধ নহে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেছেন, অল্পাধিক মাত্রায় এই কাণ্ড-কারখানা সম্ভবতঃ নিখিল পদার্থের অন্দর-মহলেই চলিতেছে। শুধু

দ্বিজ বলিয়া নহে, প্রত্যেক ভূতই সাগ্নিক। অগ্নিকে কেবল তাপ (heat) ভাবিলে এতখানি ব্যাপক ভাবে দেখা আমাদের সম্ভব হইত না; কিন্তু তাড়িত মনে করিলে আর কোথাও আমাদের "প্রবেশ নিষেধ" নাই। তাপ জোর মলিকিউল, অণুগুলা কাঁপাইয়া পার পায়; কিন্তু তাড়িত শুধু পাখা ঘুরাইয়া, আলো জ্বালিয়া, ট্রাম চালাইয়া পার পান না—অণুর ভিতরেও একটা ছোট-খাট জগৎ চালাইতেছেন। এর বিশেষ বিবরণ আমার শ্রোতৃবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই রাখেন। এখন, প্রত্যেক ভূতেই যে তেজোবিকারণ হইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক ভূতেরই যে নূতন ভাবে ঢালাই-গড়ন হইতেছে, এ কথার কিঞ্চিৎ প্রমাণ আপনারা বিজ্ঞান হইতে লইয়া রাখুন। এ-ভূত ও-ভূত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখার প্রবৃত্তি বা সুযোগ আমাদের নাই; তবে শিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উক্তি শুনাইলে আপনাদের প্রত্যয় হইবার কথা। Whetham বলিতেছেন—'it is impossible to resist wondering whether the process of change, so far observed to an appreciable extent only in a few radio-active bodies, may not in reality be a general property of matter, though in other cases possessed in such infinitesimal degree that it almost transcends the delicate means of detection that are now at our disposal. As we have seen, experimental evidence is not altogether wanting in favour of such a supposition." Sir Ernest Rutherford সাহেব এ শাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি এবং আরও অনেকে, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে—"ordinary matter is radio-active to a slight degree" অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত ভূতেই তেজোবিকীরণ ব্যাপারটা একটু আধটু চলিতেছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন—"A number of experiments have been made by J. J. Thomson, N. R. Compell, and A. Wood in the Cavendish Laboratory to examine whether radio-activity observed in ordinary matter is a specific property of such matter or is due to the presence of some radio-active impurity. An account of these experiments was given by Professor J. J. Thomson in a discussion on the Radio-activity of Ordinary Matter at the British Association meeting at Cambridge, 1904. The results, as a whole, support the view that each substance gives out a characteristic type or types of radiation and that radiation is a specific property of the substance." পুনশ্চ, ৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—"While the experiments, already referred to, afford strong evidence that ordinary matter does possess the property of radio-activity to a feeble degree, it must not be forgotten that the activity observed is excessively minute, compared even with a weak radio-active substance like uranium or thorium." অর্থাৎ নিখিল বস্তুজাতের মধ্যেই আণবিক বিপ্লব ও তেজোবিকীরণের একটা পরিচয় আমরা নিঃসন্দেহ রূপে পাই বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অনেক পদার্থেই সেটা খুবই মৃদু। মাটি, জল, বাতাস—সর্ব্বত্রই যেন এই গুপ্ত অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে; কিন্তু সব ক্ষেত্রে এখনও জোর করিয়া বলা যায় না—আগুনটা ভিতর হইতেই জ্বলিয়াছে, অথবা বাহির হইতে আসিয়া লাগিয়াছে। ধরুন, বাতাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা রেডিও-এক্‌টিভ, অর্থাৎ, তাহা হইতে প্রধানতঃ তিনটি ধারায় তেজোবিকীরণ হইতেছে। মনে প্রশ্ন উঠে—এ তেজ কি বাতাসের নিজের; অথবা ইহা আগন্তুক? বাতাসে রেডিয়াম প্রভৃতি ভেজাল জিনিসের তৈজস-কণাগুলি ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সেই ছড়ানো তেজটাকে আমরা বাতাসেরই নিজস্ব মনে করিতেছি না ত? চাঁদের নিজের কিরণ নাই, তিনি সূর্য্য হইতে ধার করিয়া বসন্ত ঋতুর মধুমাসে এত বাহার দিতেছেন; বাতাসের অবস্থাও কি এইরূপ নয়? পুষ্প-পরিমল বহন করেন বলিয়া বাতাস ত গন্ধবহ হইয়াছেন; বাতাসে গন্ধ

পাইয়া সে গন্ধ বাতাসেরই মনে করিয়া তাঁহার 'সুগন্ধি' ইত্যাদি বিশেষণ দিতে গেলে বৈয়াকরণেরা এখনই আমার কাণ মলিয়া দিতে উদ্যত হইবেন। গন্ধের বেলা যেমন চুরি, রেডিও-এক্‌টিভিটির বেলাও তেম্‌নি চুরি নয় ত? এ সমস্যার সমাধান যে শক্ত, তাহা রাদারফোর্ড-প্রমুখ সাহেবেরা স্বীকার করিয়াছেন; কতকটা যে চুরি সে পক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'উপরি' বাদ দিলেও পবনঠাকুরের ন্যায্যগণ্ডা স্বরূপ কিছু তেজ থাকে না কি? বোধ হয় থাকে, ইহাই বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। শুধু বায়ু নহেন, জল পৃথিবী প্রভৃতি আমাদের বৈদিক দেবতারা সত্য সত্যই স্বাধীন ভাবে কতখানি দেবতা (কি না, "দ্যুতিমান্") তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিস্তর সওয়াল-জবাব করিতেছেন। অবশ্য, তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'দ্যুতি' বা 'তেজ' মানে বৈদ্যুত-শক্তি-বিকীরণ-সামর্থ্য। ক্যাভেন্‌ডিশ্‌ ল্যাবরেটারি হইতে সর্দ্দার চেলার (রাদারফোর্ড সাহেবের) প্রতি আমরা সংগ্রহ করিলাম; এইবার স্বয়ং গুরু-মহারাজের (জে, জে, টম্‌সন সাহেবের) "আদেশ" শুনুন। তাঁহার প্রসিদ্ধ Conduction of Electricity through gases নামক গ্রন্থের একটা অধ্যায়ই হইতেছে—The power of the elements in general to emit ionising radiation. সেই অধ্যায়ের প্রায় গোড়াতেই তিনি প্রশ্ন তুলিতেছেন—"The question arises—is the property of emitting radiations of this character Confined to these elements, or is it possessed, though to a very much smaller extent, by the elements in general? Of late years a considerable amount of attention has been given to this question, resulting in the collection of a large amount of evidence in favour of the view that this property is possessed to some extent by all bodies, although there seems to be a great gap between the amount of radiation emitted by the least active of the recognised radio-active elements and the most active of the others." ফল কথা, অল্প হউক বিস্তর হউক, নিখিল ভূতের মধ্যেই এই প্রকার অন্তর্বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ চলিতেছে; তবে সর্ব্বত্র সমান ভাবে নহে। আর অধিক মতোদ্ধার করিয়া কাজ নাই, হালের প্রায় সকল বিজ্ঞান-গ্রন্থ হইতেই এই জাতীয় উক্তি রাশি রাশি আপনাদের শুনান যাইতে পারে।

এই তেজোবিকীরণ যে পদার্থের মধ্যে ঘরওয়া বিপ্লবের ফল, একেবারে আগন্তুক কোনও ব্যাপার নহে, এ কথার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা একরূপ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ, বেদ যে অগ্নিকে জলে, স্থলে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে, ওষধি সমূহে, দ্যুলোকে "নিগূঢ়" ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, সে অগ্নির কাণ্ডকারখানা শুধু স্থূল জগতে নয়, অণুর মধ্যেও বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহাদের বিশেষ জানিবার কৌতূহল আছে, তাঁহারা রাদারফোর্ড সাহেবের Radio-activity নামক গ্রন্থ, সডি সাহেবের Interpretation of Radium and the Chemistry of the Radio elements নামক গ্রন্থদ্বয়, অথবা Makower's Radio-active substances নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন। পদার্থ-নিচয়ের ভিতর হইতে এই যে তেজোবিকীরণ, তাহা অণুর ব্যাপার বলিয়া, যেন আপনারা তুচ্ছ ভাবিবেন না। অণুর রাজ্যে হইলে কি হইবে, ইহাদের তেজ মহান্। জনৈক গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"In mechanical units the energy available for radiation in one ounce of radium is sufficient to raise a weight of something like ten tons and tons one mile high." পুনশ্চ—"it is possible to calculate the energy liberated by a given amount of radio-active change. This energy is at least five hundred thousand times, and may be ten million times greater than that involved in the most energetic chemical action known." একটা টর্পেডো বা মাইন ফাটিয়া পুরু ইস্পাতে মোড়া একখানা প্রকাণ্ড রণতরীকে ছাতু করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে; কামানের একটা গোলা আসিয়া পড়িয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দিতে পারে। এই গেল খুব তেজাল রকমের কেমিকাল এক্‌সন্। কিন্তু সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এটমের মধ্যে যে শক্তি থাকিয়া বিপ্লব ঘটাইতেছে এবং তেজো-

বিকীরণ করিতেছে, সে শক্তির বিপুলতার কাছে টর্‌পেডো মাইন বা গোলার মাহাত্ম্য একরূপ 'নাই' হইয়া যায়। সামান্য এক রত্তি রেডিয়াম এত প্রচুর তাপ (heat) জাগাইয়া রাখিতে পারে যে, শুনিলে আমরা বিস্ময়ে 'হতভম্ব' হইয়া যাই। পরিমাণ আপনাদের এখন না হয় নাই শুনাইলাম।

অতি সূক্ষ্মের মধ্যে অতি বিপুলকে আবিষ্কার করিতে পারিয়া নব্য-বিজ্ঞান বোধ হয় মানব-জাতির সাধনার একটা নূতন অধ্যায়ের পত্তন করিয়া দিতেছে। সামান্য একটু পদার্থের মধ্যেই, এমন কি একটা রেণু বা অণুর মধ্যেও, এমন বিরাট শক্তি রহিয়াছে যে, আগে স্বপ্নেও এমন একটা কাণ্ড কল্পনা করিতে কেহ সাহস করিত না। এটম এত ছোট যে, খুব সম্ভবতঃ এক গ্র্যাম্ ওজনের কোনও কঠিন বস্তুতে ১০২০ (দশের পিঠে কুড়িটা শূন্য দিলে যত হয় তত) এটম রহিয়াছে। এটমের চেয়ে দু'দশ হাজার গুণ ছোট ইলেক্‌ট্রনগুলা সেই এটমের ভিতরে ছন্দোবদ্ধ ভাবে পাক খাইতেছে; সময়ে সময়ে বা মেজাজ হারাইয়া ছট্‌কাইয়া আসিতেছে; এইরূপ ভাবে ছট্‌কাইয়া আসিলে এটমের মধ্যে বিপ্লব হইল, এবং এই ব্যাপারটাকে আমরা মোটামুটি radio-activity বলিতেছি। ভাল; কিন্তু ঐ ইলেক্‌ট্রনদের বা হিলিয়াম এটমদের গতির বেগ ভীষণ! প্রায় আলোকের বেগের কাছাকাছি যায়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় দু'লাখ মাইল; আইন্‌ষ্টাইন্ প্রভৃতির হিসাবে এর চাইতে বেশী নাকি জড় পদার্থের বেগ হয় না। যা হউক, কতখানি কার্য্যকরী শক্তি (kinetic energy) এটমের ভিতর খেলিয়া যাইতেছে, তাহার একটা আভাস পাইলেন ত? যে সব বৈজ্ঞানিকদের নাম আমি মাঝে মাঝে করিতেছি তাঁহারা এবং আরও অনেকে, উক্ত কাইনেটিক্ এনার্জির হিসাব, পরীক্ষা ও গণাগাঁথা করিয়া, তৈয়ারি করিয়াছেন; আমরা আনাড়ী —সে হিসাব অডিট্ করার দুঃসাহস রাখি না। তবে স্বীকার করিয়া রাখি যে, হিসাবের অঙ্কগুলার পানে তাকাইয়া আমাদের 'চক্ষুস্থির' হইয়া গিয়াছে। একটা রেণুর মধ্যে এ কি কাণ্ডকারখানা, কত বিপুল শক্তির বিলাস! এইটা বিজ্ঞান সম্প্রতি ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া, মানুষের চিন্তা ও সাধনার মোড় ফিরিবার উপক্রম বুঝি হইয়াছে, এবং বোধ হয় বেদে ও বিজ্ঞানে, সেকেলে ঋষিতে আর একেলে 'সাভান্টে' কোলাকুলি হইয়া যাইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

বর্ত্তমান যুগে পাথুরে কয়লা মুখ্যত আমাদের শক্তি যোগাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেদিন অগ্নিতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই পাথুরে কয়লার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। এখন বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের দৃষ্টি শক্তি-সাধনা ও শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য নূতন এক দিকে ফিরিবে। ইলেক্‌ট্রন, রেডিয়াম প্রভৃতি আসরে নামিয়া সে সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছে। মানুষ এখন ভাবিবে—অণুর ভিতরে যে বিরাট শক্তির খেলা হইতেছে, সে শক্তির সন্ধান ত পাইলাম; এখন সে শক্তিকে ব্যবহারে লাগাইব কি উপায়ে? একটা ধূলির ভাণ্ডারে এতখানি শক্তি মজুত যে সেই শক্তিকে আমার আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে আমি প্রায় একজন ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর হইয়া বসিতে পারি। এটা বৈদিক বা পৌরাণিক আজগবি কল্পনা নহে, আধুনিক বিজ্ঞানেরই একটা রীতিমত চিন্তার বিষয়। অণুর ভিতর শক্তির বিপুলতা যে কেমন, তাহার কতকটা আভাস আমি পূর্ব্বেই আপনাদের দিয়া রাখিয়াছি। এই বিশ বছরের মধ্যে এত পরীক্ষা ও গণাগাঁথা হইয়াছে যে, সে পক্ষে আমাদের আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, সাংখ্যের পুরুষের মত এই অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার আমরা শুধু দেখিতেই পাইতেছি; এ ভাণ্ডার আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করার কোনও উপায় বিজ্ঞান এখনও ঠাওরাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এ শক্তির ব্যবহার শিখিলে বিজ্ঞান পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে আর নোংরা করিবে না। তার প্রয়োজন হইবে না। পিপা পিপা পেট্রল পোড়াইয়া মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতি চালানর হাঙ্গামাও চুকিয়া যাইবে। আমাদের যা কিছু কাজ, জলে হউক, স্থলে হউক, আর অন্তরীক্ষে হউক, চলিবে ঐ আণবিক শক্তির সাহায্যে। এ ছাড়া আরও অনেক অসাধ্য-সাধন বিজ্ঞান করিতে পারিবে ঐ আণবিক শক্তির কল্যাণে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম দেশের কল্পনাকুশল লেখকেরা এই শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর চেহারা যে কি ভাবে কতখানি বদ্‌লাইয়া যাইবে, তার আন্দাজ

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের এই কলিকাতা সহরে এবং গঙ্গার দুই ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত মিলের চিম্‌নি অনবরত কৃষ্ণ ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া আমাদের এই সোণার বাঙ্গলার প্রসন্ন স্নিগ্ধ আকাশ বাতাসকে কতই না নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে; কিছুকাল পূর্ব্বে জাহ্নবী-সলিলে অবগাহন করিতে আসিয়া, চারিদিকে চাহিয়া প্রাচীনেরা সত্য সত্যই অনুভব করিতে পারিতেন সেই ঋগ্‌বেদের আকাশ, বাতাস, সরিৎ—যাহারা মধুক্ষরণ করিতে কৃপণতা জানিত না। দেশের মাটি, হাওয়া, জল হইতে যে মধু ক্ষরিত হইত, তাহাতে মানুষের দেহে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য, প্রাণে অভয় ও আশা, মনে সন্তোষ ও আনন্দ এবং বুদ্ধিতে নির্ম্মলতা ও ধৈর্য্য সঞ্চার করিয়া দিত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ"—বৃথা আপ্‌শোষ করিয়া কি হইবে? কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞান শক্তির যে নূতন হদিশ পাইয়াছে, তাহাতে আবার প্রাণে আশা হয়—বুঝি বা সেকাল নূতন সাজে ফিরিয়া আসিবে; পাথুরে কয়লার খনিগুলা জলে ভরিয়া যাইবে; মিল-ফ্যাক্‌টরীর লম্বা লম্বা চিমনিগুলা লজ্জায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে।

এ সবই সম্ভবপর হয়, যদি কোনও উপায়ে আমরা অণুর ভিতরকার শক্তিটাকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারি। বিজ্ঞান এ শক্তির সন্ধান পাইলেও, ইহার ব্যবহার এখন পর্য্যন্ত শিখিতে পারে নাই। এক টুক্‌রা রেডিয়ামে যে শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনই উপায় এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। রাদারফোর্ড সাহেব রেডিও-এক্‌টিভিটির লক্ষণ দিতে গিয়া বলিতেছেন, ইহা পদার্থের মধ্যে এক প্রকার স্বাভাবিক (Spontaneous) বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ। X-rays, ultra-violet rays প্রভৃতির কতকটা বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে এই বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ ঘটাইয়া দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; যেখানে স্বভাবতই হইতেছে, সেখানেও আমরা হিসাব লইয়াই খালাস; সেখানে আমরা আমাদের শাসন বা হুকুম চালাইতে পারি না। এই বিপ্লব বাড়াইয়া দিব বা কমাইয়া দিব অথবা একেবারে থামাইয়া দিব, এমনটা অধিকার আমরা এখনও পাই নাই। সাহেব লিখিতেছেন—"We are led to refer the energy liberated (in radio-active changes) to transformations in the chemical atoms, and to recognise clearly, what has long been suspected, that the store of energy in the atoms themselves enormously transcends the energy involved in ordinary physical or chemical changes, in which the atoms suffer no alteration. This internal atomic energy must be looked on as the source of the heat detected experimentally by Curie in the neighbourhood of a radium compound." Atomic energy বা আণবিক শক্তির পরিমাণও খুবই শুনিলাম, কিন্তু মুস্কিল ইহাই যে, ইহাকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিতেছি না। সাধারণ সমস্ত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে এবং তাপ প্রভৃতি যাবতীয় জড়শক্তির নিয়োগে, এই অণুর অন্দরের ব্যাপারটার কোনই পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায় না। রাসায়নিক ক্রিয়ার সাড়া অণুর অন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না বোধ হয়; রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action) আস্ত আস্ত অণুগুলাকে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কারবার করে; অণুর ভিতরকার জগৎ তার এলাকার বাহিরে। অণুকে এখানেই রাখ আর ওখানেই রাখ, এর সঙ্গেই যুড়িয়া দাও আর ওর সঙ্গেই যুড়িয়া দাও, তার ভিতরের যজ্ঞটা নিরুপদ্রবে চলিয়া যায়। বাহিরের জগৎটা অবশ্য সে যজ্ঞের ফলভাগী হইতেছে; কিন্তু বাহির যেন সে ভিতরের যজ্ঞের সহায়তা কোন মতেই করিতে পারিতেছে না; বাহির ভিতরের দান গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু ভিতরকে যেন কিছুতেই প্রতিগ্রহ করাইতে পারিতেছে না। কথাটা শুনিতে হেঁয়ালির মতন, কিন্তু সত্য। অণুর অন্দরের হোমের ফলে বাহিরে তাপ, আরও কত কি, অজস্র ছড়াইয়া পড়িতেছে; কিন্তু বাহিরের তাপ, আলোক, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি কোন ব্যাপারই ভিতরের ব্যাপারটার সাধক বা বাধক হইতে পারিতেছে না। রহস্য ইহাই। তাপের খবরটা নিন। "An alteration in the physical conditions, such as temperature, which always largely influence the course of ordinary physical and chemical

changes, seems, throughout an extended range, to be entirely without effect on the processes involved in radio-activity. Heating to redness, or exposure to the extreme cold of liquid air, equally leave the activities we are considering untouched. অণুর সংসারের যিনি মালিক তিনি কেমনধারা শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, তাহা শুনিলেন ত? ভীষণ উত্তাপে অথবা ভীষণ শীতে অণুর মর্ম্মস্থলে কোনই চাঞ্চল্য হয় না। তরল হাওয়া বেজায় ঠাণ্ডা; তার চেয়েও বেশী ঠাণ্ডায় অণুর ভিতরে কোন রকম কাঁপুনি দেখা যায় কি না, তাহার পরীক্ষার জন্য রেডিয়ামের আবিষ্কর্ত্তা কুরি ১৯০৩ সালে বিলাতে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে আসিয়া কিছু খাটিয়াছিলেন। তরল হাইড্রোজেন তরল হাওয়ার চাইতেও ঠাণ্ডা। এই তরল হাইড্রোজেনে রেডিয়ামের কাজের কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, ইহাই দেখার সাধ ছিল। খুব সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া পরীক্ষকেরা রায় দিয়াছেন। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—"Whether or not the increase they then observed be confirmed by further experiments, it seems certain that, till we thus approach the absolute zero (that is,—273°C) all the activities of radium are quite independent of temperature. Such extra-ordinary results as these point to a deep-seated difference in kind between the radio-active processes and all chemical and physical operations hitherto investigated." রেডিয়াম জাতীয় পদার্থসমূহের যে তেজোবিকীরণ (এবং যে তেজোবিকীরণ অল্পস্বল্প ভাবে নিখিল সামগ্রাই করিতেছে বোধ হয়), তাহা যেন একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের ব্যাপার। আমরা এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞানে যে সব রকম ব্যাপার লইয়া ঘাঁটিতেছি, ইহা যেন মোটেই সে রকমের নয়। ইহা অণুর ভিতরে সৃষ্টি ও সংহার লীলা। সে কথায় পরে আসিতেছি, এখন প্রশ্ন এই—আণবিক শক্তি খুবই প্রচুর; আবার না কি ভারি স্বাধীন মেজাজের; বিজ্ঞানাগারে কোন উপায়েই তাহাকে বাগ মানাইয়া বশে আনিতে পারিতেছি না। যেদিন পারিব সে দিন পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইবে; বোধ হয় অণিমা লঘিমা প্রভৃতি কোন সিদ্ধিই মানুষের করায়ত্ত না হইয়া থাকিবে না। কিন্তু উপায় কি করা যায়? বৈজ্ঞানিকেরা ভয়ে ভয়ে আশা অনেকই করিতেছেন। "It seems unlikely that radium will ever be cheap enough for us to use its energy to develop mechanical power, but it is just possible that the phosphorescence of sensitive screens in the neighbourhood of a radio-active body may some day be employed as an effective source of light. In this way luminous effects would be obtained directly from a store of energy self-contained and practically inexhaustible, whereas, in all our present arrangements, light is derived from a hot body, and large quantities of energy are necessarily wasted in maintaining the incandescence." এখন সামান্য একটু আলো জ্বালিতে হইলে অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হয়; কিন্তু আণবিক শক্তিকে যদি আলো জ্বালানর কাজে লাগাইয়া দিতে পারি, তবে লাভ হইবে দুই দফা। প্রথমতঃ, এমন একটা ভাণ্ডার পাইলাম, যেখান হইতে যত খুসি খরচ কর, ভাণ্ডার রিক্ত হইবে না। অণুর ভাণ্ডার অফুরন্ত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা পোড়াইয়া বা বাতি পোড়াইয়া আলো হয় বটে, কিন্তু আলোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা তাপও হয় এবং সে তাপটা নিষ্কর্ম্মা ভাবেই চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ, কয়লা পোড়াইয়া যতখানি শক্তি জাগাইলাম, তার সামান্য এক ভগ্নাংশ আমার আলো জ্বালিয়া দেয়, তার বেশীর ভাগই বাজে খরচ হইয়া যায়। কিন্তু আণবিক শক্তি দ্বারা রোশ্‌নাই করিতে পারিলে এতটা বাজে খরচ না হইবার কথা। উদাহরণ সামান্য জোনাকি পোকা। সারা রাত্রি ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর জোনাকি রোশনাই করিতেছে, যেখানে যাইতেছে রোশ্‌নাই অঙ্গে মাখিয়া যাইতেছে! এক পয়সা তেলের খরচ নাই। সে রোশ্‌নাইএ ঝাঁজ নাই,

তাত নাই। তুমি আমি মাসে মাসে পঞ্চান্ন টাকা গণিয়া দিয়া দুচার ঘণ্টার জন্য যে রোশ্‌নাই পাই, তার ঝাঁজই কত, তাতই বা কত! জোনাকি পোকা বোধ হয় যাদু জানে। সে না কি আণবিক শক্তিকে নিত্য ব্যবহারে আনিতে শিখিয়াছে। রেডিয়ামের তেজোবিকীরণের পথে একটা উপযুক্ত পর্‌দা (sensitive screen) টাঙ্গাইয়া, আমরাও কথঞ্চিৎ এই প্রকার তাপহীন-আলোক-সৃষ্টির যাদু দেখাইতে পারি। ইহাকে phosphorescent effect বলে। সার ওলিভার লজের নাম শুনিলেই ভূতুড়ে কাণ্ড সাব্যস্ত করিয়া বসিবেন না। তিনি জাঁদরেল বৈজ্ঞানিক, কিছুদিন পূর্ব্বেও British Associationএর president ছিলেন। তিনি জোনাকির যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে কি লিখিতেছেন শুনুন (Modern Views of Electricity, p. 473)—Can it be that the light emitted by the glowworm—which is true light and not technical radio-activity and yet which accompanied by something which can penetrate black paper and affect a light-screened photographic plate—is emitted because the insect has learnt how to control the breaking-down of atoms, so as to enable their internal energy in the act of transmutation to take the form of useful light instead of the useless form of an insignificant amount of heat or other kind of radiative effect; the faint residual penetrating emissions being a secondary but elucidatory and instructive appendage to the main luminosity?" জোনাকি পোকার আলোর সঙ্গে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের তেজোবিকীরণের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য সাহেব দেখাইলেন; দেখাইয়া প্রশ্ন তুলিলেন—জোনাকির কলেবরে যে আণবিক বিপ্লব চলিতেছে, যে আণবিক শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহাকে কোনও উপায়ে ব্যবহারে আনিতে পারিয়াছে বলিয়া কি জোনাকির অঙ্গে অমন অপরূপ স্নিগ্ধচ্ছটা? নইলে এমন কোমল, স্নিগ্ধ রোশ্‌নাই ফুটিয়া উঠে কিরূপে? জোনাকি লইয়া প্রশ্ন বটে, কিন্তু প্রশ্নের গুরুত্ব নিতান্ত সামান্য নহে। মানবের কর্ম্মধারা বা সাধনা এখন কোন্ প্রণালীতে চলিবে, ইহাই সমস্যা। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনই কূল-কিনারা পাইতেছি না। পশ্চিমদেশের সভ্যতা অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া চলিতেছে। শ্রেয়ের পথ বড়ই গহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত দিন কেমিকাল ও মেকানিকাল শক্তি লইয়া আস্ফালন চলিতেছিল; এখন দেখা যাইতেছে যে তাহা মানুষকে বাহিরের গোলাম, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে, অশক্তই করিয়া ফেলে। ওপথে শান্তি নাই, কল্যাণ নাই। এই সমস্যার মুখে রেডিয়ামের অবতার হইয়াছে। রেডিয়াম যেন শ্রীভগবানের কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্ম হাত-পা গুটাইয়া একটা নিরীহ মাটির ঢেলার মত পড়িয়া আছে, কিন্তু ঐ শক্ত খোলার মধ্যে প্রাণ আছে, বেদনা আছে, শক্তি আছে, সব আছে। আমরা এত দিন পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতগুলাকে "ছোটলোক" ভাবিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলাম; একটা ধূলিরেণু—সে আবার একটা "মানুষ", তাকে আবার গ্রাহ্য করিতে হইবে! কিন্তু রেডিয়াম-অবতার অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুটি চোখেরই ঠুলি ক্রমশঃ খুলিয়া দিতেছেন। এক চোখে আমরা দেখিতেছি—ধূলিরেণু বা এটমের মধ্যে এত বড় একটা শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। তার সাহায্যে একটা সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলাকে লইয়া চরাইয়া বেড়ান যায়। ইহার নাম atomic energy, ইহার বিশালতার অবধি নাই বলিলেই হয়। আর এক চোখে আমরা দেখিতেছি—প্রত্যেক পদার্থের রেণুতে রেণুতে যে অগ্নিকাণ্ড, যজ্ঞ বা বিপ্লব চলিতেছে, তাহার ফলে এক জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া কালে অন্য জাতীয় পদার্থ হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ, অগ্নিকাণ্ড নিখিল ভূতের অন্তঃপুরে অহর্নিশ একটা সৃষ্টি ও সংহারের লীলা জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ভূতই অজর অমর নহে; সকলের মধ্যেই, ধীরে-সুস্থেই হউক আর তাড়াতাড়িই হউক, একটা ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে—এক ভাঙ্গিতেছে, আর কিছু গড়িয়া উঠিতেছে। এই ভাঙ্গন-গড়ন (নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য সংহার) এরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রেডিও-এক্‌টিভিটি।

আচ্ছা, চোখের ঠুলি ত খুলিল, এদিকে মনে সাধও হইয়াছে—এই নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য সংহার ব্যাপারে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর আমরা হইব। অর্থাৎ, আণবিক শক্তিভাণ্ডার হইতে আমরা শক্তি সঞ্চয় করিব—শুধু ভাড়ার দেখিয়া আর চলে না। এ ভাণ্ডার লুটিতে পারিলে আমরা পাথুরে কয়লা, পেট্রল, আরও ছাইভস্ম কত-কি'র হাত হইতে রেহাই পাইব। কেমিকাল ও মেকানিকাল শক্তির দাসত্ব ছিঁড়িয়া ফেলিব। সিদ্ধ পুরুষের মত একটুখানি

ধুনির ছাই বা ধুলো লইয়া, তাহার ভিতর হইতেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া, সকল কাজ হাঁসিল করিব। বর্ত্তমান যুগে ইহাই আমাদের সাধ ও সমস্যা। পাথুরে কয়লা প্রভৃতিতে অরুচিও হইয়াছে, অণুর ভাণ্ডারের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপও ত করিতেছি; কিন্তু উপায় কি? এ আঁধারে গহন বনে পথ খুঁজিয়া লইব কিসের আলোয়? ঐ জোনাকির কি? প্রশ্ন শুনিয়া হাসিবেন না। আমাদের দেশের যোগীরা প্রকৃতির পশুপক্ষীদের কাছ হইতে অনেক গুহ্য যোগ-রহস্য শিখিয়াছিলেন। ভেক প্রভৃতি সরীসৃপেরা শীতের দিনে গর্ত্তের ভিতর কেমন করিয়া নিরাহারে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা দেখিয়া এবং তাহারই অনুশীলন করিয়া, যোগীরা কুম্ভক, খেচরী মুদ্রা, জড় সমাধি প্রভৃতি কত অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভাবনার মধ্যে আনিয়া গিয়াছেন। জোনাকিও আমাদের গুরু হইতে পারে। সার ওলিভার লজ হয় ত বর্ত্তমান যুগকে গুরু-পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহার প্রয়োজনও হইয়াছে—বর্ত্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার কথা আমরা খোলসা করিয়াই বলিয়াছি। রেডিয়াম অবতারের কথা এবং শ্রীমতী জোনাকির রূপচ্ছটার কথা আপনাদিগকে বিজ্ঞানাগার হইতেই শুনাইলাম। এইবার চলুন সিদ্ধাশ্রমে। বিজ্ঞানাগারে যাহা শিখিলেন তাহা যেন ভুলিবেন না।

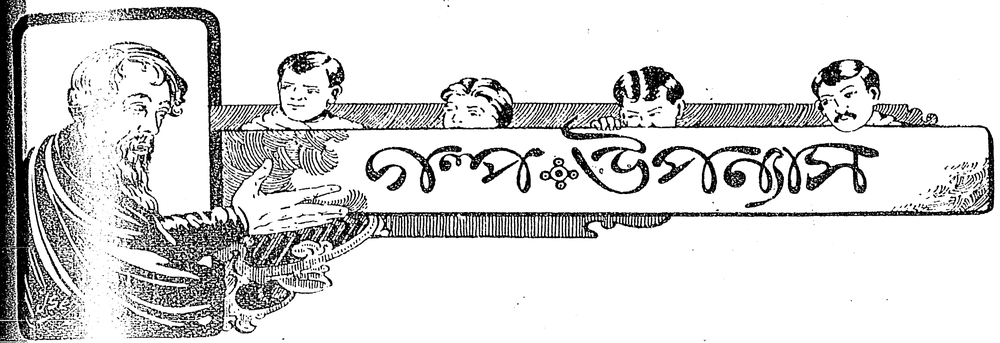

কুলবধূ

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২)

পড়িতে বসিয়া রেখার মন আজ কিছুতেই তার বইয়ের ভিতর বসিল না। আজকার দিনের সমস্ত ঘটনা কেবলি ঘুরিয়া ফিরিয়া তার মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। বায়স্কোপের ছবির মত সৌরীনের চলন্ত চিত্র তার সামনে সেই আততায়ী যুবকের দিকে তাড়া করিয়া গেল, রেখার সম্মুখে আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল, তার সম্মুখে সৌজন্যের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া মিষ্ট সম্ভাষণে তাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল, রেখার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল, তার সঙ্গে ট্রামে আসিল, তার সঙ্গে বসিয়া চা' খাইল। বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে চক্ষের সম্মুখে এই চিত্রের পুনরভিনয় করিয়া গেল—তার ক্লান্তি হইল না, তৃপ্তি হইল না।

রেখার রূপের দাবী মোটেই নাই। সে রীতিমত কালো। তার মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে যে লাবণ্য আছে, তাহা তার কালো বক্ষে এতটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে যে, সহসা তাহা কারও নজরে পড়ে না। শৈশবে তার বাপ মা তাকে সুন্দরী বলিতেন, এবং সেই জন্য তার একটু রূপের গর্ব্ব ছিল। কিন্তু স্কুল কলেজে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া যখন সে দেখিল যে, সবাই কথায়-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে সর্ব্বদাই তাকে রূপহীনা বা এমন কি কুরূপার দলে ফেলে, তখন তার সে গর্ব্ব এমন পরিপূর্ণ রূপে মুছিয়া গেল যে, সে আপনাকে কুৎসিত জানিয়া যথাসম্ভব আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিত। লেখাপড়ায় ভাল হইলেও সে কোনও দিন কোনও শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রীর favourite হইতে পারে নাই। কাহারও কাছে সে অগ্রসর হইতেই সাহস করিত না; তার কেবলি মনে হইত যে তাহাকে কুরূপা বলিয়া সবাই ঘৃণা করে।

যখন সে বড় হইল, তখন স্কুল ও কলেজে মেয়েরা কত কথা বলিত। এক একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত, তাহারা আসিয়া তাহাদের স্বামীর সোহাগের কথা বলিত, অন্য মেয়েরা তাদের প্রণয়ীর গল্প করিত—সে সব কথা তার কাণে বিষের মত লাগিত। তার তো কোনও দিন সে সৌভাগ্য হইবে না—কোনও পুরুষ তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না—ইহা জানিয়া সে একরকম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। এ কথা ভাবিতে তার অন্তরে বড় ব্যথা লাগিত। তাই সে মেয়েদের সঙ্গেও ভাল করিয়া মিশিত না, আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া সে সম্পূর্ণ রূপে বই ও খাতার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

কিন্তু আজ এ কি বিপর্য্যয় ঘটিল তার অন্তরে! কি আনন্দ কোলাহলে তার অন্তর মুখরিত হইয়া উঠিল! এই

বীর—এই দিব্যকান্তি পুরুষ এক ধাপে তার হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া দাবী প্রচার করিয়া গেল, আর রেখা তার সব বিদ্যা, সকল গৌরব, সকল অহঙ্কার, সকল দৈন্য লইয়া তার এই দাবী তার সমস্ত অন্তর দিয়া স্বীকার করিয়া লইল। এ কি দৈন্য তার? এ কি আনন্দ! ভালবাসিবার অপূর্ব্ব পুলকে তার সকল শরীর মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। একটি পুরুষের কাছে পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণের আনন্দময় দীনতার গৌরবে তার সমস্ত অন্তর চঞ্চল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নিতান্ত সামান্য নারীর মত ভালবাসার স্রোতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে ভাসাইয়া দিল।

রেখার মা যখন রান্না সারিয়া একটা সেলাই লইয়া রেখার পাশে আসিয়া বসিলেন, তখন রেখা তার বইখানা সম্মুখে লইয়া পেনসিল দিয়া অলস ভাবে তার খাতার উপর সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে আঁচড় কাটিতেছিল। যখন সে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করিল, তখন সে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে বইয়ের পাতাটা উল্টাইয়া গম্ভীর ভাবে পড়িতে লাগিল। সে দুই পাতা সমান পড়িয়া গেল, কিন্তু একটি কথার অর্থও তার মাথায় ঢুকিল না, সে সমস্ত ক্ষণ ভাবিতে লাগিল সৌরীন্দ্রের কথা।

সৌরীন্দ্র কে? সে কার ছেলে? তার অবস্থা কেমন? কিছুই সে জানে না। কিন্তু সে এই সব প্রশ্নের নানা রকম উত্তর কল্পনা করিতে লাগিল। সে কল্পনা করিল, সৌরীন্দ্রের পিতা গ্রাম্য জমীদার; তাঁর স্ত্রী নিষ্ঠাবতী হিন্দু। সে কল্পনা করিল যে, সৌরীন্দ্র তার বাপ-মার কাছে রেখাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছে—পিতামাতা তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন। সৌরীন্দ্র নানা মতে তাঁহাদিগকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিছুতেই তাঁহারা মানিলেন না। পিতা শেষে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন—সৌরীন্দ্র মাথা খাড়া করিয়া রেখাকে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। রেখা তার হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিল, বলিল, "আমার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ছেড়ো না।" সৌরীন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।" তার পর রেখা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সৌরীন্দ্রের সেবা করিয়া, তাকে সমস্ত অন্তরের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া, তার এত বড় ত্যাগের প্রতিদান দিবার চেষ্টা করিল—

"দূর ছাই! কি যে ভাবি তার ঠিক নাই। আমাকে সে ভালবাসতে যাবে কেন?" এই ভাবিয়া রেখা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তার রূপ নাই, এমন কোনও গুণও নাই যাতে সে পুরুষের মন হরণ করিতে পারে। সে যে শুধু লেখাপড়াই শিখিয়াছে—আর তো কিছুই শেখে নাই! কি আছে তার যাতে সৌরীন তাকে ভালবাসিবে! অসম্ভব! তাকে অসহায় দেখিয়া সৌরীন কেবল তার স্বভাবজাত মহত্ত্বের গুণে দয়া করিয়া তার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে বই তো নয়। তাহাকে দুইটা ভদ্রতার কথা, সৌজন্যের কথা বলিয়াছে বই তো নয়। তাই বলিয়া কি সে রেখার মত কালো কুৎসিত একটা মেয়েকে ভালবাসিতে পারে? অসম্ভব!

আবার মনে হইল যে, যদি সৌরীন আবার আসে! আর যদি সে ঠিক তেমনি করিয়াই তার সঙ্গে সম্ভাষণ করে? রেখা কি তবে মাথা ঠিক রাখিয়া তার সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে? না—সে একেবারে আত্মহারা হইয়া তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে? না তো বা সে তার মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। নেশার ঘোরে সে হয় তো বুদ্ধিসুদ্ধি খোয়াইয়া সৌরীনকে বলিয়াই বসিবে "আমি তোমায় ভালবাসি।" যদি তাই করে তবে কি সর্ব্বনাশের কথা!—সর্ব্বনাশই বা কি! পুরুষ যে নারীকে ভালবাসে তাকে বলিতে পারিবে, নারী কেন তা' বলিবে না? বলিলে কি দোষ?—কিন্তু—যদি সৌরীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে? যদি তার মত কুরূপার পক্ষে সৌরীনকে ভালবাসিবার স্পর্দ্ধায় সে তাকে পরিহাস করে? তবে কি লজ্জা! মরিয়াও যে রেখা সে লজ্জা লুকাইতে পারিবে না!

আর যদি সৌরীন তা' না করে? যদি সেও ভালবাসে—যদি সে রেখাকে তার প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলে! তবে—কি আনন্দ!—কিন্তু পুরুষ মানুষ তো এমন অনেক সময় করে যে একটি নারীকে মুগ্ধ করিয়া কিছু দিন তার সঙ্গে প্রেমের খেলাধুলা করিয়া শেষে তাকে ফেলিয়া পলায়? সৌরীন তো তাও পারে? যদি তাই করে! যদি সে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে অস্বীকার

করে? কি সর্ব্বনাশ!—তাই সম্ভব! না! তার মত কুরূপার সত্য প্রেমের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। সে এ কথা ভাবিবে না।

রেখা পড়িয়া গেল The value of money depends upon more factors than the quantity theory makes allowance for. The rapidity of circulation—আচ্ছা সৌরীন্দ্রের কত টাকা আছে? সে কি খুব বড়লোক? তা যদি হয় তবে তো তার রেখার মত গরীব রূপহীনাকে গ্রাহ্য করিবার কথা নয়। তা না হইলেই বা কি? রেখাকে কে ভালবাসিতে যাইবে? নাঃ—The value of money depends—

তার মা ডাকিলেন "রেখা!"

রেখা যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি মা?"

"এই যে সৌরীন ছোকরাকে আজ নিয়ে এসেছিলি, এ কে জানিস?"

"এ খুব ভাল ছেলে মা। বরাবর ফার্ষ্ট হ'য়ে গেছে। আর, এ অন্য সব ছেলের চেয়ে ঢের বেশী জানে—কত বই ও প'ড়েছে। আমাদের কলেজের বেলার কাছে শুনেছি যে, ও যা' জানে ওর অনেক প্রফেসার তা জানে না।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু ও কে? বাড়ী কোথায়? কার ছেলে?"

"তা জানি না মা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রেখার মা বলিলেন, "তাই আমি ভাবছিলাম। তার কিছু জানি না শুনি না, তাকে তুই একেবারে বাড়ীতে নিয়ে এসে ভাল করিস নি। কে জানে ও কেমন লোক?"

তার মার সৌরীন সম্বন্ধে এই সন্দেহ রেখার কাছে এত অন্যায় বোধ হইল যে, কথাটা যেন তার কাণে কাঁটার মত বিঁধিল। সে কেবল বলিল, "না, উনি খুব ভাল লোক।"

হাসিয়া রেখার মা বলিলেন, "শোন পাগল মেয়ের কথা! এক দিনের আলাপে যাকে ভাল ব'লে মনে হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে, তারাই সব চেয়ে ভয়ানক লোক!"

কি অন্যায় কথা! মা এ সব কথা কি বলিয়া বলেন! রেখার ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু সে অনুভব করিল যে, ইহার উত্তরে তার এমন কোনও কথাই বলিবার নাই, যাহাতে তার মার সন্দেহ একেবারে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। তাই সে কেবল রাগিয়াই রহিল; আর মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ, তবে আর ওঁকে আসতে বলবো না।"

মেয়ের কথার সুরে মা তার মনের অভিমানের বেশ স্পষ্ট আভাস পাইলেন। তাঁর অন্তরে একটু ব্যথা লাগিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রাগ করলি মা?"

রেখা বই বন্ধ করিয়া একেবারে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "না, কিন্তু তুমি আমাকে কি ভাব বল দিকি নি! আমি—আমি—আমাকে কখনও তেমন দেখেছ?"

বলিয়া হঠাৎ রেখা উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তার চক্ষে জল আসিতেছিল। পাশের ঘরে গিয়া সে চোখ মুছিতে মুছিতে দম দম করিয়া বারান্দায় যেখানে উনান পাতা ছিল সেখানে গেল। তার পর উনান হইতে ভাত নামাইয়া সে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। রেখা নীরবে খুব তাড়াতাড়ি ভাত খাইতে লাগিল, তার মা একাগ্র ভাবে তার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

খাইয়া উঠিয়া রেখা অভ্যাসমত সে স্থান পরিষ্কার করিয়া এঁঠো বাসন ও মুখ হাত ধুইয়া ধপ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা তখন দুয়ার বন্ধ করিয়া বাতি নিভাইয়া পাশে আসিয়া শুইলেন। একখানা চওড়া তক্তপোষের উপর তাঁরা দুজনে শুইতেন।

শুইয়া শুইয়া রেখার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তার মা বলিলেন, "রাগ করিস নে মা আমার কথায়। আমি তোকে সন্দেহ করে' কোনও কথাই বলিনি। কিন্তু মা, এত দিন তোকে বলবার দরকার হয় নি তাই বলি নি। বেশ করে না জেনে না শুনে কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে আলাপ করাটা তোদের বয়সের মেয়েদের পক্ষে বড় ভয়ের কথা। খুব সাবধানে না থাকলে আমাদের নাকি পদে পদে বিপদ, তাই তোকে একটু সাবধান করে' দিচ্ছি।"

রেখা একটু হাসিয়া যথা সম্ভব শান্ত ভাবে বলিল, "মা,

তুমি কি আমাকে এখনো তোমার সেই কচি খুকীটি মনে ক'রছো। আমার যে বিশ বছর বয়স হ'য়েছে মা, আমি বি-এ পাশ ক'রেছি। এই সেদিন মহিলা মহাযতনের কর্ত্তারা আমাকে সেখানকার কর্ত্রী হবার জন্য নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গলা দেশের এতবড় সব গণ্য-মান্য লোক তাঁদের সব মেয়েদের ভার আমার হাতে দিয়ে ভরসা পান; আর তুমি তোমার মেয়েটির ভার আমাকে ছেড়ে দিতে ভরসা পাও না?"

"ভরসা আমি খুবই পাই। নইলে কি তোকে কলেজে গিয়ে এতগুলো ছেলের সঙ্গে একলা পড়তে দি। কিন্তু তোর সাহসের তো কথা হ'চ্ছে না; কথাটা অন্য লোকের স্বভাবের। লোক ভাল করে' চেনবার ক্ষমতা তোর এখনও হয় নি, কেন না তুই যতই পাশ করিস, পুরুষ মানুষ এখনও বলতে গেলে দেখিসই নি।"

"রোজ আমি এক হাজার ছেলের সামনে আনাগোনা করি, আমি মানুষ দেখিনি? বল কি মা?"

"যাক, সে কথায় কাজ নেই। এই সৌরীনের কথা"—

"আর সে কথা কেন বলছো মা? আমি তাকে ডেকে এনেছিলাম, অন্যায় করেছি—আর ডাকবো না।"

"তুই তো ডাকবি না, কিন্তু এখন সে যদি নিজে এসে জোটে।"

"সে আসবে না।" জোর করিয়া কথাটা বলিয়াই রেখার মনে হইল, সৌরীনের সম্বন্ধে এমন করিয়া জোর করিয়া বলিবার তার কোনও অধিকার নাই। তাই সে বলিল, "আর যদি আসে, তুমি তাকে বলে' দিও—আর যেননা আসে।"

"না—না, সে কি হয়? ভদ্রলোকের ছেলেকে তো অমন করে' অপমান করা যায় না। আমি শুধু এইটুকু তোকে বলতে চাই যে, তুই খুব সাবধান থাকিস। কথায়-বার্ত্তায় কাজ-কর্ম্মে কিছুতে যেন তাকে প্রশ্রয় দিস না।"

"আচ্ছা দেব না। এখন চুপ কর, আমি ঘুমোই" বলিয়া রেখা পাশ ফিরিয়া শুইল—কিন্তু ঘুমাইল না। জাগিয়া জাগিয়া সে অনেকক্ষণ অনেক স্বপ্ন দেখিল; তার পর যখন সে সত্য সত্যই ঘুমাইল, তখনও সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল সৌরীনের কথা।

পরের দিন রেখা সঙ্কল্প করিয়া গেল যে, মায়ের অন্যায় সন্দেহের জন্য সে প্রতিশোধ লইবে সৌরীনকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া। আজ যদি সৌরীনের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তার সঙ্গে কথা তো কহিবেই না—তাকে নমস্কার পর্য্যন্ত করিবে না—এমন করিয়া চলিয়া যাইবে যে যেন সে তাকে চেনেই না। তাতে অবশ্য সৌরীনের কিছুই হইবে না, কেন না সৌরীনের কাছে রেখা তো কিছুই নয়। সৌরীন তো আর রেখাকে ভালও বাসে না, তার জন্য তার কিছু বহিয়াও যায় না। কিন্তু সৌরীন নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হইবে, আর ভাবিবে, এই মেয়েটা কি অভদ্র অকৃতজ্ঞ! সে রেখাকে ঘৃণা করিবে। বেশ হইবে! তাহা হইলেই তার পক্ষে মায়ের অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

সেদিন কলেজ যাইবার সময় যখন রেখা নীচে নামিয়া আসিল, তখন তার মনে একটা অসম্ভব আশা হইতেছিল যে, বুঝি বা সে সৌরীনকে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিবে। এমন মনে করিবার তার কোন হেতুই ছিল না, তবু তার মনে হইতেছিল যে, বুঝি সৌরীন এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে কলেজ পর্য্যন্ত যাইবে। তখন দ্বারে আসিয়া সে সৌরীনকে দেখিতে পাইল না, তাতে সে মনে একটু নিরাশ হইল।

ট্রাম আসিলে রেখা উঠিয়া বসিল। না—কোনও দিকে সৌরীনের চিহ্নও নাই। কিন্তু ট্রাম আর খানিকটা অগ্রসর হইতেই রেখা দেখিতে পাইল যে, হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া সৌরীন চট্ করিয়া চলন্ত ট্রামে উঠিয়া বসিল। রেখার প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু সৌরীন তার দিকে চাহিল না। রেখার পশ্চাতের একটা বেঞ্চে বসিয়া সে নির্লিপ্ত ভাবে একটি ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল।

গোলদীঘির সামনে আসিয়া রেখা ট্রাম হইতে নামিয়া একবার সৌরীনের দিকে চাহিল। কিন্তু সৌরীন ভয়ানক কথায় ব্যস্ত। সেই বন্ধুটীর সঙ্গে সে নামিয়া গম্ভীর ভাবে আলাপ করিতে করিতে রেখার খানিকটা পশ্চাতে পশ্চাতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর দিকে অগ্রসর হইল। রেখা যখন তার ক্লাশে গিয়া বসিল, তখন তার সম্মুখ দিয়াই সেই দুই বন্ধু চলিয়া গেল; কিন্তু সৌরীন একবার সে ক্লাশের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

সেদিন রেখা প্রফেসারের বক্তৃতার এক বর্ণও শুনিতে পাইল না। বারে বারে তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল, বারে বারে চক্ষু ঝাপসা হইয়া উঠিল। সৌরীন আজ ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। কাল সে যে সহৃদয়তা দেখাইয়াছিল, সে জন্য রেখা তাকে যে সমাদর করিয়াছে, সৌরীন তাহাতে নিশ্চয় মনে করিয়াছে যে, রেখা তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সৌরীনকে সে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কাল সৌরীন ভদ্রতার খাতিরে রেখার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছে; কিন্তু রেখা যে ভুল বুঝিয়াছে, এবং সৌরীন যে বাস্তবিক তাহাকে গ্রাহ্য করে না, এই কথাটি তাহাকে পরোক্ষ ভাবে বুঝাইবার জন্যই সৌরীন এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়াছে—পাছে রেখা আরও বেশী দূর অগ্রসর হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রেখা ইহাই সৌরীনের ব্যবহারের একমাত্র সঙ্গত অর্থ সাব্যস্ত করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত, অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় রেখা দেখিল, সৌরীন ফটকের অপর দিকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। একবার সে রেখার দিকে চাহিল, তার পরই চক্ষু ফিরাইল, যেন সে রেখাকে চিনিতে পারে নাই। ট্রামে উঠিয়া রেখা দেখিল যে, যার সঙ্গে সৌরীন আলাপ করিতেছিল, সে বন্ধুটি রেখার পিছু পিছু ট্রামে উঠিয়া বসিল, সৌরীনকে দেখা গেল না।

ক্ষোভে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে রেখা বাড়ীতে গিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে রেখা বলিল, "মাথা ধরেছে।"

ইহার পর দুই চার দিন অন্তরই রেখা সৌরীনকে কলেজ যাইবার সময় বা আসিবার সময় দেখিতে পাইত; কিন্তু কোনও দিনই সৌরীন পরিচয়ের চিহ্নমাত্র প্রকাশ করিত না।

(ক্রমশঃ)

শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গে চন্দননগরের স্থান

শ্রীহরিহর শেঠ

বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে ও বহু ইংরাজি ও ফরাসী ইতিহাসে চন্দননগরের নাম উল্লিখিত থাকিলেও, ইংরাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদি যুগে, উভয় জাতির ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং প্রাধান্য লাভ ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হইতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কথাই প্রধানতঃ ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইলেও, উহার বিশিষ্টতা ছিল উহার শিল্প ও ব্যবসায়ে।

ব্যবসায় ও শিল্পে চন্দননগর কোন দিন বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ষস্থান পাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এখনও অনেক স্থানের অপেক্ষা এ বিষয়ে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার এক বস্ত্র-শিল্পই সম্ভবতঃ ফরাসী জাতিকে আকর্ষণ করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিল। এবং এই বস্ত্র-শিল্পই ভারতের বাহিরে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও চন্দননগরের অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়াছে। মহামতি ডুপ্লের সময় যখন ইংরাজ, ডাচ্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বৈদেশিক বণিকগণের হিংসার কারণ হইয়া চন্দননগর গৌরবের শীর্ষ সীমায় উপনীত হয়, তখন এখানকার শিল্প-ব্যবসায়ই সে গৌরবের প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। ডুপ্লে চন্দননগর ত্যাগ করিয়া যাইবার পরও ইহার ব্যবসা-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছিল। তখনও বসোরা, চীন, পেগু, জেড্ডা, সুরাট, মোচা, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত চন্দননগরের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। তখনও শস্য, অহিফেন, রেশম, মসলিন্ প্রভৃতি পণ্যের প্রচুর আমদানী রপ্তানী হইত। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন ইহা কলিকাতার অপেক্ষা বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। (১) ক্লাইভ এই স্থানকে

(১) A brief History of the Hughly District.

খুব আড়ম্বর পূর্ণ এবং ধনসম্পদশালী উপনিবেশ বলিয়াছেন। (২) ইহাকে তিনি ভারতের শস্যাগার (The granary of the islands) বলিতেন। (৩)

দেড়শতাধিক বৎসর হইতে চন্দননগরের সেই প্রাচীন কালের বাণিজ্যশ্রী বিলুপ্ত হইলেও এখনও ইহা এ প্রদেশের মধ্যে একটি ব্যবসা-প্রধান নগর এবং বাঙ্গলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শিল্প-কেন্দ্র। সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্প, কাঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প,

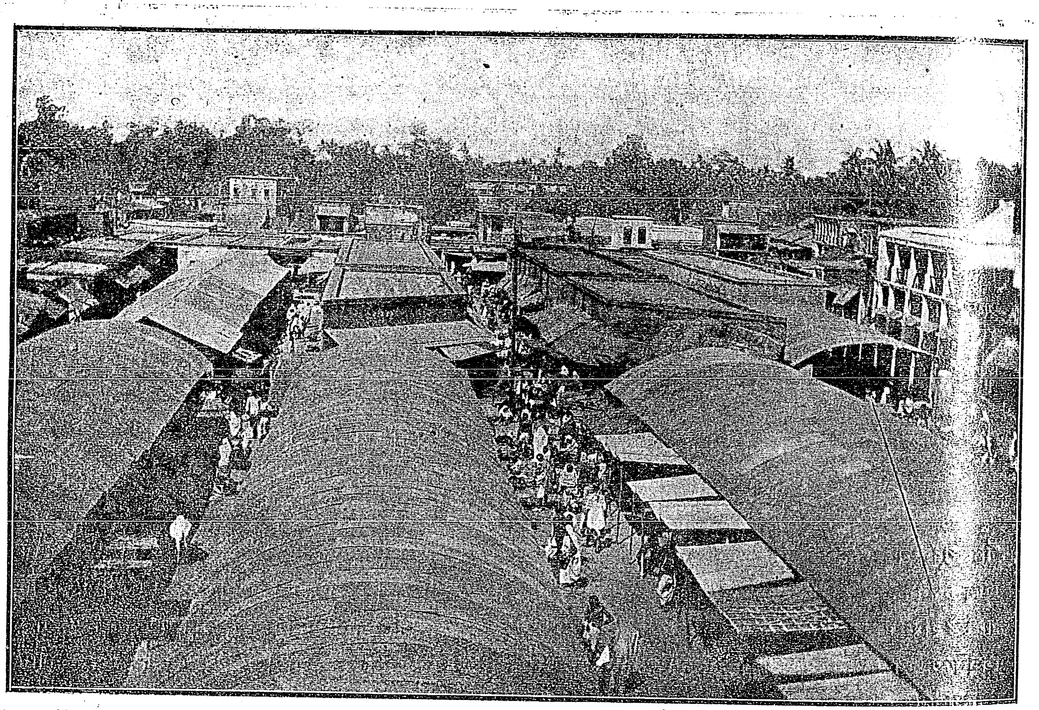

বর্ত্তমান লক্ষ্মীগঞ্জ। (উপর হইতে)

দড়ির কাজ, শাঁখা, ঝুলি প্রভৃতির কাজ এখনও এখানে দিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল এমন কি বাঙ্গলার বহু স্থানের তুলনায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও এক মাত্র দারু-শিল্প ভিন্ন অপর সকলের পূর্ব্ব গৌরব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এ কাজটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের খ্যাতি এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত থাকিলেও, সুপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল যাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিলাসি সমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল,—রুমালের জন্য লাল গিলে, কাল গিলে নামক চেক কাপড়, খাসা নামক কোরা লংক্লথ, (৪) গাউনের কাপড় প্রভৃতি শিল্প এখন যে কারণেই হোক লুপ্ত হইয়াছে। চুরুট, পারসি, চট, গালা, রঞ্জনের কাজ, মখমলের উপর জরির কাজ, কাশ্মীরি কারিগর দ্বারা প্রস্তুত শাল প্রভৃতি যাহা এক সময় এখানে উৎপন্ন হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহার কথা এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। (৫)

পূর্ব্বে এখানকার উৎপন্ন এবং অন্যান্য স্থান হইতে

(২) The life of Lord Clive Vol. I.

(৩) Selections from unpublished Records of the Government for the year 1748 to 1767.

(৪) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১০ম সংখ্যা ১ম বর্ষ।

(৫) দশভুজা সাহিত্যমন্দিরের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরের মুসলমান উপনিবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এখানে শাল প্রস্তুতের কথা জানিতে পারি।

আমদানী দ্রব্যের খরিদ-বিক্রী ও রপ্তানীতে ইহা একটি বিশেষ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। তখন রেল পথ সৃষ্টি হয় নাই, জলপথেই এখানে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল এবং বাণিজ্য পণ্য বহন করিয়া বহু শত নৌকা ও অর্ণবপোত গমনাগমন করিত। (৬) ফরাসী কোম্পানী চন্দননগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক সহর অবরোধের দশ বার বৎসর পূর্ব্বেও ইহা কলিকাতা অপেক্ষা সমৃদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়। (৭)

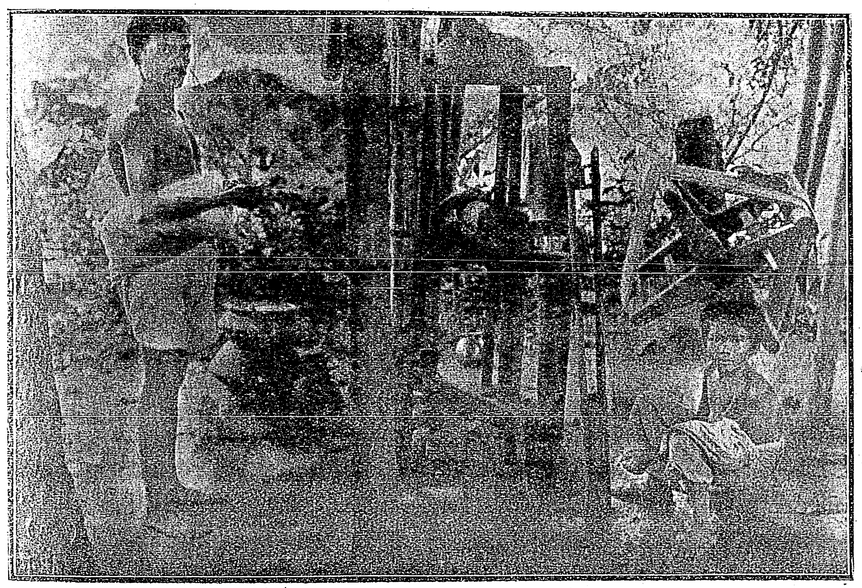

শন হইতে সুতলি দড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

ফরাসী ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ স্থানে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা তাঁহাদের কুঠি স্থাপনের অব্যবহিত পরের এখানকার ব্যবসা ও শিল্পের ইতিহাস আমার অনুসন্ধানে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কোম্পানীর এবং এই স্থানের অবস্থা খুব সামান্য থাকিলেও। (৮) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এখানে রপ্তানী ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। তখন পণ্ডিচারীর সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য সরবরাহের ইহাই কেন্দ্র ছিল। (৯) ইংরাজ নথি হইতে জানা যায়, মোগল বাদশার পাকা অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে কুঠি নির্ম্মাণ না হইতেই ফরাসী কোম্পানীর এই নূতন উপনিবেশে ব্যবসার উন্নতি হইতে থাকে। (১০) এই সময় বস্ত্র, সোরা, বেত, চন্দনকাষ্ঠ, গালা, মোম, রেসম, মরিচ প্রভৃতি এই স্থান হইতে সচরাচর রপ্তানী হইত। পার্ল দোরিয়া (Perle d'orient) ফেলিপো (Phelypeaux) প্রভৃতি এক এক খানি জাহাজে প্রচুর পরিমাণে উক্ত সব মালপত্র চালান হইত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১১)

এখান হইতে মসলিন্ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল রপ্তানী হইত বলিয়া জানা যায়। এই মসলিন্ তখন এই স্থানেই

(৬) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(৭) A brief History of the Hughly District.

(৮) La mission du Bengale Occidental vol. I ও A brief History of the Hughli District.

(৯) La compagnie Des Indes Orientales.

(১০) Storia Do Mogor vol.—II— Introduction.

(১১) La Compagnie des Indes Orientales.

দড়ি গুটাইবার যন্ত্র।

সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।
উচ্চে ৮ ইঞ্চ মাত্র।
শিল্পী—৺নীলমণি নাথ।

উৎপন্ন হইত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কারণ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফরাসীদের ঢাকার সহিত ব্যবসা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। (১২) চন্দননগরের বস্ত্রাদি যে উৎকৃষ্ট হইত, তাহা পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিচারীতে বিক্রীত বস্ত্রাদির লাভের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। উহা হইতে যখন শতকরা ৮০৲।৯০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল, তখন অন্যত্র উৎপন্ন বস্ত্রাদির লাভের অনুপাত শতকরা ২০৲ ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অধিক ছিল না। (১৩)

কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা দেসলান্দের (Andre Boureau Deslandes) চেষ্টা ও উৎসাহে প্রথম কয়েক বৎসর ব্যবসার বিশেষ উন্নতি হইলেও, উপযুক্ত অর্থাভাবে ইহার অবস্থা শীঘ্রই অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে। ১০০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেসলান্দ এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পর

(১২) A Descriptive and Historical account of the cotton manufacture of Dacca in Bengal.

(১৩) The private diary of Anandaranga Pillai vol. I.

তিন বৎসরেরও উপর ফ্রান্সের ডিরেক্টরগণ কোন অর্থ পাঠান নাই। এখানকার তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মচারী দুলিলে (Du Livier) অপরাপর কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের নিকট হইতে দেনা করিয়া কোনরূপে কুঠি বজায় রাখিয়া,

রামনগর—কাশী।
চিত্রকর—শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত জলের রংয়ের ছবি।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন—দেনা পরিশোধ ও উপযুক্ত মূলধন ব্যতিরেকে বাঙ্গলায় ফরাসীদের বাণিজ্যের কোন আশা নাই। ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। এই সময় ফ্রান্সের কর্ত্তারা এখানকার ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা না করিয়াই, একেবারে এখানকার

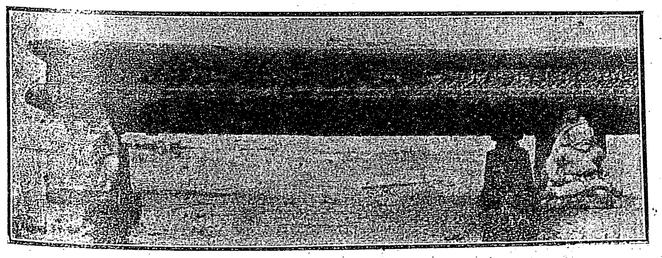

দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত কারুকার্য্য বিশিষ্ট চৌকি।

কুঠি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করেন। কার্য্যতঃ ইহা হয় নাই বা তৎপরেও বহু দিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থাও হয় নাই। ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর দেনার পরিমাণ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মোট ৩০০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। এই সময় কোম্পানীর অন্যান্য ভারতীয় উপনিবেশগুলিও প্রায় ধ্বংস মুখে পতিত হয়, কিন্তু তখনও চন্দননগরই ফ্রান্সের ভারতীয় প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল। (১৪) ইহার পর দীর্ঘ কালের মধ্যেও কোম্পানীর বাণিজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। জানা যায়, ১৭২৩ হইতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে গড়ে প্রায় দেড় মিলিয়ন পাউণ্ডের কারবার হইয়াছিল এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ডের কারবার হয়, তন্মধ্যে ১০ লক্ষ

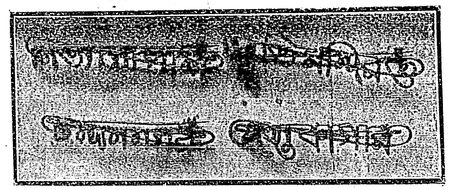

শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র শেঠের দ্বারা নির্ম্মিত নেম ব্রচ্।

টাকার মাল চন্দননগর হইতেই রপ্তানী হয়। (১৫)

পণ্য বহনের জন্য তখনকার যে সব জাহাজের নাম পাওয়া যায়, তাহা সেণ্ট্ জন্ (St. Jean), পষ্টিলন (Pastillon), পঁসারটঁ্যা (Pont chartran) ফেলিপো (Phelypeaux) পার্ল্‌দোরিয়াঁ (Perle-d'orient), সেণ্ট লুই (Saint Louis), গাইয়ার (Gaillard) লা-পণ্ডিচারী (Le Pondichery) ইত্যাদি। (১৬)

এতাবৎ কোম্পানীর ব্যবসা কখন কম কখন সামান্য বেশি ভাবে চলিয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে হুল্লের আগমনের পর হইতে উহা উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ভারতের মধ্যে নানা দূরদেশ ও বাহিরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময়েই এখানে অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক ব্যবসায় দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করিবার ও অনেকাংশে নিরাপদ হইবার মানসে আগমন করিয়া

(১৪) Le Compagnie des Indes Orientales.
(১৫) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
(১৬) Le Compagnie des Indes Orientales.

বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন ক্রমে ব্যবসাশ্রীতে স্তব্ধ পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল, গঙ্গাবক্ষ পণ্য-পূর্ণ বহু তরণী ও জাহাজে শোভিত হইল। বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে চন্দননগর বাঙ্গলার মধ্যে একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইল এবং কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের আহার্য্য শস্যাদি সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। (১৭) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই চন্দননগরের স্বর্ণ-যুগ। যেন কোন মায়াবিনীর ইন্দ্রজালে সহসা কয়েক বৎসরের মধ্যে চন্দননগর নূতন শ্রী ধারণ করিয়া শোভা-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

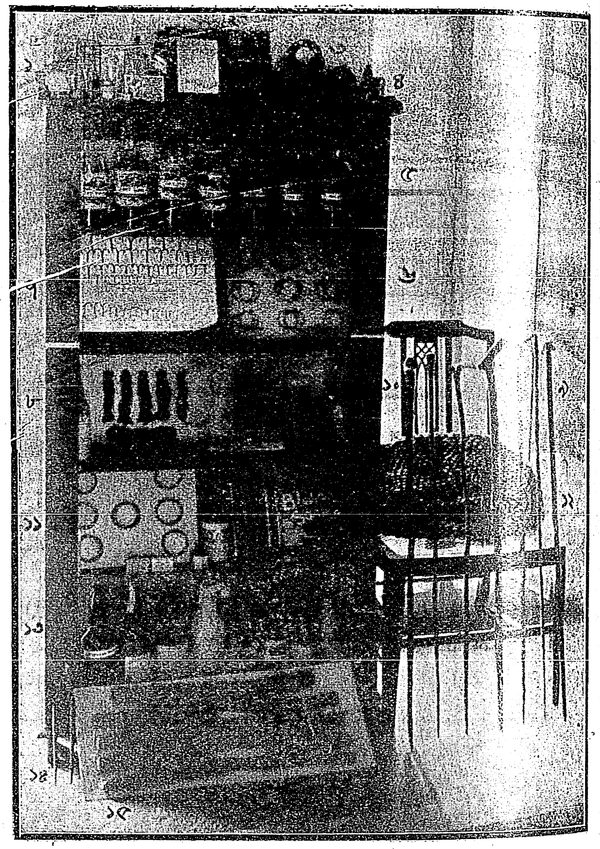

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে চলিয়া যাইবার পরও এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ফরাসীদের বাণিজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় (১৮)। ১৭-৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ, ইংরাজের সহিত যুদ্ধফলে চন্দননগরের পতনের সহিত ফরাসীদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নির্ম্মূল হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য চির-বিলুপ্ত হইল। এই শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসা বলিতে চন্দননগরে প্রায় কিছু ছিল না। (১৯) তৎপূর্ব্বেই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লোপ পাইয়াছিল।(২০)

চন্দননগরের গৌরব-যুগে ফরাসী কোম্পানীর বাণিজ্য-শ্রীবৃদ্ধির সহিত এখানকার এবং ভিন্ন দেশাগত জনগণেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে ফরাসীদের অদৃষ্টের সহিত যাঁহাদিগের ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক ছিল, তাঁহারাও যথেষ্ট সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিদের মধ্যেও

চন্দননগরে প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্য।

(১) এসেন্স, পমেটম, টুথপাউডার ইত্যাদি। (২) চন্দননগরে প্রস্তুত আরসি। (৩) শ্রীগৌরচাঁদ দের তালা। (৪) শ্রীসন্তোষনাথ শেঠের প্রস্তুত পকেট হুঁকা। (৫) ৺দীননাথ চন্দ্রের কারখানায় প্রস্তুত বিবিধ টিঙ্কার। (৬) কাচের চুড়ি। (৭) বঁড়সি। (৮) রংকরা সুতা। (৯) শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকারের প্রস্তুত ছড়ি। (১০) হোমিওপ্যাথি ঔষধের কৌটা। (১১) রুলি। (১২) পাপোস। (১৩) পেটেণ্ট ঔষধ, বার্ণী প্রভৃতি। (১) শ্রীউমাচরণ কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাতুন্নি। (১৫) শনের দড়ি।

ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বয়ং ডুপ্লেও এই সুযোগের ফল গ্রহণে বিরত ছিলেন না।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ফরাসী ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ

(১৭) Le Compagnie des Indes Orientales.
(১৮) Bengal District Gazetteers—Hughly.
(১৯) Bengal District Gazetteers—Hughly.
(২০) History of India—By David Sinclair M. A., ও La Compagnie Francaise Des Indes (1604-1875)

চৌধুরীর নামই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলিয়া তাঁহার নাম অনেক স্থলে উল্লিখিত হইলেও ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ান বলিয়া কোন পদ ছিল না। তিনি ২০ টাকা বেতনে চাকুরি আরম্ভ করিয়া, কোম্পানির কুর্ত্তিয়ে (courtier) অর্থাৎ দালাল,

চন্দননগরে প্রস্তুত আসবাব পত্র।

পণ্য-সরবরাহকার এবং ইজারদার হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র নিজ ব্যবসা ও তেজারতি দ্বারা বিপুল সঙ্গতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। (২১) অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ডুপ্লেও প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এখানে অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ সম্ভবতঃ যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ফরাসিদের সহিত সম্পর্কিত হইয়া তিনি যেমন স্বল্পকাল মধ্যে অসাধারণ সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় ফরাসীদের পতনের সহিত ইংরাজের ক্রোধে তাঁহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। এমন কি তাঁহার বাসের সুবৃহৎ অট্টালিকাও সেই সঙ্গে ইংরাজদের গোলায় ধূলিসাৎ হয়। সমগ্র চন্দননগর লুণ্ঠন করিয়া ১০০০০০১ ষ্টার্লিং সম্পত্তি ক্লাইব লইয়া যান। (২২) কথিত আছে তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তিই ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার। (২৩)

কোম্পানীর সম্পর্কে থাকিয়া এখানকার অপর কাহারও বিশেষ ধনশালী হওয়ার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এক্ষণে নির্ণয় করিতে না পারা গেলেও, অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায়,—এখানকার অনেকের পূর্ব্বপুরুষেরা চন্দননগরের এই উন্নতির সময়ই অন্য স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

এখানকার সুবিখ্যাত লক্ষ্মীগঞ্জ নামক বাজারটির ডুপ্লের সময়ই সূত্রপাত হয় (২৪) এবং পুরাতন লক্ষ্মীগঞ্জের বড় বড় গুদামগুলিও সেই সময়ে নির্ম্মিত হয়। পুরাতন গঞ্জের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ধান চাউলের কাজই খুব বেশি ছিল। উহা কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের চাউল সরবরাহের প্রধান গঞ্জ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

(২১) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল।

(২২) Orme's Military Transactions of the British nation in Indostan.
(২৩) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
(২৪) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

চাউলের ব্যবসা হইতেই লক্ষ্মীগঞ্জ নামের উৎপত্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে ভদ্রেশ্বরে তামাক পাট ও বুট ভিন্ন সর্ব্ববিধ দ্রব্যাদির জন্য এখনও এত বড় বাজার আর নাই। পাইকারগণ নিকটবর্ত্তী কল বাজার ও পল্লীগ্রামের হাটে বিক্রয়ার্থ এখান হইতে প্রত্যহ অনেক শাক সব্জি তরিতরকারি প্রভৃতি লইয়া যায়। প্রতি বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মনোহারী দ্রব্য, চুড়ি ও অন্যান্য বহু প্রকার সামগ্রী বিক্রয়ার্থ বহু পরিমাণে আসিয়া থাকে এবং অনেক টাকার দ্রব্যাদি

ঘোষপাড়ায় সতীমার দীক্ষা।—অক্ষয় তৃতীয়ার মেলার জন্য মাটির প্রস্তুত।

বিক্রীত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বাজারে প্রতি বৃহস্পতিবারে বিস্তর টাকার কাচের চুড়ি বিক্রীত হইত।

এখানে সাবিনাড়ার বাজার নামে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে একটি বাজার ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (২৫) আজকাল হাটখোলা নামক পল্লীতে যে বাজার আছে, জানি না উহাই পূর্ব্বে সাবিনাড়ার বাজার বলিয়া খ্যাত ছিল কি না। এখানে বাগবাজার নামক একটি পল্লী আছে, বহু পূর্ব্বে এই স্থানেও একটি বাজার ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং পল্লীর নাম হইতেও তাহা মনে হয়। শুনিয়াছি অষ্টেণ্ড কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাঁকাশ্যাম পাল নামক এক ব্যক্তি এই বাজার বসাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেই বাগবাজার নাম হয়। (২৬) অষ্টেণ্ড কোম্পানির কর্ম্মস্থান ছিল ভাগীরথীর পরপারে বাঁকিবাজার নামক স্থানে। এই নামের সহিত উক্ত বাঁকাশ্যাম পালের নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জানি না ইহার নামোৎপত্তির সহিত পাল মহাশয়ের নামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

পূর্ব্বে বড়বাজারে একটি স্থানীয় প্রস্তুত কাপড়ের হাট বসিত এবং তথায় বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত এবং উহা জাহাজে করিয়া বিদেশে রপ্তানি

(২৫) ডুপ্লের সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর চন্দননগর ইজারা লওয়া সংক্রান্ত চন্দননগর রেকর্ডের অপ্রকাশিত দলিল।
১৩৩১ সালের পৌষের বঙ্গবাণী দ্রষ্টব্য।

(২৬) ইহার সত্যাসত্য ঠিক মত অবগত নহি। শ্রীযুক্ত মিহির দাস পাল মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

হইত। (২৭) বিবির হাট এবং খলিসানী নামক স্থানে আর দুইটি বাজার ছিল। প্রথমোক্তটিও যে বহু পুরাতন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (২৮) বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার সামান্য অস্তিত্ব ছিল। লালবাগানে টিনবাজার নামক পল্লীতেও একটি ছোট বাজার ছিল। এক্ষণে লক্ষ্মীগঞ্জ ও হাটখোলা ভিন্ন বারাসতেও একটি ছোট বাজার আছে।

পূর্ব্বে বড় বড় চাউল ব্যবসায়ী এখানে অনেক ছিলেন। তন্মধ্যে গুরুচরণ সাহার আড়তের নাম এখানে সমধিক

রামপ্রসাদ সেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা। অক্ষয় তৃতীয়ার মেলার জন্য মাটির প্রস্তুত।

প্রসিদ্ধ। গুরুচরণ বাবু যশোহরের বীরকুচ্ছগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথমে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বিশ্বম্ভর নায়েক মহাশয়ের আড়তে ব্যাপারী রূপে কিছু কিছু চাউলের কার্য্য আরম্ভ করেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে মার্কণ্ড চন্দ্র নামক এক ব্যক্তির এখানে খুব বড় ধান চাউলের কাজ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর নরসিংহ ভকত নামক এক ব্যক্তি ঐ আড়ত খরিদ করেন। এই সময় গুরুচরণ বাবু পূর্ব্বোক্ত আড়ত ছাড়িয়া তাঁহার ব্যাপারী রূপে চাউল আমদানী করিতে থাকেন। নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতুল রামগোপাল ও পরে মাতুল-পুত্র শশিভূষণ চৌধুরী এই আড়ত চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে গুরুবাবু ইহা খরিদ করেন এবং প্রায় ৩০ বৎসর কাল খুব জোরের সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

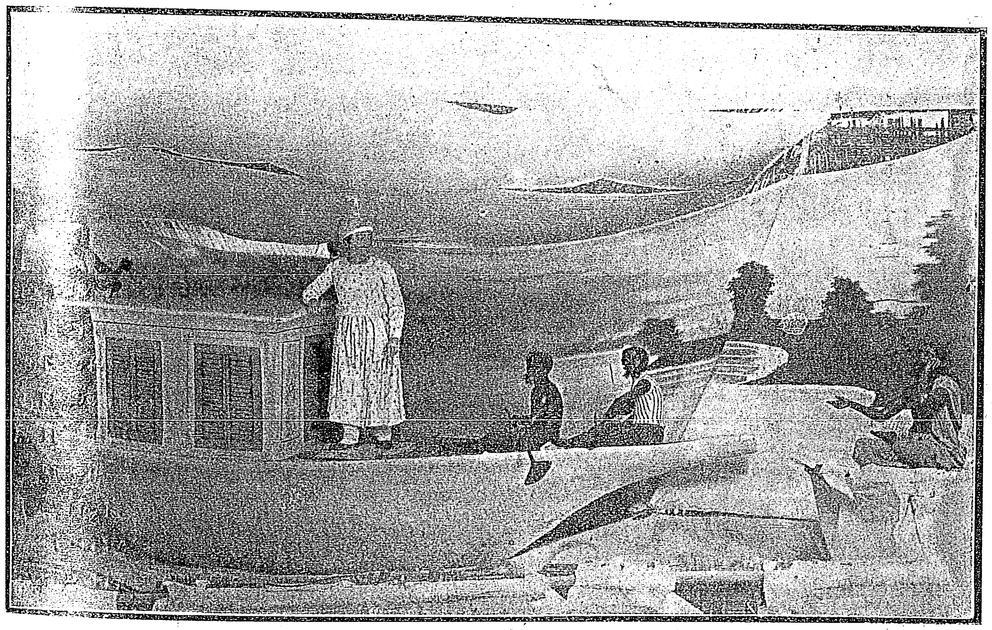

এই সময় এখানে পূর্ব্ব বঙ্গের এবং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু ব্যাপারী বিস্তর চাউল বিক্রয়ার্থ আনিতেন। দিনাজপুরের মুগি (২৯) চাউল, যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইত। শুনা যায় সে সময় লক্ষ্মীগঞ্জের ঘাটে ছোট বড় ৭০।৮০ খানি নৌকা সর্ব্বদা

(২৭) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(২৮) পণ্ডিচারী দপ্তরের অপ্রকাশিত ১৭৬৬-৬৯ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে বিবিরহাটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২৯) কঁড়ো সমেত পূর্ব্ব দেশের আমদানী চাউলকে মুগি চাউল বলিত।

বাঁধা থাকিত। কেবল মাত্র গুরুবাবুর গুদামেই প্রায় লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকিত। (৩০) ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে পুরুবি চাউলের আমদানী যথেষ্ট ছিল দেখিয়াছি।

এখানকার পুরাতন বড় চাউল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রথ-প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য যাদু ঘোষ, রামচাঁদ কুণ্ডু, কানাই সরকারের ঘাট-প্রতিষ্ঠাতা রাম কানাই সরকার, মার্কণ্ডচন্দ্র, জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগবান পাল, বিশ্বম্ভর নায়েক, গদাধর মণ্ডল প্রভৃতির নাম শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ও চন্দননগরের কাশী কুণ্ডুর ঘাট-প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয়েরও বড় চাউলের কাজ ছিল।

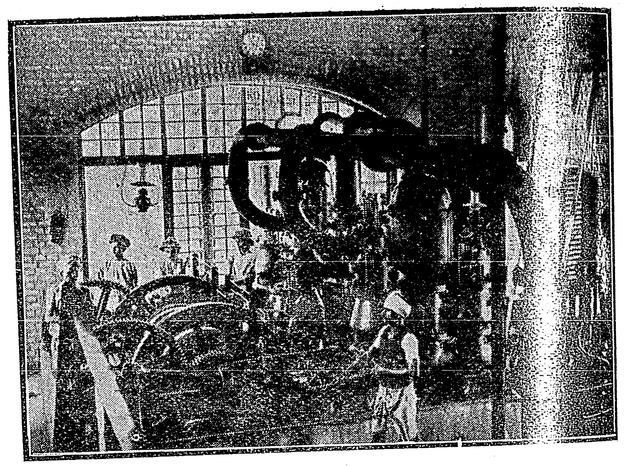

জলের কলের ভিতরের দৃশ্য।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৲ হিসাবে মণ ছিল; দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দর এক টাকা বৃদ্ধি পায়। (৩২) এখানকার প্রচলিত ওজন ৮২৷৷৵০ আনায় এক সের।

পূর্ব্বে অন্যরূপ ওজন প্রচলিত ছিল কি না জানি না।

এখানে এক সময় গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় দোলো চিনির কাজও খুব ছিল। হাটখোলার ধাড়াদের চিনির কারবার বড় ছিল। চকনিবাসী রাম কুণ্ডুর চিনির কাজও উল্লেখযোগ্য। এখন এ কাজ আর নাই। ডাচেদের বাটেভিয়ার উৎপন্ন বা বিলাতি চিনির আমদানী হইতেই এ ব্যবসা ক্রমে দেশ হইতে লোপ পাইতে থাকে।

গালাবাড়ি—এই স্থানে পূর্ব্বে বড় গালার কারখানা ছিল।

ঘানির তৈলের কাজ এখানে কম নহে। পূর্ব্বে কলুপুকুর অঞ্চলে বিস্তর কলুর বাস ছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের জাতি-ব্যবসা

চাউলের দর সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক মণের দাম প্রায় এক টাকা ছিল। (৩১)

(৩০) ব্যবসা বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার শেঠ মহাশয়ের নিকট হইতে গুরুবাবুর বিষয় জানিতে পারি।

(৩১) মল্লিখিত "একখানি পুরাতন দলিল" প্রদীপ ৫ম সংখ্যা ১৩১১। পত্রে দেখা যায়।

(৩২) Commite de Bienfaisanceএর পুরাতন কাগজ

করিতেন। এখানে সর্ব্ব প্রথমে রেড়ির তৈলের কল স্থাপন করিয়াছিলেন জয়গোপাল নন্দী ও পূর্ণচন্দ্র পাল। গঞ্জে নিবেপোটীতে তাঁহাদের কল ছিল। (৩৩)

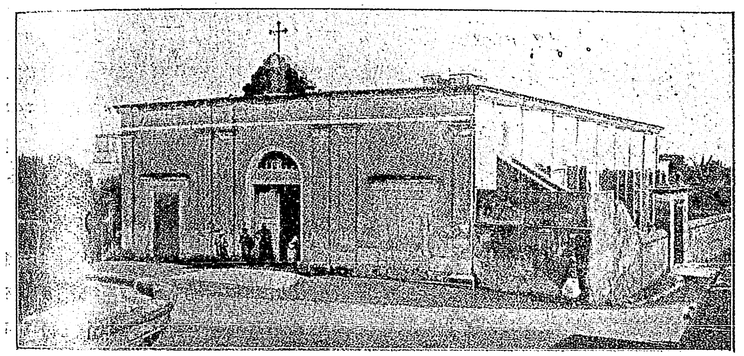

দ্বিতীয় সেণ্ট লুই গির্জ্জা।—এই স্থানে পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অহিফেন ও লবণ রাখা হইত।

এক সময়ে এই স্থান যেমন একটি বাণিজ্য-প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ শিল্প-গৌরবেও ইহা বঙ্গে বহু স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রাধান্য এখানে অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যমান ছিল এবং তুলনায় এখনও কলিকাতার পর বহু স্থান অপেক্ষা শিল্প-প্রধান বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। এ স্থানের পূর্ব্বেকার যে সব শিল্পের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শিল্পগুলি ভিন্ন দড়ি, চট, বস্ত্র, চুফট, গালা, কাষ্ঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প, কাগজ, চিকন, রাম্ মদ, দেশী মদ, নৌকা প্রস্তুত, মাদুর বোনা, সূতা রং করা, শঙ্খের কাজ উল্লেখযোগ্য। এখানকার বস্ত্র-শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দড়ি, চট ও গালার কাজ এখানে যথেষ্ট ছিল।

চন্দননগর হইতে বালি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পাট ও শনের দড়ির কারখানা এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। (৩৪) পূর্ব্বে চন্দননগরেই এই কাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কলিকাতার অধিকাংশ মাল এই স্থান হইতেই সরবরাহ হইত। এখানে অনেক বড় বড় দড়ির কারখানা ছিল। তাহার চিহ্ন স্বরূপ রু করদেরি নামে এখনও একটি রাস্তা রহিয়াছে। হাজিনগর নামক পল্লীর এক বাগান বাটীতে লুই বোনো (Louis Bonnaud) নামক এক সাহেবের বড় দড়ির কারখানা ছিল। উহা পরে ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৩৫) চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বীরচাঁদ বড়াল ও হরচন্দ্র দত্তের একটি যৌথ দড়ির কারবার ছিল। এই কারখানা হইতে করাচিতে দড়ি প্রেরিত হইত। তৎ-পূর্ব্বে গজমোহন দাসের এই কাজও উল্লেখযোগ্য। এখনও

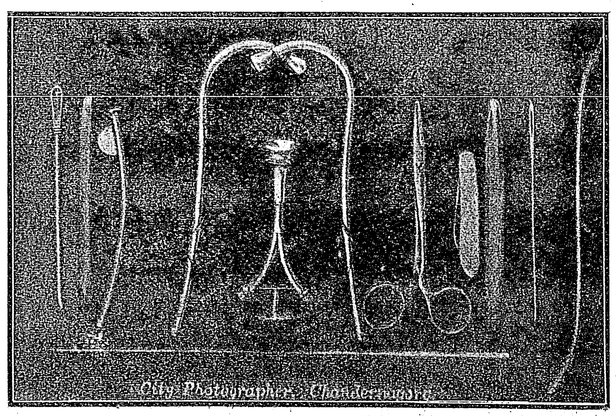

শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দাসের দ্বারা নির্ম্মিত ডাক্তারি যন্ত্রাদি।

শুখসনাতনতলা নামক পল্লীতে অনেক পরিমাণে শনের

(৩৩) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাধু মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(৩৪) The District Gagetteers—Hughly গ্রন্থেও উহা উল্লেখ আছে।

(৩৫) Good Old days of Honourable John Company,

দড়ি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে। (৩৬)

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় এক ওলন্দাজ কোম্পানীর একটি বড় চুরুটের কারখানার উল্লেখ পাওয়া গেলেও (৩৭) এই স্থানের চুরুটই সুবিখ্যাত 'চিনসুরা সিগার' নামে পৃথিবীর নানা স্থানে বিক্রীত হইত। উর্দ্ধ-

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকারের দ্বারা চিত্রিত ছবি। (তৈল চিত্র)

বাজারে ইহার কাজ অধিক ছিল। (৩৮) নন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব ম্যার মসিয়ে টাডিভ্যাল (Tardivel) সাহেবের পূর্ব্বপুরুষদের একটি, রূপচাঁদদের একটি এবং বাঁকা পালের একটি বড় চুরুটের কারখানা ছিল। এই কাজ এক্ষণে একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা এখানকার একটি বিশেষ শিল্প ছিল। এই কাজের জন্য যন্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজন হইত না এবং অতি অল্প মূলধনে ব্যবসা করা চলিত বলিয়া উহা তখনকার একটি গৃহ-শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং দরিদ্রদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে ঘরে-ঘরে চুরুট প্রস্তুত করিত। বোধ হয় পাঁচ ছয় শত লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। (৩৯)

এখানে পূর্ব্বে আরও অনেক প্রকার ছোট ছোট উটজ শিল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহা প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই সকলের মধ্যে শাঁখার উপর ফুল কাটা, প্রতিমা সাজের জন্য কাঠের মালার উপর জরি জড়ান, ঝুলি তৈয়ারি করা, ছেলেদের খেলিবার পুতুল তৈয়ারি, ঘুনসি তৈয়ারি, সূতা কাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলুইকাঁটা তৈয়ারি, সূতা রং করা প্রভৃতিও এখানে খুব বেশি হইত। এই সকলের মধ্যে কিছু কিছু জলুইকাঁটা ও ঝুলি প্রস্তুত ভিন্ন আর সব লোপ পাইয়াছে। শাঁখার ফুলকাটা ভিন্ন এখানে শাঁখা-প্রস্তুতের কাজও ছিল এবং উহার রীতি-মত ব্যবসা ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে শাঁখার কাজ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। (৪০) এখনও এখানে সামান্য ভাবে এই কাজ হইয়া থাকে।

এখানে যে সব গালার কারখানা ছিল, তাহার কাঁচা মাল বাহির হইতে আসিয়া, এখানে উহা ব্যবসার উপযোগী হইয়া রপ্তানী হইত। বর্ত্তমান সরকারি হাসপাতালের

(৩৬) বস্ত্র ও চট্ সম্বন্ধে উল্লিখিত "চন্দননগরের বয়ন শিল্প" প্রবন্ধে সবিশেষ লিখিত হওয়ায়, এ স্থলে এ বিষয়ে কিছু লেখা হইল না।

(৩৭) Bengal District Gazetteers—Hughly.

(৩৮) সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্ত-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়।

(৩৯) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা।

(৪০) চন্দননগর ইজারা সংক্রান্ত দুপ্লে ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত দলিল।

ভরা-ভাদর মাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

পশ্চিমে, যে স্থানে এক্ষণে শ্রীযুক্ত রূপলাল নন্দী মহাশয় একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঠিক ঐ স্থানে গালাবাড়ি নামে একটি বড় গালার কারখানার ভগ্নাবশেষ নূতন বাটি নির্ম্মাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত। এখনও গালা রাখিবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালাগুলি ঐ স্থানে পড়িয়া আছে। শুনা যায়, পালপাড়ার দে মহাশয়েরা উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ ভড় নামে এক ব্যক্তির গালার কারখানা ছিল বলিয়া শুনা যায়।

৭৬।৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও মাডাঙ্গা অঞ্চলে অনেক কাগ্‌জীর বাস ছিল, তাহারা দেশী কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা যে স্থানে থাকিত তাহাকে কাগ্‌জী পাড়া বলিত। (৪১) নন্দলাল পাল নামক একজন দেশী কাগজের বড় ব্যবসাদার ছিলেন। এখানে অনেক মাদুরের কাজ ছিল। কপালিরা এই কাজ করিত। মুসলমানপাড়ায় বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় চিকনের কাজ করিত। বিদেশীয় বণিকগণ তাহার গ্রাহক ছিলেন। (৪২)

জন শিপ্‌ দ্বারা লিখিত নীল সম্বন্ধে একখানি পুস্তকে পাওয়া যায়, যে নীল এক সময় বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ ছিল। প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি এদেশে সেই নীলের চাষ ও কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি চন্দননগরবাসী ছিলেন। তাঁহার নাম লুইবোনো (Louis Bonnaud); ইনি ফ্রান্সের মার্শেইএর অধিবাসী। প্রথম ওয়েষ্ট্‌ ইণ্ডিজ এবং তৎপরে বুরবঁ দ্বীপে কিছু কাল থাকার পর, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম এখানে আগমন করেন এবং এই স্থানেই বাস করেন। ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীলের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়। বোনো সাহেবের এই ব্যবসার সূত্রপাতও এই সময়। তিনি প্রথম তালডাঙ্গায়, পরে তাঁহার হাজিনগরের বাগানে নীলের কাজ করেন। শেষোক্ত বাগানেই তাঁহার একটি চট্‌ ক্যাম্বিশ দড়ির কারখানা ছিল। উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর, তিনি মালদহে এক ধনী ইংরাজের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বৃহদায়তনের নীলের কাজ আরম্ভ করেন এবং তদ্দ্বারা বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। (৪৩)

কোন্ সময় গোন্দলপাড়ায় আর একটি নীলকুঠি ছিল। (৪৪) চন্দননগরের দুমন্ত্‌ (Dumont) নামক এক সাহেব তাঁহার উৎপন্ন নীল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত চালান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা প্রতি পাউণ্ড ১১ শিলিং দরে বিক্রয় হইয়াছিল। (৪৫)

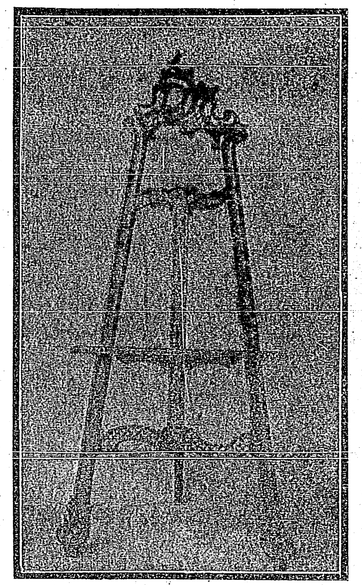

শিল্পী—৺হরিগোপাল দাস দ্বারা নির্ম্মিত।

চন্দননগরের আশে পাশে ন-পাড়া, খুসিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও নীলের কাজ ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ খুসিগঞ্জে ব্লুম (Blume) নামক এক সাহেবের নীলের কারখানা নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল জানা যায়। (৪৬)

(৪১) দশভুজা সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ" প্রবন্ধ।

(৪২) দশভুজা সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ" প্রবন্ধ।

(৪৩) Carey's Good old days of Honourable John Company.

(৪৪) চন্দননগরের সার্ভে ম্যাপ ১৮৭০—৭১

(৪৫) Selections from Calcutta Gazette 1789—97,

(৪৬) Selections from Calcutta Gazette 1795-1805.

দেশী মদের জন্য চন্দননগরের একটু নাম আছে তাহা অনেকেই জানেন। পূর্ব্ব কালের এক পর্য্যটকের (P. de Montalembert) বর্ণনা হইতে জানা যায়, এখানে

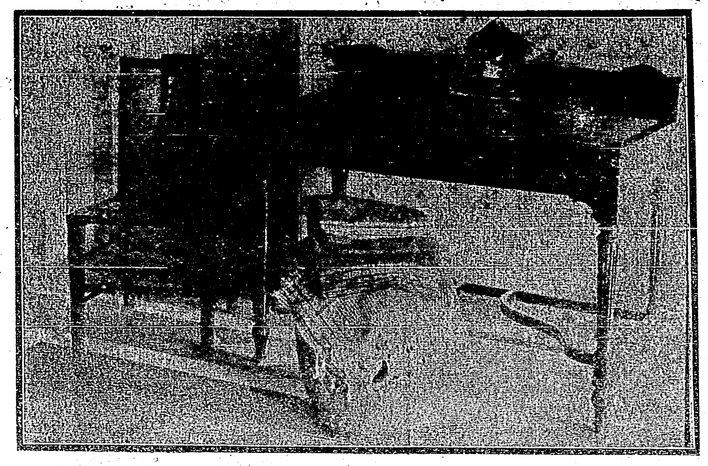

বর্ত্তমান সময়ের প্রস্তুত রাইটিং টেবিল ও চেয়ার। জরিপাড় শাড়ি ও টেবিল ক্লথ্ যাহা সম্মুখে রহিয়াছে উহা বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কলে প্রস্তুত।

মদ সে সময় মহার্ঘ ছিল না এবং লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিত না। (৪৭) প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশীয় প্রস্তুত রম্ নামক মদ্য এদেশ হইতে ইয়োরোপে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হইত, সেই সময় এখানে রম মদ্য চোলাইয়ের কারখানা ছিল। (৪৮) ফ্রেসেঞ্জেস্ (Fressenges) নামক এক সাহেব এখানে একটি চোলাই-খানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। (৪৯)

এখানে দেশী মদ ক্রমেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। উহা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদের চোলাইখানায় প্রস্তুত হইয়া প্রায় ছয় টাকা প্রতি গ্যালন হিসাবে ডিউটি লইয়া ইজারদারকে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর উহার ডাক হয়। এই বৎসর চোলাই-খানা ১৩৯০০৲ এবং মদের দোকান (মোট ২৪ খানি) ১১১৬০৮৲ টাকায় ডাক হইয়া বিলি হইয়াছে। মদের ডিউটি ও এই ডাকের টাকা গভর্ণমেণ্টের এখানকার সর্ব্ব-প্রধান আয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মদের উপর ডিউটি স্থাপিত হয়। উহার পূর্ব্বে ইজারা-দার নিজ ইচ্ছা মত আপন আপন চোলাইখানায় মদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতেন। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আইনে এখানকার মদ্য সহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। এই কারণ বাহির হইতে মদ্যপায়িগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকে।

এখানে যে কয়েকটি চোলাই-খানা আছে তন্মধ্যে এখানকার ভূতপূর্ব্ব ম্যার ডাক্তার দীননাথ চন্দ্র মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি অপর কারণে উল্লেখযোগ্য। বিলাতি টিঞ্চার প্রভৃতি ঔষধাদি প্রস্তুতের কারখানা হিসাবেই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন লণ্ডন মেডিক্যাল এজেন্সি নাম দিয়া এখানকার উৎপন্ন ঔষধ

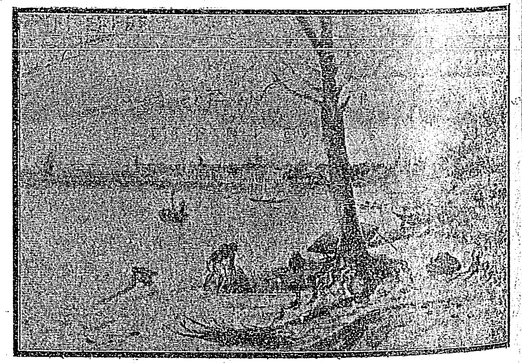

চন্দননগরে গঙ্গাতীরের একটি দৃশ্য।

সকল কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক স্থানে বিক্রীত হইত। দীনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় কিছু দিন ইহা চালাইয়াছিলেন। তৎপরে ফ্র্যাঙ্কো-ইণ্ডিয়ান্ মিস্‌লেনি নামেও তাঁহারা কিছু দিন সামান্য ভাবে ঔষধের কাজ চালাইয়াছিলেন। এখন

(৪৭) a brief history of the Hughly District.
(৪৮) Bengal District Gazetteers—Hughly.
(৪৯) a Sketch of the administration of Hughly District.

উক্ত চোলাইখানায় কেবল মদ্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দীন বাবুর এই ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কম নহে! আজকাল বাঙ্গলায় কতিপয় ঔষধের কারখানা হইয়াছে, কিন্তু যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্‌স্, টেক্‌নো-কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস প্রভৃতি খ্যাতনামা ঔষধের কারখানাগুলির কথা বড় কেহ জানিতেন না, তখন তিনি নিজ বুদ্ধিবলে এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহাকে এই কাজের একজন অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

অহিফেন, গুলি, চরোস, চণ্ডু প্রভৃতি আবগারির অন্যান্য দ্রব্যও এখানে কিছু বেশি চলে। পূর্ব্বে এখানে আফিমের কাজ অধিক ছিল, এমন কি আফিম এখানকার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, ইহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। (৫০) এখানে আফিংয়ের চাষ হইত—ইহার স্বপক্ষে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যবস্থা দ্বারা এখানে অহিফেন প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়, এইরূপ উল্লেখ পাওয়ায়, (৫১) এখানে উহা উৎপন্ন হইত বলিয়াই মনে হয়। আবার ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট হইতে ফরাসিদের প্রাপ্ত পরওয়ানায়, পাটনা হইতে বাঙ্গলায় অহিফেন আনিবার অনুমতি দৃষ্টে বুঝা যায়, তথা হইতেই উহা আসিত। (৫২) যাহা হউক যে সময় হইতে অহিফেন প্রস্তুত বন্ধ হয়, তখন হইতে প্রতি সেরে (দুই পাউণ্ড) ২৪৲ টাকা হিসাবে ডিউটি নির্দ্ধারিত হয়। তৎপরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের নিকট হইতে শেষবার চন্দননগর ফরাসীদের হস্তে আসার সময়ের চুক্তি অনুসারে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক মোট ৩০০ রাক্স অহিফেন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার মাসিক বিক্রীর গড়পড়তা দরে পাইয়া আসিতে-ছিলেন। (৫৩) এই ব্যবস্থারও পরে পরিবর্ত্তন হইয়া ইংরাজি ১৮৮৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক তিন সহস্র টাকা দেওয়া স্থির হয়। (৫৪) আর অবৈধ আমদানী রপ্তানী দমনার্থ আরও দুই সহস্র টাকা বাৎসরিক দিবার ব্যবস্থা হয়। (৫৫) এক্ষণে ঐ টাকার পরিমাণ মোট ৮০০০৲ টাকা হইয়াছে। মদ্যের ন্যায় আফিংয়েরও প্রতি বৎসর ডাক হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ইজারা লয়, সেই এখানে একমাত্র উহা বিক্রয় করিবার অধিকারী। ইজারদার বৎসরে বার মণ আফিং কিনিতে পান। এই বৎসর আফিংএর ডাক হইয়াছিল ৩৬০১০৲ টাকা।

অহিফেনের ন্যায় পূর্ব্বে লবণও কেহ এখানে প্রস্তুত করিতে পারিবেন না এই সর্ত্তে উহা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইত। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অহিফেন ও লবণ যে প্রকাণ্ড গুদামে রক্ষিত হইত, তাহা ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে ঐ বৎসরের ১লা আগষ্ট হইতে লবণের পরিবর্ত্তে বৎসরে ২০০০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়।

(৫০) Gazetteer of the World.
(৫১) The administration of the East India Company.
(৫২) ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের আলিবর্দ্দী খাঁর পরওয়ানা।—পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।
(৫৩) The administration of the East India Company.
(৫৪) Treaties Engagements and Sanads.
(৫৫) Imperial Gazetteer.

অভিশপ্ত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নন্দলালের পিতা হরলাল মিত্র সদ্বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, বিপুল সম্পদের অধিকারী হলেও, স্বেচ্ছাচারিতার দুর্দ্দমনীয় নেশায় মৃত্যুকালে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কেবল লোক-নিন্দার তীব্র জ্বালা। অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রে যাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণ বংশ-গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তিনি—অপব্যয়ের কঠোর অত্যাচারে সেই কীর্ত্তি পথের ধূলায় লুটিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ জীবনে কোন দিনই করেন নি।

পিতৃ-অপবাদে ব্যথিত পুত্র নন্দলাল—পিতার মৃত্যুর পর, বংশের সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প ক'রে সংসারের পথে পা দিল;—ভাগ্য-বিধাতা অলক্ষ্যে বসে হাসলেন! দু দিন গেল না—পিতৃব্য ধেয়ে এলেন সম্পত্তির দাবী করে। মামলা মকর্দ্দমার করাল নিষ্পেষণ হতে আত্ম-রক্ষা করতে না করতেই—যাকে সহযাত্রী ক'রে সে বড় আশায় বুক বেঁধে সংসারের কণ্টকময় পথে পা বাড়িয়ে-ছিল, সেই প্রিয়তমা পত্নী—সামান্য অভিমানের প্রতিশোধ নিতে এক দিন আত্মহত্যা করে', নন্দলালের সকল দৃঢ়তা, —সকল সঙ্কল্প এমনই ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেল, যে, মাতার সান্ত্বনা, পরিজনের অনুরোধ, পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ সে তীব্র বেদনার উপশম করতে সমর্থ হল না। জীবনের অতি প্রত্যূষেই ভাগ্য-বিধাতার নির্ম্মম হস্তে তার যে আশা-আকাঙ্ক্ষার অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, সেই ধ্বংসের স্তূপে দাঁড়িয়ে মনকে দৃঢ় করা নন্দলালের পক্ষে অসম্ভব হ'ল। সংসারের ওপর, স্ত্রী-চরিত্রের ওপর তার এমনই একটা বিতৃষ্ণা জন্মাল যে, হৃদয়ের সেই জ্বালাময়ী বিষদাহ নির্ব্বাপিত করতে—সুরার গরলধারা গলায় ঢেলে সে বিষে বিষক্ষয় করতে প্রয়াস পেল! ধীরে ধীরে দিনের পর দিন সেই বিষ তাকে গ্রাস করে বসল। পিতার যে অপবাদ মোচন করবার প্রতিজ্ঞা করে' সে সংসারে প্রবেশ করেছিল, উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই অপবাদের ক্ষতই তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলল। ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সকলের কাছে যে নন্দলাল অতি প্রিয় ছিল, সে অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের ঘৃণ্য, সংসারের উপেক্ষিত—রাস্তার মাতালে পরিণত হল।

বর্ষার নিবিড় মেঘে সেদিন আকাশ আচ্ছন্ন। মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে নন্দলাল যখন রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল, তখন রাত অনেকখানি হয়েছিল! পথিক-বিরল রাজপথে কেবল ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের মত—জলে-ভেজা গ্যাস-পোষ্টগুলা তখনও দাঁড়িয়ে কোন রকমে কর্ত্তব্য সম্পাদন করছিল। সঙ্গীহীন নন্দলাল স্খলিত পদে বাড়ীর দিকে ছুটে চলল। পিছিল পথ পদে পদে তাকে লাঞ্ছিত করছিল, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বাড়ীতে তাকে যেতেই হবে। মা হয়ত তখনও তার খাবারগুলি আগলে বসে আছেন; বাড়ী না ফিরলে দুরন্ত পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় হয়ত সারা রাত্রি ঘুমুতে পারবেন না। পৃথিবীর মধ্যে নন্দলালের ঐ একজন মাত্র আপনার জন ছিল—মা! যিনি তার প্রত্যেক নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত আপনার বুকে অনুভব করতেন।

টল্‌তে টল্‌তে দু' তিনটে রাস্তা পার হয়ে নন্দলাল বড় রাস্তায় পা দিয়েই দেখলে—সুমুখে দু' তিনজন পুলিস। সে অবস্থায় তাদের সম্মুখীন হলে অদৃষ্টে যে সারারাত্রি হাজতবাস সুনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে যে সারারাত্রি মাকে তার দুশ্চিন্তার আগুনে পুড়তে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তখনও নন্দলালের ছিল। পুলিশের চোখ এড়াতে সে তাড়াতাড়ি পাশের একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে আত্মগোপন করতে নন্দলাল গলির ভেতরের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই—পাশের একটা বাড়ীর দরজা থেকে কে একজন বলল—"আসুন না মশাই"—

কণ্ঠস্বর রমণীর! আকস্মিক ডাকে চম্‌কে উঠে নন্দলাল পাশের দিকে তাকাতেই দেখল,—একজন হতভাগিনী তাকেই আহ্বান করছে। রমণীর দিকে দুপা এগিয়ে গিয়ে নন্দলাল জামার পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করল। তার পর গা-ঢাকা দেবার উৎকৃষ্ট উপায়

বিবেচনা করে, বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে বলল—"চল, তোমার ঘরে।"

রমণী আগে আগে পথ দেখিয়ে তাকে নীচেকার একটা ঘরের সুমুখে নিয়ে এসে, তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে বলল। ছোট ঘর, এক পাশে একখানা তক্তাপোষের ওপর শয্যা; অপর পার্শ্বে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র। দেওয়ালের গায়ে একটা দেয়ালগিরি, মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। রমণী সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে নন্দলালকে শয্যার ওপর উঠে বসতে বলল। শয্যার ওপর বসে নন্দলাল ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌ল—"বাপ্‌রে! ঘরখানা যে একেবারে ঠাকুরঘর করে তুলেছ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হতে আরম্ভ করে তেত্রিশ কোটী দেবতার কেউ বাদ নেই দেখছি—মায় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু পর্য্যন্ত!

নন্দলালের কথায় রমণীর পাণ্ডুর মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে স্থির-কণ্ঠে বলল—"কেন বাবু, আমাদের কি ঠাকুর-দেবতা থাকতে নেই?"

"না না—তা বলছি না। তবে সাধারণতঃ মেয়ে-মানুষদের ঘরে এ সব ছবি দেখা যায় না কি না—তাই বলছিলাম।"

"সব মেয়েমানুষ কি সমান হয় বাবু—সবাই কি আর সখ করে এ পথে পা বাড়ায়"—

রমণীর কথায় নন্দলালের বড়ই কৌতূহল হল। সে বেশ একটু ব্যঙ্গ-স্বরে বলল—"তুমি কি তা হলে দায়ে পড়ে ভেক্ নিয়েছ?"

নন্দলালের মুখের ওপর রমণী তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো রেখে ধীরে ধীরে বলল——"থাক্ বাবু, ওসব কথায় কাজ নেই। আপনি বড় মাতাল হয়ে পড়েছেন—শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার মাথায় বাতাস করি।"

রমণীর কথায় উত্তরে নন্দলাল উত্তেজিত স্বরে বলল—"না, আমায় বলতেই হবে—কেন তুমি এ পথে দাঁড়িয়েছ। না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।" নন্দলাল বিছানার ওপর উঠে বসে রমণীর হাত চেপে ধরল।

করুণ কণ্ঠে রমণী বলল—"পুরাতনকে নেড়ে কোন ফল নেই বাবু"—কথাটা বলতে বলতেই রমণীর স্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল, সে নীচের দিকে চেয়ে আত্ম-সম্বরণ করে নিল।

রমণীর দিকে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে, নন্দলাল জামার পকেট থেকে একটা মদের শিশি বার করে খানিকটা গলায় ঢেলে বলল,—"বেশ—বলতে যদি তোমার আপত্তি থাকে—তবে থাক্—বলে কাজ নেই"—

"বলতে আপত্তি কিছুই নেই,—তবে শুনে কোন লাভ নেই। আজ দশ বছর কত লোকের কাছেই না বললাম, কিন্তু—এতটুকু সহানুভূতিও কারুর কাছে পাই নি—তাই—বলতে"—রমণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নন্দলাল বলে উঠল—"এখনিই না বলছিলে—সব মেয়েমানুষ—সমান নয়! সব পুরুষই কি সমান?" বলতে বলতে নন্দলালের মুখ কঠিন হয়ে উঠল, সে আরও কি একটা রূঢ় কথা বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"তা হলে থাক্—বলে কাজ নেই।" কথা কটা বলেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচেয় নেমে, পকেট থেকে দুটো টাকা ঝনাৎ করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে—পুনরায় বলল—"তাহলে চল্লাম—আবার আর একদিন আসব"—

নন্দলালের ব্যবহারে রমণী এতক্ষণ স্তম্ভিতা হয়ে বসে ছিল।—টাকার আওয়াজে চমক ভেঙ্গে সে দেখল, নন্দ-লাল টল্‌তে টল্‌তে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেচে। সে ছুটে গিয়ে নন্দলালের হাত দুটো চেপে ধরে ব্যথিত স্বরে বলল—"না—না—আপনি রাগ করে যাবেন না—আমি বলছি—আপনি দুঃখ করবেন না। আমি বড় হতভাগিনী তাই"—রমণী আর আপনাকে সামলে রাখতে পারল না, তার দুই চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল।

বিস্মিত নন্দলালের আর পা উঠ্‌ল না—ফিরে এসে সে পুনরায় বিছানার ওপর বসে পড়ল।

রমণী ঘরের দরজা বন্ধ করে এসে, শয্যার এক পার্শ্বে বসে বলতে লাগল,—

"আমাদের বাড়ী ছিল প্রয়াগে। ঘটনা-চক্রে কলকাতায় এসে কলকাতাবাসী হয়ে পড়েছি। আমার মা ছিলেন প্রয়াগের এক পাণ্ডার মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় তিনি বাপের বাড়ীতেই বাস করতেন। কলকাতার এক ধনী বাঙ্গালী-বাবু প্রয়াগে বেড়াতে গিয়ে মা'দেরই একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই বাড়ীখানি ছিল—মা যে বাড়ীতে থাকতেন, ঠিক তারই সুমুখে। পশ্চিমের

মেয়েরা বাঙ্গালীর মেয়েদের মত অত পর্দ্দানশিন নয়। কাজেই বাবুটির সঙ্গে মায়ের রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হত। বাবুটি অর্থবলে ধনী হলেও—চরিত্র-বলে বড়ই দরিদ্র ছিলেন। মায়ের ওপর তাঁর নজর পড়ল,—মায়ের রূপ-যৌবন তাঁকে আত্মহারা করে দিল। তিনি মাকে তাঁর ব্যভিচারের ফাঁদে ফেলবার নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। টাকার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছুই নেই; টাকার ভেল্কিতে বাবুটি মায়ের পিতার চোখ এমনই ধাঁধিয়ে দিলেন, যে, অতবড় শয়তানকে তিনি পরমাত্মীয়ের মতন অন্দরে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার দিলেন।

হিংস্র জন্তু কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না। মায়ের পিতার অতখানি বিশ্বাসের প্রতিদানে বাবুটি তাঁর বড় আদরের একমাত্র কন্যাটিকে আলেয়ার মিথ্যা আলোয় পথ ভুলিয়ে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেলেন। ব্যর্থজীবন নারী যখন আশা আকাঙ্ক্ষার ভরা জোয়ারে ভেসে চলে, তখন ধূর্ত্ত শঠ পুরুষ যে তাকে ভুলিয়ে ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! হতভাগিনী মা আমার কপট পুরুষের ছলনায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলল! বিপথের কাঁটার আঘাতে যখন তাঁর জ্ঞান হল, তখন পেছনের আলো নিভে গিয়ে সেখানেও ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করে ফেলেছিল,—হতভাগিনী আমি—বিশ্বের আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে মায়ের গর্ভে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। অঙ্কুরেই পাপ বিনষ্ট করতে বাবুটি পরামর্শ দিলেন। কিন্তু—মায়ের আমার প্রাণ ভরে উঠেছিল; শিশুর মধুমাখা হাসিটুকু কল্পনা করে' মাতৃ-হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহের ফল্গু তাঁর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে ছুটে চলেছিল। তাই মা বাবুটির কথা মত কাজ করতে অস্বীকার করলেন। বাবুটি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক যুক্তি-তর্কেও মাকে বোঝাতে না পেরে' কলঙ্ক প্রকাশের আগেই বাবুটি একদিন গা-ঢাকা দিলেন—মাকে আমার অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে। মায়ের সর্ব্বনাশের কথা বাড়ীর লোকের জানতে দেরী হল না। বাড়ীশুদ্ধ সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অনেক চিন্তার পর জাতি-কুল রক্ষা করতে, গত্যন্তর না দেখে, মায়ের পিতাও বাবুটির মত নৃশংস প্রস্তাব করলেন। মা কারুর কথাই কাণে তুললেন না। বাপের কথা অমান্য করায় মায়ের ওপর নানা প্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ হল। তবু—তবু—এই হতভাগিনীর মায়ায়—এই তুচ্ছ সন্তানের মায়ায়—মা আমার সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতেন। কিন্তু—অবশেষে সে অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল। হতভাগিনী শেষে অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে, নির্য্যাতনের হাত হতে আপনাকে মুক্ত করতে, এক বাল্য-বন্ধুর হাত ধরে অত সাধের—অত আপনার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মায়ের বন্ধু তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে মাকে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই উপকারের ঋণ শোধ করতে হয়েছিল মাকে আত্ম-বিক্রয় করে। স্বার্থপর সংসারে বিচারের আশা না দেখে, দিশেহারা মা আমার সেই বাল্য-বন্ধুকেই কাণ্ডারী করে' জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—বিশ্বের অকূল পাথারে! জন্মাবধি আমি মায়ের সেই বাল্যবন্ধুকেই পিতা বলে জানতাম!

সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। আমাদের অভিভাবক রেলে চাকরী করতেন, মাইনে খুব বেশী না হ'লেও মোটা পাওনা ছিল। আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল। কিন্তু বিধাতার মনে তাও সইল না। বিধাতারই বা দোষ কি—অদৃষ্টের ফল ফলবেই। আমার বয়স তখন দশ বছর, হঠাৎ এক দিন আমাদের একমাত্র অভিভাবকটি জ্বর নিয়ে কর্ম্মস্থল হতে বাড়ী ফিরে এলেন। চিকিৎসা-যত্নের ত্রুটী ছিল না; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তিন দিনের জ্বরে তিনি আমাদের নিকট হতে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মা খুবই মুসড়ে পড়লেন, তবে সময়ে সব সহ্য হয়—আমাদেরও সয়ে গেল। মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল, গহনাপত্রও মন্দ ছিল না,—তাই নেড়ে-চেড়ে মা আমাদের দুজনার অন্ন সংস্থান করতেন। আমি স্কুলে পড়তাম। মায়ের ইচ্ছা ছিল—লেখা পড়া শিখে যাতে আমি আমার আপন জীবিকার পন্থা খুঁজে নিতে পারি। আমি পড়তাম, খেলা করে বেড়াতাম, বেশ নিশ্চিন্তি মনে মায়ের বুকে মাথা রেখে দিন কাটিয়ে দিতাম। সংসারের কোন কথা জানতামও না—ধারও ধারতাম না। দেখতে দেখতে দু'তিন বছর কেটে গেল,—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপ-যৌবনের তীব্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক বড়লোক আমাকে পাবার জন্য মাকে প্রলোভন দেখাতে লাগল, অনেক লোক আত্মীয়তা করতে এল; কিন্তু মা কোন

প্রলোভনেই ভুললেন না। একটা ভুলের ধাক্কা সামলাতে যাকে সারা জীবন ব্যর্থতার পাষাণে আছড়ে মরতে হচ্ছে, সে কি মানুষের কথায় আর ভোলে!

মানুষের বিষ-নজর থেকে আমাকে রক্ষা করতে, মা স্কুল থেকে আমার নাম কাটিয়ে দিলেন। বাড়ীতে বসেই লেখা পড়া করতাম, আর মাকে সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে সাহায্য করতাম। কিন্তু মার কপাল চিরে বিধাতা-পুরুষ শুধু দুঃখের আঁচড়ই টেনে রেখেছেন,—তাঁর সুখ কোথায়! মানুষের চোখ এড়িয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে ত' আর ভাগ্য-বিধাতার চোখ এড়ান যায় না! সহরের মধ্যে এত লোক থাকতে বেছে বেছে মাকেই আমার কাল বসন্ত রোগ এসে আক্রমণ করল। মাকে বাঁচিয়ে তুলতে জীবন মরণ পণ করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করলাম; কিন্তু মায়ের আমার দুনিয়ার মেয়াদ ফুরিয়েছিল—কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না।—যে একটু আলোর শিখা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাও চিরদিনের মত নিভে গেল!

মরবার আগে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে মা আমাকে তাঁর জীবনের সকল ইতিহাস বলে গিয়েছিলেন। আমার জন্মদাতার পরিচয় আমি সেই সময় পাই। জন্মদাতা পিতাকে চক্ষে কোন দিন দেখিনি।—একখানা ছবি ছিল, মা এত দিন ইচ্ছা করেই আমাকে সেখানা দেখতে দেন নি। মরবার পূর্ব্বে সেই ছবিখানা আমায় দিয়ে বলে গিয়েছিলেন—আমার পিতা কলকাতার বিখ্যাত ধনী, তাঁর দ্বারস্থ হয়ে তাঁকে সকল কথা বলতে পারলে—পিতা তিনি—নিশ্চয় আমার একটা পথ দেখিয়ে দেবেন।

পিতার ছবিখানা বুকে ধরে মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে কতদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলাম। সহায়-হীনা একলা মেয়ে মানুষ—রূপ যৌবন নিয়ে কি করে কলকাতায় গিয়ে পিতার সন্ধান করব! ভেবে অস্থির হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসার ঠিক সামনে এক পণ্ডিত বাস করতেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করে জল গ্রহণ করতেন না।—তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে সব কথা বললাম। আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি আমাকে অভয় দিলেন।—অকূল পাথারে কূল পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। নিজের সব শোক দুঃখ ভুলে, তাঁর কথামত যা-কিছু ছিল সব বেচে কিনে, তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এলাম—পিতার সন্ধান করতে। কি সে আশা—কি সে উৎসাহ!

কলকাতায় এসে আমরা একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম। সেই হোটেলে থেকে পাঁচ-সাত দিন পণ্ডিত মহাশয়—সারা কলকাতা সহরে পিতার খোঁজ করে বেড়ালেন; কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। আমাকে বোঝালেন—এত বড় সহরে শুধু নাম আর একখানা ছবি নিয়ে মানুষকে খুঁজে বের করা তাঁর মত একজন বিদেশীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়! যা বোঝালেন তাই বুঝলাম। হোটেলে বেশী দিন বাস করায় নানা অসুবিধা হতে লাগল। তাঁর পরামর্শ মত একটা বাড়ীর দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে সেইখানে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। বড় আশায় বুক বেঁধে ছিলাম,—কিন্তু এক এক দিন করে বছর কেটে গেল—সুদিন আর এল না। অদৃষ্টের চক্র আরও একপাক ঘুরে গেল। ক্রমে ক্রমে পিতার আশায় হতাশ হয়ে পড়লাম।

বলতে লজ্জায় জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, হৃদ্‌পিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়—সেই ব্রাহ্মণ নামধারী ভণ্ড, চণ্ডাল দিনের পর দিন এই সুদীর্ঘ সময় মাকড়সার মত তার কুটিলতার জালে আমাকে জড়িয়ে ফেলছিল—আমি বুঝতে পারি নি! শোকে, দুঃখে, ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমার বোঝবার ক্ষমতাও তখন ছিল না। তার কূট কথায় বিশ্বাস করে' তার সেই পৈশাচিক বেষ্টনীর মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করলাম। আমাকে আর্য্য-সমাজের মতে বিবাহ করবার প্রলোভন দেখিয়ে ধীরে ধীরে সে আমাকে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে নিক্ষেপ করল। তখন আর আমার উপায় ছিল না;—সংসার-জ্ঞানশূন্যা একাকিনী বালিকা আমি—সাধুর আবরণে ঢাকা শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে তখন আমি সর্ব্বস্বহারা!

এক এক করে অর্থ, অলঙ্কার সব লোপ পেতে লাগল—তবু পিতার সন্ধান পেলাম না। শয়তান যে আমাকে এত দিন মাত্র স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছিল—সেটা সেই দিন বুঝতে পারলাম, যে দিন সে বিবাহ করা দূরের কথা—তস্করের মত আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, আমাকে হিংস্র সংসারের করাল গ্রাসে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল! উঃ—কি ভয়ঙ্কর সেই দিন! হাতে একটি পয়সা নেই—সহায়

সম্পদ কিছুই নেই—একা আমি! ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকারে আমি দিশেহারা। কি সে ভয়ঙ্কর দিন! দু' তিন মাসের ভাড়া পাওনা ছিল, বাড়ীওয়ালা দূর দূর করে রাস্তায় বের করে দিল। যা জীবনে কোন দিন করি নাই—লোকের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতলাম। দোরে দোরে দাসীবৃত্তি করে ফিরলাম। মাতার শেষ অনুরোধ—সৎ-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে প্রাণপণ করলাম; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল! দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে—অসহায়কে আশ্রয় দিতে কেউ মাথা ঘামায় না,—আর্ত্তের আর্ত্তনাদ—অরণ্যে রোদন! সংসারের কূটচক্র হতে আপনাকে রক্ষা করতে পারলাম না। দুরদৃষ্টের ঘাত প্রতিঘাতে আজ এইখানে এসে পৌছিচি—এর পর কোথায় যাব—ভাগ্য-বিধাতাই জানেন।"——অশ্রুজলে রমণীর কণ্ঠ-রোধ হয়ে গেল। রমণী চুপ করতেই—নন্দলাল বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,—"তোমার বাপের সেই ছবিখানা এখনও কি তোমার কাছে আছে?—আমাকে একবার দেখাতে পার?—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি সেই পাষণ্ডকে।—"

"দেখ্‌বেন?—সত্যি দেখ্‌বেন? আর এমনভাবে জীবন কাটাতে পারি না—আর এমন করে"—রমণীর মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরুল না। সে কম্পিত হস্তে নন্দলালের হাত দুখানা চেপে ধরে নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগল।

উত্তেজিত নন্দলাল রমণীর কথার উত্তরে উচ্চৈঃস্বরে বলল "নিশ্চয় দেখব! দেখাও দিকি ছবিখানা—আর বল—কি তার নাম!"

অতি আগ্রহে রমণী ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে কাগজে জড়ান একখানা ফটো বার করে এনে নন্দলালের হাতে দিল। বহুদিনের পুরাতন ছবি, কালের ছোপ ধরে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোর কাছে ছবিখানা ধরে' নন্দলাল ছবিখানার দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। তার মনে হল, সারা পৃথিবী যেন তার পায়ের তলায় দুলে উঠেছে—কি এক দারুণ সঙ্কোচে তার সমস্ত রক্তস্রোত যেন হৃদ্‌পিণ্ডের দ্বারে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল!—এ কার ছবি রমণী লজ্জার আবরণে জড়িয়ে তার হাতে তুলে দিল! ঘূর্ণিত-মস্তক নন্দলাল আর্ত্ত, জড়িত-কণ্ঠে—রমণীকে জিজ্ঞাসা করল—"এ কে?—কি এঁর নাম?"—

"মায়ের কাছে শুনেছিলাম—হরলাল মিত্র।"

"উঃ!"—একটা বজ্রবেদনার আঘাতে নন্দলালের সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠ্‌ল—একটা বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ তার হৃদয়কে চৌচির করে বেরিয়ে এল! উঃ!—ভগবান! এমনি করেই কি পিতার অকীর্ত্তির বোঝা পুত্রের মাথায় চাপিয়ে দিতে হয়!

নন্দলালের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা রমণী জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি এঁকে চেনেন ——উনি কে?"

কে? কে?—অট্টহাস্যে ঘরের চারদিক থেকে প্রতি-ধ্বনি উঠ্‌ল—কে? কে?—

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় ভার বাড়িয়া গেল। সেই হইতেই আশু প্রকাশ্যে ও গোপনে গরীব ছাত্রগণকে সাহায্য করিতে লাগিল। সমস্ত সংসারই তাহার উপর। যত্র আয় তত্র ব্যয়। তখন হইত ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃগণ বিলাত যাইতে লাগিল। পিতৃদেব ইন্‌কাম ট্যাক্সে ভাগলপুরে অনেক গরীবকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় সরকার বাহাদুর নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াতে ৮০০৲ শত টাকার গ্রেডে ৫০০৲ শত টাকা বেতন। নামে Senior হইয়াও ঐ junior-এর বেতনের টাকার বেশী পান নাই।

সেই হিসাবে পেন্সন ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়া যায়। শ্রীমান যোগেশ তখন ৮বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ হইতে ছুটী লইয়া বিলাত গমন করে ও অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়। প্রমথ সেই সময়েই বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিল। আশুর পরিশ্রমের একশেষ ও চারিদিকে ভাবনা; এবং নানা প্রকারে উদ্বেগের কারণ থাকিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ

হঠাৎ সেই সময় পিতৃদেব পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা সেবা কোন দিকেই কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই।

আশু হাইকোর্টের পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃ-দেবের নিকটেই বসিয়া প্রত্যহ তাঁহার পদসেবা করিত। বধূমাতা প্রতিভাদেবী শ্বশ্রূদেবের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পিতৃদেব বধূমাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বধূমাতার সুশীল নম্র ব্যবহারে তাঁহার মনে আনন্দ হইত। তিনি শ্বশ্রূকে প্রতিদিন সায়াহ্নে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনাইতেন ও সর্ব্বদাই কাছে কাছেই থাকিতেন। অমন কঠিন রোগেও পিতৃদেবের মন কিছুমাত্র দমিয়া যায় নাই, প্রফুল্লচিত্তে তিনি সমস্ত ব্যাধির কষ্ট সহ্য করিতেন।

জ্যেষ্ঠতাত ৺রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ও ঐ পক্ষাঘাত রোগেই এক বৎসর নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তরে যান। উভয় ভ্রাতার—পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের কিছু-মাত্র মৃত্যু-ভয় না থাকায়, তাঁহারা কখনই কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন হইতেন না। দেখিতে দেখিতে পিতৃদেবের পীড়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল; তিনিও সেই জ্যেঠামহাশয়ের মত এক বৎসর নয় মাসের মধ্যে লোকান্তরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৪।৬৫ বৎসর। পুরুষের পক্ষে ইহাকে অকাল ও অসময় মনে করা যায়। তিন ভাই বিলাত প্রবাসে,—স্নেহশীল পিতৃবিয়োগে আশু একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেও, কাহারও নিকট সান্ত্বনা পাইবার জন্য প্রয়াস করিত না।

আশু আদি-সমাজের দীক্ষিত ব্রাহ্ম হইয়াও মাতৃ-আজ্ঞায় পিতৃশ্রাদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে করিয়াছিল। ইহা পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত পুত্রের উপযুক্ত কাজই হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষিদেব মনে করেন।

পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে আশু অতিশয় শোকাকুল হইয়া ধর্ম্মতলার বাটী পরিত্যাগ করিয়া আবার লোয়ার সারকুলার রোডে একটী বৃহৎ দোতালা-তিনতালা রকমের বাটীতে উঠিয়া যায়। এই অদ্ভুত বাড়ীতে ভূত্যগণ অনেক ভূত দেখিত—সব সাহেব মেম। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বাড়ীতে নাকি লর্ড ক্লাইব পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তাই ভৃত্যেরা বিদেশী ভূত কল্পনা করিত। সে বাটীটী এক্ষণে "সরকারী" ছাপাখানা।

এখন হইতে আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন আশু মফঃস্বলে যাতায়াত করিত। এই গৃহেই তৃতীয় পুত্র সুদর্শন শিবকুমারের জন্ম হয়। শ্রীমান কুমুদও তাহার পরেই বিলাত যাত্রা করে। ক্রমে চারি ভ্রাতা প্রবাসে চলিয়া যাওয়াতে আশু একা হইয়াই পড়ে।

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ আশুর পরিশ্রমে কোনরূপ বিরাম ছিল না—তাহার উপর সভা সমিতিতে সর্ব্বদাই যোগ দিত। যে যেখানে ডাকিয়াছে, আশু হাস্যমুখে সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির আসনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভিভাষণে আশু মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল "বিজিত জাতির রাজনীতি নাই" ("A subject race has no politics")। এই মহাবাক্য তাহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র সভায় একটা অভূতপূর্ব্ব জনকোলাহলের তরঙ্গ বহিয়া যায়,—যুবা, বৃদ্ধ, কলেজ-স্কুলের ছাত্রবর্গের করতালিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠে। "ভিক্ষানীতির" বিরুদ্ধে এই প্রথম নির্ভীক প্রতিবাদ। এই বাক্যে বঙ্গদেশের গ্রাম, পল্লী, সহর—চারিদিক দাবাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এই আন্দোলনে "ইংলিশম্যান" প্রভৃতি সংবাদপত্র নানা প্রকার অপ্রিয় সমালোচনায় "Vile sedition" বলিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেও ছাড়িল না। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিল আশু। তিনিও পূর্ণমাত্রায় সকল দিক হইতে আশুর সাহায্য পাইয়াছিলেন।

নানা স্বদেশী কলকারখানার সাহায্য-কল্পে প্রচুর অর্থ দানে আশু কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রধানতঃ তাহারই উদ্‌যোগে প্রথম স্বদেশী কাপড়ের কল "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া আশু "National Council of Education" (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করে। অর্থ সামর্থ্য দানে প্রাণপণ চেষ্টায় আশু তাহার উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার গৃহে যে সব আত্মীয় ছাত্র থাকিয়া তাহারই অর্থ-সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস করিত, আশু তাহাদিগের অনেককেই সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সাহায্য করে। আজীবন জাতীয় প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া কর্ম্মবীর আশুতোষ নিজ হস্তে এই সেদিন যাদবপুরে বিরাট

কর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে মাতৃপূজার আয়োজন করিয়াছিল। আজ সেই মহাযজ্ঞের হোতা কোথায়? ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ পুত্র ও সেবক আশুতোষকে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে কেহ বাধা দিতে পারিলেন না। সেই ভগ্ন শরীরে যাদবপুরে যাইয়া আশু অমিত পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহার আশা ছিল, নিজ হস্তে যে বীজ রোপণ করিল, সেই বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক ফল পুষ্পে সমস্ত দেশ সুশোভিত করিবে; এবং আশু তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থক-মনোরথ হইয়া যাইবে। বঙ্গ জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সে আশা ফলবতী হইতে পারিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা প্রবর্ত্তনের সময় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে চৌধুরী আশুতোষ কায়মনোবাক্যে সাহায্য করে এবং দুই আশু একত্র হইয়া ভ্রাতৃবৎ সখ্যতায় কার্য্য করিয়াছিল।

"Bengal Landholders' Association" তাহার জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি! পূর্ব্বে অনেক সময়েই সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা বনিয়াদি জমীদারবর্গ লাঞ্ছিত হইতেন ও আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া তোষামোদে উপরালাদিগের নিকট যুক্ত-করে থাকিতেন। তাঁহাদিগের এই দুর্গতি মোচনার্থ আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদারবর্গকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনচেতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের সাহায্যে "Landholders' Association" এর সৃষ্টি করিয়া লইলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ানে তাঁহার মান রক্ষা হয় নাই। তখন অতি উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই সমিতি এমন সুদৃঢ় রূপে গঠিত হয় যে, বড়-ছোট লাট মহোদয়গণ সমিতির কার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হইলে বঙ্গবাসীগণ ক্ষোভে দুঃখে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন শ্রীযুত (স্যার) আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদার-পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান, তাহাতে লর্ড কার্জ্জনের মত Viceroyকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, "It was the ablest and strongest protest produced by the opposition." ১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে টাউন হলে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে শ্রীমান যোগেশ অশ্বারোহণে ছাত্রবর্গ ও আশুতোষের পাড়ার ছোট ছোট বালক ও আত্মীয়-স্বজনগণকে সঙ্গে করিয়া সভায় যোগদান করিতে যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে এই অলীক সমাচার প্রচারিত হইয়া গেল যে পুলিসে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। সেই আদেশ সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

বিকালবেলা বিলোপ ত্রিলোককে বলিল—জ্যাঠামশায়, বেড়াতে যাবেন?

মলয় ত্রিলোককে জ্যাঠামশায় বলিতেছে দেখিয়া বিলোপও তাঁহাকে জ্যাঠামশায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ত্রিলোক বলিলেন—তোমার সকালবেলা অসুখ কর্‌ছিলো.....

বিলোপ ত্রিলোককে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই হাসিয়া বলিল—সে কিছু নয়—ও নোনাজলের সামান্য একটু উপদ্রব!

বিলোপ অশ্রুজলকেই নোনাজল বলিল, কিন্তু তাহার এই শ্লেষ কেহই বুঝিতে পারিল না। ত্রিলোক কিছুই না বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং সেই জন্যেই মলয় ও মৃদুলা হাসিল।

ত্রিলোকবাবুর হাসি থামিলে তিনি মলয় ও মৃদুলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—চলো তবে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

বিলোপ বলিল—না না, ওঁদের বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই, মলয়টা একদম হাঁট্‌তে পারে না, আর মিস্ ভট্টাচার্য্যের শরীরটা কাল থেকে ভালো নেই।

মৃদুলা এই কথাতে লজ্জা পাইয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া বলিল—অসুখ তো আপনারও করেছিলো।

বিলোপ হাসিমুখে বলিল—আমায় আর আপনাতে ঢের তফাৎ—আমি বজ্রাদপি কঠোর, আর আপনি মৃদুলা কুসুমাদপি।

বিলোপের এই কথারও শ্লেষ কেহ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না, তথাপি ত্রিলোক উচ্চহাস্য করিলেন, মৃদুলা লজ্জিত মুখ নত করিল এবং মলয় কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বোকার মতন হাসিভরা মুখে এক-একবার সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

ত্রিলোক বলিলেন—তবে চলো বাবা আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

বিলোপ যবে থেকে ত্রিলোককে জ্যাঠামশায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তবে থেকে ত্রিলোকও তাহাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছেন।

ত্রিলোক ও বিলোপ বেড়াইতে চলিলেন। মৃদুলা তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার আগ্রহ আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিল না এবং মলয় তো একবার ভদ্রতার খাতিরেও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই, কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল বিলোপ ত্রিলোক-বাবুকে লইয়া একান্তে গিয়া তাহাদেরই বিবাহের ঘটকালি করিবে; এবং কিছুক্ষণের জন্য সে মৃদুলার নিকটে একাকী থাকিবার সুযোগ পাইবে এ প্রলোভনটাও অবহেলা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

বিলোপ বেড়াইতে বেড়াইতে ত্রিলোককে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এখানে আর কতদিন থাক্‌বেন?

ত্রিলোক বলিলেন—যতকাল জগন্নাথ আমাকে রাখ্‌বেন। এখানে থাক্‌লে অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সমুদ্রের বিরাট্ মন্দিরে জগন্নাথের দর্শন পাই, তাই এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না; এবারকার জীবনযাত্রাটা এইখানেই শেষ কর্‌বার ইচ্ছা আছে।

বিলোপ বলিল—এখন আপনার গেলে তো চল্‌বে না, আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী না করা পর্য্যন্ত তো আপনার ছুটি মিল্‌বে না।

ত্রিলোক ফাঁকা রকমে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে তো মৃত্যু লক্ষ্য কর্‌বে না.....

বিলোপ ত্রিলোকের কথা অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার কথার মাঝখানেই বলিল—সেইজন্যেই তো ওঁর বিয়ের জোগাড় এখন থেকেই করা উচিত; আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে আমি ঘটকালি করি, আমার সন্ধানে একটি বেশ ভালো পাত্র আছে।

ত্রিলোক বিস্ময়-ও-কৌতূহল-মিশ্রিত দৃষ্টিতে বিলোপের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—একটি সৎপাত্র আমিও অনেকদিন থেকে মনে মনে ঠিক করে' রেখেছি; সেই বর বা বরকর্ত্তার দিক্ থেকে আমার মেয়েকে বধূরূপে বরণ করে' নেবার আগ্রহের পরিচয় পেলেই আমি আমার মৃদুলাকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে' নিশ্চিন্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌তে পার্‌ব।

বিলোপ বলিল—কিন্তু আপনি আপনার কন্যাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তাঁর মননশক্তি বিকশিত করে' তুলেছেন, তাঁর নিজের ভালোমন্দ বিচার কর্‌বার মতন বয়স পর্য্যন্ত আপনি তাঁকে অনূঢ়া রেখেছেন; এখন তাঁর নিজের অনুরাগ বিরাগ অনুসারেই তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা উচিত।

ত্রিলোক বলিলেন—তা' তো নিশ্চয়ই। আমি যে পাত্রটিকে নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছি তার প্রতি মৃদুলারও অনুরাগের পরিচয় আমি মাঝে মাঝে পেয়েছি।

বিলোপ বলিল—একের প্রতি অনুরাগ পরে অপরের প্রতি অনুরাগের দ্বারা আচ্ছন্ন এমন কি বিদূরিতও হতে পারে তো।

ত্রিলোক বলিলেন—তা পারে। কিন্তু হিন্দুর মেয়ের সংস্কার এমন প্রবল এবং তাদের সতীত্বের ধারণা এমন বদ্ধমূল যে তারা বাগ্‌দত্ত স্বামীর প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরক্ত হয়ে থাকে।

বিলোপ বলিল—কিন্তু শিক্ষার ফলে চিত্ত সংস্কার-মুক্ত হয়ে থাকে, এবং আপনার কন্যাকে আপনি সে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি জান্‌তে পেরেছি তাঁর চিত্ত বাগ্‌দত্ত পাত্রের দিকে বিমুখ হয়ে অন্য পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। আমি তাঁদের উভয়ের সম্মতিক্রমে ঘটকালি কর্‌বার ভার নিয়েছি।

ত্রিলোক কৌতূহলে উৎসুক হইয়া বিলোপের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পাত্রটি কে ?

বিলোপ বলিল—মলয়।

ত্রিলোক সন্দেহ-মুক্তির আনন্দে উচ্চ-হাস্য করিয়া বলিলেন—মৃদুলার বাগ্‌দত্ত পাত্রও ঐ মলয়।

ত্রিলোকের এই কথা শুনিয়া বিলোপের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, সে বলিয়া উঠিল—সে কি রকম ?

ত্রিলোক বলিতে লাগিলেন—মলয়ের বাবা আর আমি ছেলেবেলা থেকে এম্-এ পাশ করা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছিলাম। আমাদের যখন বিবাহ হয় তখন একদিন আদিত্য কথায় কথায় আমাকে বলে—'দেখো ত্রিলোক, আমাদের দুজনের মধ্যে যার ছেলে বড় হবে তাকে অন্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।' আমিও তার এই প্রস্তাবে আনন্দে সম্মতি দিয়েছিলাম। তার পর আমি স্কুলমাষ্টার হয়ে কলম্বো চলে' যাই। অনেকদূরে গিয়ে পড়েছিলাম বলে' দেশে আসার সুযোগ প্রায়ই ঘটতো না। প্রথম প্রথম কিছুদিন আদিত্যের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা-লেখি হতো। আদিত্যের চিঠিতেই খবর পেয়েছিলাম যে সে এটর্নী হয়েছে, তার একটি ছেলে হয়েছে,তার নাম রেখেছে মলয়, আমার মেয়ে হলে সেই মলয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। কিছুদিন পরে মৃদুলার জন্ম হয়, আর মৃদুলাও মাতৃহীন হয়। সেই থেকে দেশে আর ফিরে আসি নি, সেখানেই মৃদুলাকে অনেক কষ্টে মানুষ করে' তুলেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। ক্রমশঃ আদিত্যের চিঠি দুর্লভ হতে হতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। আমি সম্প্রতি কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি শুধু আদিত্যের ছেলে মলয়ের সন্ধান নেবার জন্যে। মলয় যদি শিক্ষিত সচ্চরিত্র হয় আর এখনো যদি তার বিয়ে না হয়ে থাকে এবং আদিত্যেরও যদি আগ্রহ দেখি তা হলে মলয়ের সঙ্গেই মৃদুলার বিয়ে দেবো, নতুবা অন্য একটি সৎপাত্র সন্ধান কর্‌বো এই ছিলো আমার দেশে ফিরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে এসে তোমার কল্যাণে মলয়কে অপ্রত্যাশিত রকমে পেয়ে গেলাম। মৃদুলা ছেলেবেলা থেকেই মলয়কেই তার বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে' জানে। এখন যদি মলয় মৃদুলাকে পছন্দ করে, আর আদিত্য এদের মিলন অনুমোদন করেন তা হলে আমি মৃদুলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে' নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ত্রিলোকের মুখ চির-পোষিত আশার সফলতার সম্ভাবনায় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্রিলোকের কথা শুনিতে শুনিতে বিলোপের মনে হইল—আ হরি! সমস্তই আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে, আমার ঘটকালি একেবারে পণ্ডশ্রম, আমি এদের মিলনের মধ্যে একেবারেই অনাবশ্যক! আগে হইতেই সমস্তই ঠিক হইয়া আছে বলিয়া মৃদুলা এতো সহজে মলয়ের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছে এবং মলয়ও মৃদুলার অনুরাগের আকর্ষণে তাহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছে! মলয়ের পক্ষ হইতে মনোভব যে ঘটকালি আরম্ভ করিয়াছিল, মৃদুলার পক্ষ হইতে স্বয়ং প্রজাপতি সেই ঘটকালিকে প্রণয় হইতে একেবারে পরিণয়ে পরিণত করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন!

বিলোপ ত্রিলোককে বলিল—তা হলে আপনি মলয়ের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বিবাহের প্রস্তাব করলেই তো শুভকর্ম্ম সত্বর সম্পন্ন হয়ে' যায়।

ত্রিলোক হাসিমুখে বলিলেন—না বাবা, কন্যার মেয়ে বলে'ই বরপক্ষের অনুগ্রহ প্রার্থনার গরজ আমার নেই। ন রত্নম্ অন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ। অধিকন্তু আমাদের পুত্রকন্যার বিবাহের প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন আদিত্য, আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম; আমার প্রতিজ্ঞার অংশ আমি পালন করেছি—আমার মেয়েকে আমি যথাসম্ভব শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আজ পর্য্যন্ত তাঁরই পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রতীক্ষায় তাকে অবিবাহিত রেখেছি, এবং যতদিন না তাঁর পুত্রের বিবাহ হচ্ছে ততদিন আমার কন্যার বিবাহের জন্য অন্য পাত্র সন্ধান কর্‌বো না স্থির করে' রেখেছি।

ত্রিলোকের এই কথা শুনিয়া বিলোপ কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে তবে মলয় ও মৃদুলার মিলন ঘটাইতে তারও কিঞ্চিৎ আবশ্যক আছে; ত্রিলোকবাবুর কাছে ঘটকালি করিতে আসিয়া সে অনাবশ্যক হইয়া গেলেও তাহার আবশ্যকতা একেবারে নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া যায় নাই, মলয়ের পিতার নিকট প্রজাপতির দৌত্য করিবার জন্য তাহাকে প্রয়োজন হইবে। মলয় ও মৃদুলা সমাসবদ্ধ হইবার জন্য যদি পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া

থাকে, সে হাইফেন হইয়া উহাদিগকে যোগযুক্ত করিয়া দিবে; বন্ধুকে সুখী করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে।

বিলোপ তাহার এই সঙ্কল্প ত্রিলোকবাবুর কাছে প্রকাশ করিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

বিলোপকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ত্রিলোকও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলেন।

(৯)

ত্রিলোকবাবু আর বিলোপ বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পর মলয় বিলোপকে প্রথম একলা পাইয়াই প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ঘটকালির কি হল ?

বিলোপ হাসিমুখে বলিল—লাইন ক্লিয়ার। কেবল পরের ষ্টেশনের ডিস্ট্যান্ট্ সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন্ কর্‌তে পার্‌লেই তোমাদের দু'জনের গাঁটছড়া বাঁধা স্পেশাল ট্রেণ ডেষ্টিনেশনে পৌঁছে যাবে।

মলয় উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডিস্ট্যান্ট্ সিগ্‌ন্যালটা কি বা কে ?

বিলোপ বলিল—তিনি তোমার বাবা।

মলয় মৃদুলাকে লাভ করিবার আগ্রহে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে তাহার নিজের বাড়ীর দিক্ হইতেও এই মিলনের বাধা আসিতে পারে; তাই এই অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার কথা বিলোপ স্মরণ করাইয়া দিতেই তাহার মুখ শুখাইয়া উঠিল। কথামালার একচক্ষু হরিণের মতন যেদিক্ হইতে সে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল সেদিক্ হইতে কোনো বিপদ আসিল না, কিন্তু যেদিক্ হইতে কোনো বিপদের সম্ভাবনার কথাও তাহার মনে উদিত হয় নাই সেই দিক্ হইতেই বিপদের আশঙ্কা তাহাকে বিমনা করিয়া তুলিল। তাই সে ভয় ও আগ্রহের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল—বাবা যদি মৃদুলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি করেন সে আপত্তি আমি মান্‌বো না; আমি মৃদুকেই বিয়ে কর্‌বো, তার জন্যে বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন তাতেও আমি ক্ষান্ত হবো না।

মলয়ের প্রণয়াবেগ দেখিয়া বিলোপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তোমার বাবার আপত্তি হবারও কোনো ভয় নেই। মৃদুলা তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী; তোমাদের জন্মের পূর্ব্বে দুই বন্ধু স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁদের পুত্রকন্যা হলে তাদের বিবাহ দেবেন। মৃদুলার পিতা তোমার জন্যেই মৃদুলাকে শিক্ষায় অলঙ্কৃত করে' এত বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছেন। মেয়ে যে ছেলের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয় এই ধারণা থেকে মেয়ের পিতা ছেলের পিতার কাছে নিজের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করবেন না স্থির করেছেন। তোমার বাবা মৃদুলাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌বামাত্রই কন্যার পিতা সম্মতি দেবেন। তোমার বাবার সম্মতি নেবার ভার আমার উপরেই রেখে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

বিলোপের কথায় মলয়ের মুখে সন্তোষের ও বিস্ময়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, সে প্রফুল্ল-মুখে বলিল—এ যে একেবারে রীতিমতো নভেল! আমরা দুজনে বাগ্‌দত্ত, অথচ এতদিন আমরা কেউ সেই খবরের বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারি নি!

বিলোপ বলিল—মৃদুলা জানে। মৃদুলার বাবা কন্যাকে তার ভাবী স্বামীর পরিচয় দিয়ে স্বামীর ভাবটিকে ভালোবাস্‌তে শিখিয়ে রেখেছেন।

বিলোপের এই কথা শুনিয়া মলয়ের মুখ পুনর্ব্বার ম্লান হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে এত বড় একটা কথা গোপন করিয়া রাখিবার নয়, তথাপি তাহার পিতা যে কখনও এ কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ হয়তো পূর্ব্বের অঙ্গীকার অস্বীকার করিবার ইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে বলিল—তাহলে তো আমারই জিত।.....

—আপনার আবার কিসে জিত হলো? এই কথা বলিতে বলিতে মৃদুলা হাসিমুখে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মলয় মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল মুখে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—তুমি আমাকে তোমার বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে' জেনে' যে ভালোবাসা অদেখা আমাকে দিয়ে রেখেছিলে সেই ভালোবাসাই দেখা আমাকে সমর্পণ করেছো। আর আমি তোমাকে কেবল তুমি বলে' জেনেই ভালোবেসেছি,তোমাকে আমার পত্নীত্বে বরণ কর্‌তে চেয়েছি। এতে আমারই জিত্!

মৃদুলা মলয়ের কথার আরম্ভেই লজ্জা পাইয়া দ্বারের নিকটে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলো, মলয়ের কথা শেষ হইতেই সে লজ্জারুণ স্মিত-মুখে একবার চকিতে দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলো।

(ক্রমশঃ)

সাইকেলে দার্জ্জিলিং

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়

এবার বেরুবার সময় আমাদের ভয়ানক লোকাভাব হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য বার আমরা ১০।১১ জনের কম বেরুতুম না; কিন্তু এবার গ্রীষ্মের ছুটী পড়ে যাওয়ায়, ক্লাবের মেম্বররা বেশীর ভাগই এখানে ছিল না। এখানে ব'লে রাখা ভাল যে, সাইকেলে দূরে বেড়াতে যাবার জন্যে

যখন ঠিক হ'ল যে এবার দার্জিলিং যাওয়া হবে, তখন আমরা তিনজন মাত্র এখানে ছিলুম। অবশ্য লোক কম বলে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিলুম; কিন্তু এই আইডিয়াটা আমাদের নেশার মত পেয়ে বসেছিল; তাই কোন বাধা-বিঘ্ন না মেনে বেরিয়ে পড়াই ঠিক করা হল। দার্জিলিংটাই

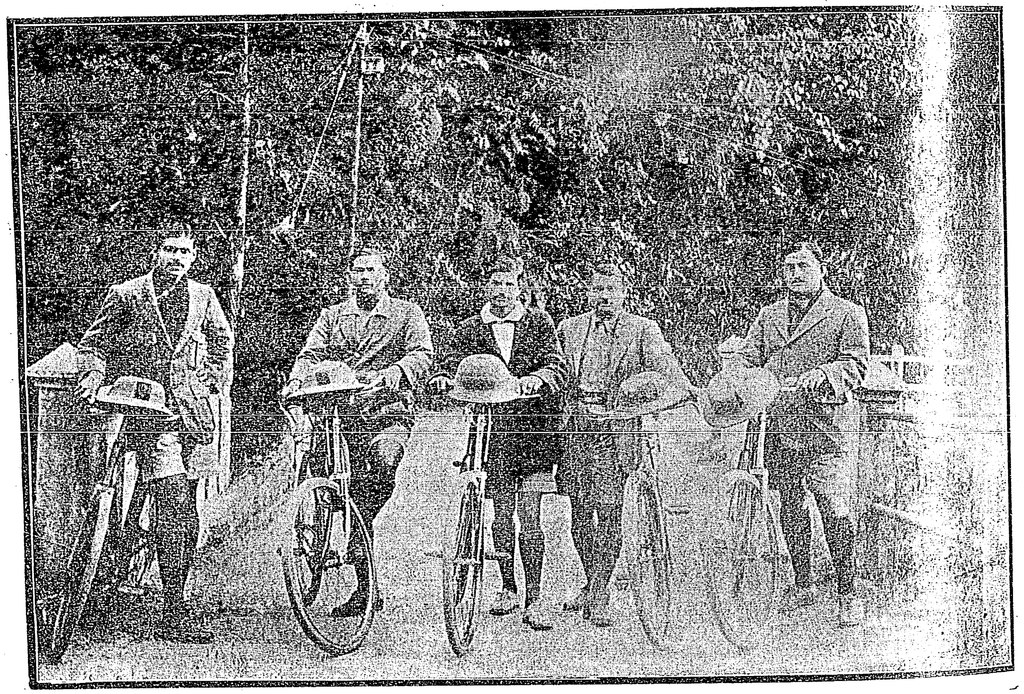

পাঁচজন সাইকেল আরোহী (বামদিক হইতে শ্রীমান্ বিমল মুখোপাধ্যায় (কাপ্তেন), শ্রীমান্ বিদ্যুৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমাদের একটা ক্লাব আছে—তার নাম হচ্চে "টুরিষ্টস্ ক্লাব"। কলকাতার দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনের শুষ্কতাটাকে অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে নির্জ্জলা (undiluted) স্বাধীনতা দিয়ে ভিজিয়ে নেবার জন্যে আমরা প্রত্যেক বছরেই একবার ক'রে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি।

আমাদের গন্তব্য স্থান ঠিক করেছিলুম; তার কারণ হচ্ছে এই যে, সেখানে যেতে হলে অনেক মাইল পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে যেতে হয়—কাজেই সাইকেলে যাওয়া বেজায় শক্ত। তা না হ'লে এই গত বছরেই তো আমরা জন কয়েক মিলে দিল্লী অবধি গেছলুম—কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত

Plain sailing। এ রাস্তাটা খুব wild কি না তাই আমাদের খুব appeal করলে।

হাবি, বনা আর আমি তিনজনে—বুধবার, ২৯শে এপ্রিল কলকাতা থেকে ৬॥০ টার সময় দুর্গা নাম করে

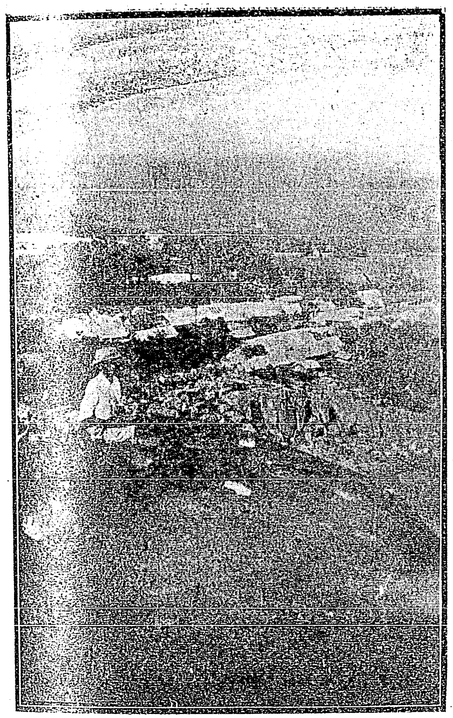

তিনদরিয়ার উপর থেকে দৃশ্য

বেরিয়ে পড়লুম। কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব, তা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। প্রথমেই হাওড়া ব্রিজের কাছে খানিকটা আটকে যেতে হ'ল; কারণ তখন পুল খোলা ছিল। কাজেই পাণ্ডুয়া যেতে ১১ টা বেজে গেল। পাণ্ডুয়া হচ্ছে এখান থেকে ৪২ মাইল। সেখানে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম না করে আর যাওয়া গেল না। কেন না, সে সময় এত অসহ্য গরম যে, সেই রোদে সাইকেল চালানো ভয়ানক কষ্টকর। সে গরমে অবশ্য আমাদের বাধ্য হয়ে বেরুতে হয়েছিল; কেন না যখন দার্জিলিংয়ের পাহাড়েই উঠব, তখন তো শীতে জমে যেতে হবে—শীতকালে গেলে। গরম কাপড়ও তো বেশী সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যতক্ষণ অসমতল ভূমিতে ছিলুম, ততক্ষণ গরমে, বিষ্টিতে আমাদের প্রাণ বেরুবার জোগাড় হয়েছিল। যাই হোক, জলযোগ সেরে বর্দ্ধমানে (৭৩ মাইল) ৪॥০ টার সময় পৌঁছে গেলুম। সেখানে শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়ে উৎপাত করেছিলুম।

আমাদের রাস্তা যা ঠিক হয়েছিল, তাতে রামপুরহাট দিয়ে ছাড়া যাবার উপায় নেই। আবার বর্দ্ধমান থেকে রামপুরহাট (৬০ মাইল) কোন রাস্তা নেই।—কাজেই আমাদের ট্রেণের শরণাপন্ন হ'তে হল। সেই দিনই ট্রেণে রামপুরহাট পৌঁছুলুম—রাত তখন ১১টা। সে রাত্তিরটা ষ্টেশনেই কাটান হল।

ওখান থেকে বেরুনোর পর যা রাস্তা পেলুম, তাতে ভদ্রলোকের সাইকেল চালানো এক রকম অসম্ভব। তার ওপোর কি দারুণ রোদ আর হাওয়া। ৫ মিনিট যাবার পর খানিক থেমে জল না খেয়ে যাওয়া অসম্ভব। আবার

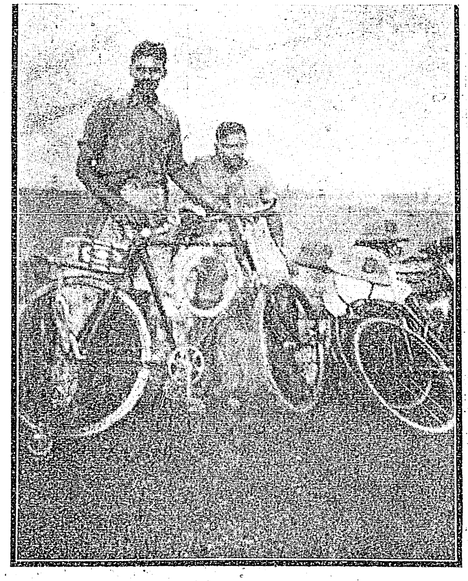

হারাধনের তিনটী ছেলে—একটী তোলে ফটো

জলও দুষ্প্রাপ্য—রাস্তার ধারে কোন কুয়ো নেই—লোকের বাড়ীও অনেক দূরে দূরে। Grand Trunk Roadএর মত তো ডাক বাংলো নেই—কাজেই সে দিনটা যে কি করে কেটেছে তা আমরাই জানি। রামপুরহাট থেকে

মোটে ৪০ মাইল দূরে নয়াহুমকা। সেখানে পৌঁছুতেই আমাদের রাত হয়ে গেল। ওখানে একটা ডাক বাংলা ছিল, তাইতে আশ্রয় নিলুম। সেখানে পৌঁছে আর কারুর দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না।

নয়াহুমকা থেকে ৮টায় বেরিয়ে হান্‌সদিয়া (২৩ মাইল)তে পৌঁছুলুম ১১ টায়। সেখানে Tea Labourer's Associationএর Mr. Martin আমাদের চা' টা ইত্যাদি যথেষ্ট খাইয়েছিলেন। তার আগের দুদিন রদ্দুরে পুড়ে আমাদের শিক্ষা হয়ে গেছল; কাজেই দিনের বেলায় আর না বেরিয়ে সমস্ত দিনটা সেইখানেই কাটালুম। সন্ধ্যা ৬টার সময় ওখান থেকে বেরিয়ে রাত্তির

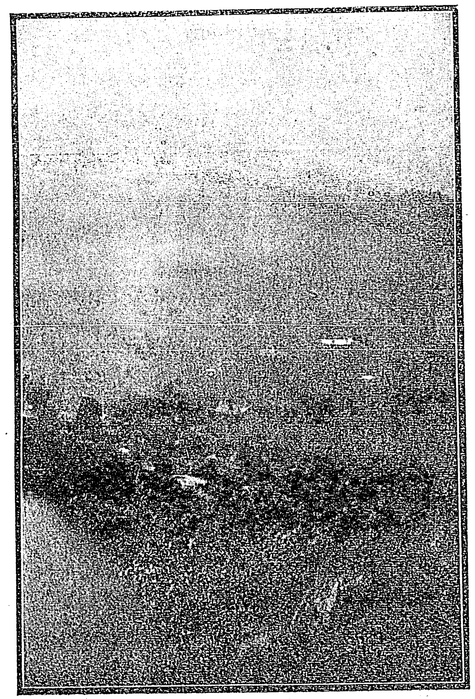

কার্শিয়ংয়ের উপর থেকে দৃশ্য

প্রায় ২টার সময় ভাগলপুরে (৬৩ মাইল) পা দিলুম। ওখানের রাস্তাও মোটেই ভাল নয়; কাজেই ২ টার আগে কিছুতেই আসা গেল না। সে রাতটা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছিল। সকাল বেলা নবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী আমাদের খুব আদর করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন; আর বলা বাহুল্য যে, একটু বাদে আমাদের বেল্টগুলো আল্‌গা করে দেবার দরকার হয়ে পড়েছিল। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন ছেড়ে আমাদের যেতে মন

অদূরে তিস্তা নদী

সর্‌ছিল না।—আর সেখানকার দুটী ছেলে—সানু আর রামু আমাদের সঙ্গে যেতে চাইলে—তাদের তৈরী হবার সময় দেবার জন্যে সে দিনটা আমাদের সেখানেই থাকতে হল। আমরা যে এতটা ঘুরে এলুম তার কারণ হচ্ছে, ক্যারাগোলা ঘাট থেকে Ganges Darjeeling Road আরম্ভ হয়েছে। এ রাস্তা ছাড়া দার্জিলিংএ সোজা যাবার কোন সোজা রাস্তা নেই।

তার পর দিন ফেরী ষ্টীমারে বেলা ১টার সময় গঙ্গা পার হয়ে ক্যারাগোলা ঘাটের রাস্তায় পড়লুম। এ রাস্তাটা বেশ ভাল।—তবে এদিকে যেমন আমরা রোদে পুড়েছি, গঙ্গা পার হয়ে আবার তেমনি বিষ্টি আর ঝড়। কোন

রকমে পুর্ণিয়া (৪০ মাইল) পৌঁছে ষ্টেশনে আশ্রয় নিয়ে বাঁচলুম।

পর দিন যখন পুর্ণিয়া থেকে বেরুলুম—আবার সেই বিশ্রী রাস্তা। এই রাস্তাটা মোটে কেউ ব্যবহার করে

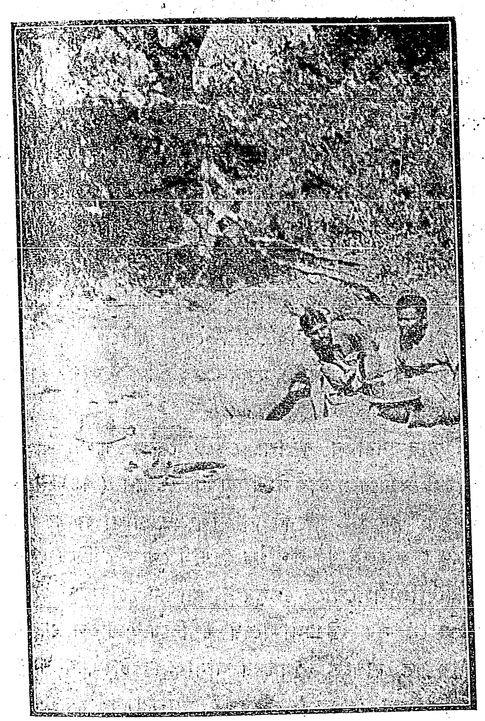

নদীতে জল নাই—বালি খুঁড়ে তৃষ্ণা নিবারণ

বলে তো বোধ হল না। রাস্তার মাঝখানে সব গাছ জন্মে গেছে। কোন্ মান্ধাতার আমলে সেখানে পাথর ঢেলে-গিয়েছে, কিন্তু বসান হয় নি। ইসলামপুর ডাক বাংলোতে খাওয়া দাওয়া করে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কিষেণগঞ্জে (৫৩) সন্ধ্যার সময় পৌঁছোন গেল। শুধু খারাপ রাস্তা আর বিষ্টির জন্যে আমরা মোটে এগোতেই পাচ্ছিলুম না।

সকালে ওখান থেকে তিত্‌লিয়া ডাক বাংলো (৬২ মাইল)তে গিয়ে উঠলুম। সে ডাকবাংলোটা ভারী চমৎকার জায়গার ওপোর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দিয়ে মহানন্দা নদী বয়ে যাচ্চে। ভারী চমৎকার। দেশী নৌকা এক্‌খানি যোগাড় করে নদী পার হলুম। তিত্‌লিয়া থেকে শিলিগুড়ি ১৬ মাইল। এই রাস্তাটুকু সব চাইতে ভাল। সে দিন সব শুদ্ধ ৬৪ মাইল এসেছিলুম।

ষ্টেশনে রাত্তিরটা কাটিয়ে সকালে জামা কাপড় সব বদলে নিলুম। Mr. S. N. Bhattacharjeeর বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা ১১ টার সময় শিলিগুড়ি ছাড়লুম। ওখান থেকে সুকনা (৯ মাইল) প্লেন রাস্তা; কাজেই খুব চট্ করে পৌঁছে গেলুম। দূর থেকে সেই উঁচু পাহাড় দেখে সকলেই একটু দমে গেল। মনে হল, এর ওপোর ওঠা বোধ হয় সম্ভব হবে না। তবে খানিকটা ওঠবার পর মনে হতে লাগল যে, হয় তো উঠ্‌তে পারব।

শিলাস্তূপ

বেশী দূর এক সঙ্গে ওঠা অসম্ভব সেখানে। খানিকটা কোন রকমে তেড়ে উঠে flat হয়ে শুয়ে পড়তে হচ্ছিল। কোন রকমে যখন তিনধারিয়ার (৩০০০ ফিট) কাছাকাছি পৌঁছেছি, এমন সময় কি প্রচণ্ড বিষ্টি! একেবারে ভিজে

বেরাল হয়ে সেখানে ষ্টেশনে উঠলুম। তিনদরিয়ার রেল-কর্ম্মচারীরা আমাদের খুব আদর যত্ন করেছিলেন। সেখানকার বাবু নেপালচন্দ্র চ্যাটার্জির বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে রাত কাটান হল।

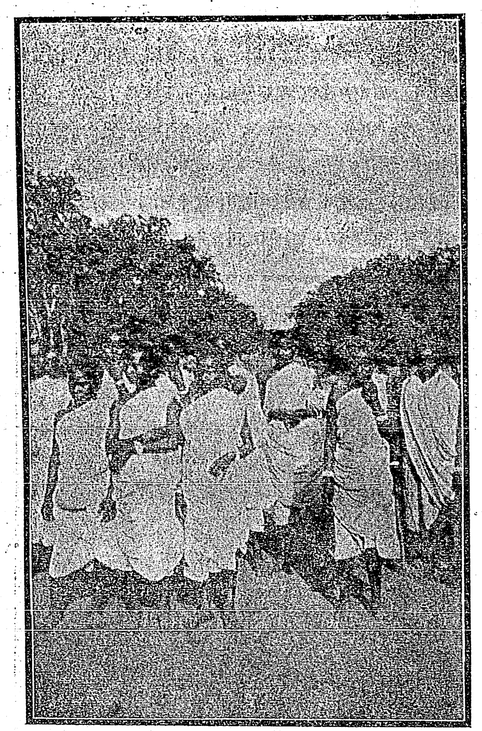

সাঁওতাল সুন্দরী

তার পর দিন তিনদরিয়া থেকে বেরিয়ে কার্শিয়ং (৪৫০০ ফিট) যেতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে ট্রেণ যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে ১২টার সময় কার্শিয়ং আসা গেল। খানিক বিশ্রাম করে আবার এগুতে আরম্ভ কল্লুম। চারিদিকের পাহাড়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের কষ্টকে লাঘব করে দিচ্ছিল। আর আমরা যে এতটা উঠ্‌তে পেরেছিলুম, সেই আনন্দে দিব্যি এগিয়ে চলেছিলুম। আশা হচ্ছিল, এই রকমে চল্‌লে সেই রাত্রেই দার্জিলিং পৌঁছে যাব। কিন্তু weather ভারী বিচ্ছিরি হয়ে গেল। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা আর শীত এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে! কোন ক্রমে সোনাদা ষ্টেশনে (৬৫৫২ ফিট) এসে পড়লুম—রাত তখন প্রায় ৮৷৷০। দার্জিলিং ওখান থেকে মোটে ১০ মাইল—আর তার অর্দ্ধেক প্রয়ে নেবে যেতে হয় ঘুম ষ্টেশন থেকে। কিন্তু কুয়াশায় আর বৃষ্টিতে আমাদের আলো কোন কাজই কচ্ছিল না, কাজেই ভরসা হল না। সে রাত্তিরটা যে কি ভয়ানক কষ্টে কেটেছে, সে আর কি বলব। জামা কাপড় সব তো ভিজে—এদিকে দারুণ শীত। সমস্ত রাত্তির দস্তুর মতন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে হয়েচে।

তার পরদিন কুয়াশা কেটে যেতে ৭৷৷০টা বাজল। আমরা বেরিয়ে ৯ টার সময় ঘুম ষ্টেশনে (৭৪০২ ফিট) এলুম। সেখান থেকে দার্জিলিংএর রাস্তা বরাবর নেমে গেছে। কাজেই খুব শীগ্‌গির সেখান থেকে বেরিয়ে ১০টার সময় দার্জিলিং পৌঁছে গেলুম। আমরা পাহাড়ে ওঠ্‌বার সময় যে সব ট্রেণ আমাদের পেরিয়ে এসেছিল, সেই সব লোকদের দৌলতে আমাদের আসার খবরটা সেখানে খুব প্রচার হয়ে গেছল; কাজেই আমাদের খুব আদর আপ্যায়নের অভাব হয় নি।

ওখানে মিত্র বোর্ডিংয়ে দিন কতক থেকে আমরা সাইকেলেই শিলিগুড়ি অবধি নেবে গেলুম—মোটে ৪৷৷০ ঘণ্টা লেগেছিল। তার পর কলকাতায় এলুম অবিশ্যি ট্রেণে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

মিঃ ঘোষ তাঁহার ঘরের সামনের বারাণ্ডায় একা বসিয়া ছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যার মৌন অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে চারিদিকে তাহার ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ স্তব্ধ হৃদয়ে ভাবিতেছিলেন, বহু দিন পূর্ব্বের তাঁহার নিজের জীবনের কথা। অতীতের যে সব ছোট-বড় নানা ঘটনার স্মৃতি মনের মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছিল, সেদিনের একটি ঘটনায় সে সব কাহিনী আবার উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিয়াছে।

পিতার মৃত্যুতে যে দিন তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার বয়স নিতান্তই অল্প। সেদিন তাঁহার চারিদিকে যে সব হীনবুদ্ধি কুটিল অনুচরবর্গ জুটিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব এড়াইয়া নিজের মতে চলিবার মত মনের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। সে সময়কার তরল মস্তিষ্কের ফলে সর্ব্বক্ষণ আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকায়, সেই সুযোগে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নামে প্রজাদের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া তাহাদের শোষণ করিতেছিল। তাহাদের সুব্যবস্থার গুণে প্রজাদের কোন অভাব অভিযোগ তাঁহার গোচরে আসিতে পারিত না, আসিলেও তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বিষয় এমন সুকৌশলে বুঝাইয়া দিত যে, তিনি তাহাদের কূট চক্রান্তের বিষয় কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধিকারে সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল।

তাঁহার বিষয় প্রাপ্তির প্রায় দুই বৎসর পরে এক দিন তিনি তাঁহার অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে সন্ধ্যার সময়ে একা বাঁধান চত্বরে বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী, ঘাটের চারিধারের তাল ও নারিকেল-শ্রেণীর ছায়া বুকে লইয়া ধীর সমীরণে কাঁপিতেছিল। চত্বরের দুই ধারে দুইটি পুষ্পিত চাঁপার গাছ। চম্পকের তীব্র-মধুর সুবাসে সেখানকার বাতাস ঘন ও মদির-সৌরভময় হইয়া ফিরিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে নিঃশব্দে এক দীর্ঘাকার পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত ভাবে তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অনুচরবর্গ তখনো কেহ আসিয়া জোটে নাই। তিনি বলিলেন—কে তুমি? বাড়ীর ভিতরের বাগানে কি সাহসে প্রবেশ করেছ?

সে ব্যক্তি বলিল, ভয় নেই হুজুর! আমি কোন কুমতলবে এখানে আসিনি। আমি হুজুরের অধীন মণ্ডলগড় পরগণার রামগোবিন্দ দত্ত। দুঃখী প্রজাদের পক্ষ থেকে দুটো কথা নিবেদন করতে এসেছি। অনেক চেষ্টা করেও তো আপনার সঙ্গে নিরালায় দেখা করবার কোন সুবিধে করতে পারিনি, অগত্যা এই উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হলো।

সেই দিন তাঁহার জীবনের মধ্যে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। তাহার পর হইতে মণ্ডলগড় পরগণা লইয়া কত বিরোধ, মামলা-মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিল। সর্ব্বশেষে তাঁহার সেই দুরপনেয় কলঙ্ক,—এক মুহূর্ত্তের মোহের তাঁহার সেই বিষম ভ্রম—যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত করিয়া দিল।

মিঃ ঘোষ ভাবিতেছিলেন, পাপের বীজ একবার বপন করিলে তাহার পর শত চেষ্টায়ও আর তাহা নির্ম্মূল করিতে পারা যায় না। সময়ে সে পত্রে-পুষ্পে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবেই,—তাহা রোধ করা বুঝি মানুষের সাধ্যের অতীত। নতুবা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিনের দুর্ব্বলতায় তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন,—যে সব বিষয় বহু দিন হইল সকলের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে,—এত দিন পরে আবার তাহা নূতন রূপ ধরিয়া কেমন করিয়া তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল?

অন্ধকার আকাশে একটি মাত্র তারা ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মাথার উপর জ্বলজ্বল করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ সেই সন্ধ্যা তারার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, ওঃ! ঠিক সেই তারই মত দীর্ঘ সুগঠিত আকার! ঠিক তেমনি ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি! আর তারি মত সেই অগ্নিময় মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! সে ঠিক তার বাপেরই অনুরূপ প্রতিকৃতি! আমি মূর্খ—নিতান্ত অন্ধ আমি! তাই তাকে দেখেও কোন সন্দেহ আমার মনে জাগে নি! আমি একেবারে এ সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম!

তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র অসিতের নয়নে যে রুদ্রাগ্নির শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্মরণে আসিবামাত্র মিঃ ঘোষ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

এখন সেই বহু দিন পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে! তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু হায়! নির্ম্মলা? সে যে তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না! তাহার উপায় কি হইবে?

সেই সময় অন্ধকার বারান্দায় একটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ঘোষের দৃষ্টি সে দিকে পড়িবামাত্র তিনি সহসা চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এই! কে ওখানে? কে আসছে?" তেওয়ারি! তেওয়ারি! বেহারা—

"বাবা! বাবা! আমি! আমি যে! তুমি হঠাৎ এত ভয় পেলে কেন বাবা? আমি ছাড়া এখানে আর কে আসবে? নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ওঃ! তুই? মিলু তুই? আঃ! তাই ভাল! অন্ধকারে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—সত্যিই বড় চমকে উঠে ভয় পেয়েছিলুম!" বলিতে বলিতে অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে মিঃ ঘোষ আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাস প্রবলবেগে বহিতেছিল।

নির্ম্মলা সংশয় ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে মিঃ ঘোষের জীবনে ঘোর অশান্তি ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অনেক সময় তিনি নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন; নির্ম্মলা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পূর্ব্বের মত সুস্থ ও প্রফুল্ল করিতে পারিত না; ভয়ে ও উদ্বেগে সেও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। অথচ কি যে এ অশান্তির কারণ, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

শুধু সে লক্ষ্য করিয়াছিল, অতি অল্প কারণে মিঃ ঘোষ আজকাল চমকাইয়া উঠিতেন। সন্ধ্যার পর নিজে সমস্ত দরজা-জানালা পরীক্ষা করিয়া দেখা ও তেওয়ারিকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ কিসের যেন একটা আতঙ্কে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। বাড়ীর অন্য কেহ তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিলেও, নির্ম্মলার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়ায় নাই। কিন্তু কিসের এ ভয়? কেন এ উদ্বেগ? এত দিন ত এ সব অশান্তির কোন আভাস ছিল না? তিনি কি সর্ব্বক্ষণ কোন অজ্ঞাত শত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন? এত কাল পরে এমন শত্রু বা তাঁহার কোথা হইতে আসিল? নির্ম্মলা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিত, তাঁহার হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগ হইয়াছে; কিছু দিন পরে হয়তো তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন।

সকালে চা ঢালিতে ঢালিতে নির্ম্মলা বলিল, বাবা! আজ আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। আজ এখনি তেওয়ারিকে পাঠিয়ে আমি অনিল বাবুকে ডেকে পাঠাব। তোমার শরীর যে কত খারাপ হয়েছে, সে তুমি কিছুই বুঝছো না।

—ডাক্তার আমার কি করবে মিলু? আমার তো শরীরে কোন অসুখ নেই? আমি তো ভালই আছি মা?

—ভাল আর কই আছ? এই ক'দিনে তুমি কি রকম শুকিয়ে গেছ—একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ দেখি? খালি সব সময়ে কি ভাবছো,—আর থেকে থেকে চমকে ওঠো,—আর জিজ্ঞেস করলে শুধু বল—আমি তো ভাল আছি! সে দিন রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি ঠিক কালকের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলে! আমি ঘুম ভেঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখি—তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব বকছো!

—তাই না কি? কই! আমার তো কিছু মনে

নেই নির্ম্মল? কি বলছিলুম আমি—বল তো? মিঃ ঘোষ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

নির্ম্মলা বলিল, কি বলছিলে, তা আমি বুঝতে পারি নি। বিজ বিজ করে জড়িয়ে জড়িয়ে কি সব বল্লে, তার পর পাশ ফিরে আবার তখনি ঘুমিয়ে পড়লে। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে চলে এলুম। তোমার তো এ-রকম কখনো কিছু ছিল না! নিশ্চয় এ সব শরীর খারাপ হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ! তোমার সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। তা তো তুমি কিছুতে শুনবে না।

মিঃ ঘোষ আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, ওঃ! তা হবে! কিছু স্বপ্ন টপ্ন দেখে থাকবো হয় তো! সত্যি, আজ কয়েক দিন থেকে আমার মনটা ভাল নেই—নির্ম্মল! একটুতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, নানা ভাবনায় মাথাটা ঘুলোতে থাকে। তাতেই তোরা ভাবছিস—আমার শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু সে সব কিছু নয়। কিন্তু তুইও তো মা! আর আজকাল আমার কাছে মোটেই আসিস না,—সব সময় আমায় একলা ফেলে নিজেও একা একা ঘুরিস, তাতেই তো আমার আরও খারাপ লাগে!

নির্ম্মলা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, হ্যাঁ! তুমি এখন তাই বলবে বৈ কি? আমি সব সময় এসে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে চলে যাই,—তুমি যে কি ভাবতে থাক, তা তুমিই জানো,—একবারও আমায় কাছে ডাক না। কালও তো আমি কতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। মনে করলুম, তুমি দেখতে পেলে আমায় ডাকবে। শেষে তুমি আর ডাকলে না দেখে যেমন একটু এগিয়েছি, আর তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠলে। আজকাল তুমি আমার কথা আর কিচ্ছু ভাব না! নির্ম্মলা চোখের জল গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল।

মিঃ ঘোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার মাথাটা বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, ও কি? কাঁদছো তুমি? কি পাগলামী দেখ? তোমার কথা ছাড়া আমার সংসারে আর কি ভাববার কথা আছে নির্ম্মল? সে তো তুমি জানই—তবু এত অভিমান? দু'দিন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম—তাই—না হলে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা? তাঁহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা একটু শান্ত হইলে মিঃ ঘোষ তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলেন, আমাদের নতুন বাগানে তোমার পার্টির কি ব্যবস্থা করছো নির্ম্মল? তোমার হাত তো এখন বেশ সেরে গেছে,—আর মিছে দেরী করে কি হবে? এইবার এক দিন তার যোগাড়-যন্ত্র করা যাক, কি বলো?

নির্ম্মলা আজ আর এ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে উদাসীন ভাবে বলিল, না বাবা! এখন আর ও সব হাঙ্গামায় কোন দরকার নেই। তার চেয়ে চলো—আমরা কোথাও কিছু দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসি। তাতে তোমার শরীরও সুস্থ হবে, মনও ভাল থাকবে। এখানে বসে বসে তো তোমার অনেক দিনই কাটলো!

মিঃ ঘোষ বলিলেন, সে তো ভাল কথা! চল, কিছু দিন বাইরে ঘুরে আসা যাক। আমার তাতে কিছু আপত্তি নেই! কিন্তু তা বলে তোমার বন্ধুদের এ আনন্দ থেকে কেন বঞ্চিত করবে মা? তারা তোমাকে অত করে ধরেছিল, এক দিন তাদের সবাইকে ডেকে আমোদ আহ্লাদ করো,—তার পর যাওয়ার কথা ভাবা যাবে, কেমন?

মিঃ ঘোষ এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় নির্ম্মলার হৃদয়ভার অনেক লঘু লইয়া গেল। সে বলিল, তা বেশ! আমি তা হলে আজ দুপুর বেলা বসে কাকে কাকে বলতে হবে, তার একটা লিষ্ট করে তোমায় দেবো। তার পর তুমি সব বন্দোবস্ত করো। ভাল কথা,—অসিত বাবুরা তো এক দিনও এলেন না? সে বাড়ীটা ছাড়া আর তাঁদের কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা তো তুমি সে দিন জেনে নিয়েছিলে, না? না হলে তাঁদের বলা হবে কি করে?

যেখানে বেদনা—না জানিয়া নির্ম্মলা ঠিক সেই স্থানেই আঘাত করিল। মিঃ ঘোষের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তবে এখনো তাহাদের ভুলিতে পারে নাই! মাত্র দুই ঘণ্টা যাহাদের সহিত দেখা হইয়াছিল, আজ এক মাস ধরিয়া তাহাদের স্মৃতি কেন সে মনে মনে জাগাইয়া রাখিয়াছে? তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন, সে পরেশের বিশেষ নাম করে না, অসিতের সংবাদ জানিবার জন্যই তাহার মন উন্মুখ হইয়া আছে।

তিনি বলিলেন, তারা বোধ হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে

রাজি নয় নির্ম্মল! এখানে আসবার জন্যে তাদের কত করে আমরা বলে এলুম, সে তো তুমি জানোই, তবু যখন তারা এক দিনও এলো না, বা কোন খোঁজ খবর করলে না, তখন আবার নতুন করে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব করতে যাওয়া আর আমাদের বোধ হয় উচিত হবে না, কি বলো?

এ উত্তর নির্ম্মলার মনঃপুত হইল না। সে একটু ভাবিয়া বলিল, তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশতে চান না, এ কথা সত্য বলে আমার তো মনে হয় না বাবা! তবে যে আসেন নি এত দিন—তার হয় তো অন্য কারণ থাকতে পারে। সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ কি করে এমন একটা কথা বিশ্বাস করা যাবে? আর একবার তাঁদের গার্ডেন-পার্টির দিন নিমন্ত্রণ করে দেখা যাক! বিশেষ সে দিন যখন তুমি নিজেই তাঁদের এ কথা বলেছিলে! পরিচয় হলো, সে দিন তাঁদের কাছে অত উপকার পাওয়া গেল, এখন না বলা কি ভাল দেখায়?

ভাল যে দেখায় না, তাহা তো মিঃ ঘোষ বেশ ভালই জানেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও আর যাহা কিছু তিনি জানেন, তাহা তো নির্ম্মলাকে বলা চলে না। সুতরাং কি বলিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন—তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মিঃ ঘোষ বলিলেন, বলা উচিত হলেও তাদের বলবার কোন উপায় নেই নির্ম্মল। তাদের ঠিকানার কথা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিন্তু তখন অন্য কথা এসে পড়ায় সে কথার আর উত্তর পাই নি। কাজেই…

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল, এটা কিন্তু ঠিক হোল না বাবা! আজ বিকেলে চলো—লিলিদের ক্লাবে যাওয়া যাক। কিরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো, যদি তিনি কিছু জানেন।

(ক্রমশঃ)

বাদল-ধারা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

রিম্ ঝিম্ বারি ঝরে রবি আজ জাগেনি,
বাজে মেঘ-মল্লার রাগিণী;
থই থই করে জল অবিরল কলকল
বল কার বুকে ঢেউ লাগেনি?

ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে রাশি রাশি কেতকী,
ফোটে ফুল মধুমাসে এত কি?
ঝর ঝর ওই সুর হৃদি করে ভরপুর,
গুঞ্জনে ভোলে বোল চাতকী।

ডুবে গেল ঘাট মাঠ সোহাগের পাথারে
এমন দরদী পাই কোথা রে!
হংসেরা দলে দলে ভাসিছে নূতন জলে
আকুল চায়না কূল সাঁতারে।

ভরে গেল নালা খাল শিশু-নৌ-বহরে
ভাসে ডিঙ্গা মধুকর লহরে,
যাত্রী সে অজানার, কোথায় সিংহল তার,
কমলে-কামিনী-কালীদহ রে।

ভুবন ভরিয়া আজ চলে কাজ বপনের;
গগন গড়িছে পুরী স্বপনের;
পবনে যূথীর বাস সুদূরের অধিবাস,
মনে আজ আগমন গোপনের।

দেখে না কমল মুখ সরসীর মুকুরে;
সন্ধ্যা লেগেছে দিন দুপুরে;
রিম ঝিম রিম সনে জাগে গান বেণু বনে,
বাঁশরীর সুর মেশে নূপুরে।

তরল এ মেঘদূত পড়ি আয় সখি রে,
রাতি ভ্রমে কাছে চকাচকীরে;
পথিক-বধূর হায় আঁখি পাখী কোথা ধায়,
হত আশা পথ কব লোকি রে।

বরষা যে উৎসব মৌনীর পূজনের,
অবসর নাই হেথা কূজনের,
বরষার পরিধিতে ঠাঁই নাই পরে দিতে
কুলায়ে কুলাবে শুধু দুজনের।

বরষার মধু সুর মধু পুর লোটেরে
ফোটে রাধাপদ্মিনী ফোটে রে;
শিখীর জোটায় বোল তমালেতে দেয় দোল,
যমুনায় কল্লোল উঠে রে।

এ বরষা বৈষ্ণব কবিদের ভারতী;
প্রেম আঁখিজল এর সারথি!
তুলনা যে নাহি এর, ঝুলনা এ প্রণয়ের,
বুকে এর যুগলের আরতি।

কলিকাতা

বাল্যবিবাহ ও অকালমৃত্যু

শ্রীগোকুলবিহারী দাস.বি-এ

গত আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাল্য-বিবাহের সহিত অকালমৃত্যুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যুর কারণ হইতে পারে না; বরং বাল্যকালে বিবাহ না হইলে অত্যাচারের ফলে শরীর বহুবিধ দুষ্কর রোগের আকর হইয়া অকালে ধ্বসিয়া পড়ে। তিনি বাল্য-বিবাহের সহিত—সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক যে সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, কেবল অকালমৃত্যুর দিক্ দিয়াই বাল্যবিবাহ কতটুকু দায়ী, তাহারই বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারতাদির যুগে যে সকল আচার, বিধি, ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহার যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি ঐ যুগের যে কোন আচার নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার ধারণা—ভারতের ওই গৌরবময় যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ ভুল ধারণা দূর করা আমাদের প্রথম চেষ্টা হইবে। তবে আমরা বলিয়া রাখি যে, কোন যুগ জ্ঞান-গরিমা-বরিষ্ঠ হইলেই যে সে যুগের যাহা কিছু সমস্তই অভ্রান্ত হইতে হইবে, বা সেই যুগের পক্ষে যাহা উপযোগী ছিল সকল যুগের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইবে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। প্রাচীনকালে যদিই বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিতাম না। ভারতবাসী প্রায় অনেকেই আমাদের এই অতীত যুগকে একেবারে অভ্রান্ত মনে করে। দূরত্বের একটা মহিমা আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ হইবার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। পরাধীন জাতির আত্ম-প্রসারণ-ক্ষমতা বাহিরের চাপে রুদ্ধ হইলে, তাহাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সংরক্ষণশীলতা। আয় হইতে ব্যয় করিলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু আয় না থাকিলে পূর্ব্বার্জ্জিত সম্পত্তিকে কৃপণের ন্যায় আগলাইয়া থাকিতে হয়। এই জন্যই আমরা পুরাতনকে আঁচড়াইয়া থাকিতে চাই; কেন না, নবীনকে বরণ করিয়া লইবার আমাদের শক্তি নাই। শুধু তাহাই নহে,—যখন বাহিরের অবজ্ঞা মানুষকে পায়ে ঠেলে, তখন অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিমান একমাত্র গৌরবের বস্তুকে সম্বল করে। বর্ত্তমানে যখন আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই, তখন ভূতের উপর আমাদিগকে বেশী করিয়া ভর করিতে হয়। কিন্তু ভূতের কোন নির্দ্দিষ্ট, পরিমিত আকৃতি নাই; বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা বিভিন্ন বেশে আসিয়া থাকে; ইহাকে ছুঁইয়াও ছুঁইতে পারা যায় না; ধরিয়াও ধরিতে পারা যায় না। সেই জন্যই আবার ইহার আকর্ষণী-শক্তি বেশী। যাহা হউক, আমরা এই ভূতকে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ বর্ণনা করিব।

"বাল্যবিবাহ ও অকালমৃত্যু"র লেখক অতীত ভারতে যৌবন-বিবাহের সমর্থক আচার বা উক্তি দেখিতে পান নাই। যে কয়টী প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত উদাহরণ আছে, তাহা তিনি সাধারণ জনসমাজের দর্পণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি মনে করেন, বিশেষ বিশেষ কারণের জন্য কেবল ঐ ঐ ক্ষেত্রে ঐরূপ বিবাহ ঘটিয়াছিল, অন্যত্র নহে। এইজন্য শকুন্তলা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সুভদ্রার উদাহরণ তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকগুলি যদি চোখ মেলিয়া পড়া যায়—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল ঐ কয়টী পুত মহিলার যৌবন-বিবাহেই এই পুস্তকগুলির আখ্যায়িকার সমাপ্তি হয় নাই। রুক্মিণী, কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা; দুর্য্যোধনের পত্নী চিত্রাঙ্গদা; পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী; যুধিষ্ঠিরের পত্নী গোসাবনের দুহিতা দেবিকা; সহদেবের পত্নী মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়া; নারদের পত্নী স্বঞ্জয়ের

যুবতী কন্যা প্রভৃতি সকলেই যৌবনাবস্থায় বা স্বয়ম্বরে পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋচীক মুনি বিশ্বামিত্রের ভগিনী যুবতী সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মনুর পুত্র শর্য্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা ছিল। প্রাপ্ত-যৌবন সেই কন্যাকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। যৌবন-বিবাহের উদাহরণ প্রাচীন পুস্তকগুলির সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় যে, এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; পরন্তু, ক্ষুদ্র সৈনিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কখনও অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে সম্ভব নহে; যৌবনের পূর্ব্বে কখনও ঐরূপ পরিণয় হইতে পারে না। বড় বড় রাজারা স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিতেন; কিন্তু সামান্য ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে তাহা প্রাংশুলভ্য ফলের ন্যায় দুর্লভ ছিল। রামায়ণে আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে আধুনিক ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় একটী প্রথা দেখিতে পাই। সেটী হচ্ছে এই:—সন্ধ্যাকালে অবিবাহিতা কন্যাগণ সাজসজ্জা করিয়া ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নগরের স্থানে স্থানে রক্ষিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইত। ঐরূপ উদ্যান-ভ্রমণকালে বায়ু কতকগুলি কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, সাধারণ ক্ষত্রিয়-কন্যাদিগের courtship ঐরূপ ভ্রমণের সময়েই হইত। এই ত গেল ক্ষত্রিয়দিগের কথা। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন-বিবাহের উদাহরণ বিরল নহে। ক্ষত্রিয়দিগের কথা রামায়ণ, পুরাণাদিতে যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কথা সেরূপ নাই। তথাপি খুঁজিয়া দেখিলে উদাহরণের অপ্রতুলতা হইবে না। দেবযানীকে অসুরদিগের মধ্যে পালিতা বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, আরও উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ঊর্ব্বমুনি অতি তেজস্বী ও বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যখন ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে অনেক ব্রাহ্মণ-বালক নিহত হয়, তখন কোন ব্রাহ্মণীর উরুদেশ হইতে ঊর্ব্বের জন্ম হয়। এই বালক ঊর্ব্বের তেজে ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হয়। এই ঊর্ব্বের কন্যা কন্দলী। এক দিন দুর্ব্বাসা ঋষি যখন কোন পর্ব্বত-কন্দরে তপস্যায় রত ছিলেন, তখন ঊর্ব্বমুনি প্রাপ্তযৌবনা এই কন্যাকে লইয়া দুর্ব্বাসার সমীপে উপনীত হন। দুর্ব্বাসা ঐ কন্যার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করেন। মহাভারতে ভৃগুপত্নী পুলোমার সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায়, পুলোমার সহিত ভৃগুর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে এক রাক্ষস পুলোমার মনোমুগ্ধকারিণী আকৃতি দর্শন করিয়া পুলোমার পিতার নিকট পুলোমাকে প্রার্থনা করে; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, পুলোমার সহিত ভৃগুর যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন পুলোমা পূর্ণযৌবনা। শুক্রাচার্য্যের দেবযানী ছাড়া আর একটী কন্যা ছিল; তাহার নাম অরজা। এক দিন দণ্ড রাজা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে প্রবেশ করিয়া যুবতী, অবিবাহিতা অরজার উপর অত্যাচার করেন। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে অরজা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত আছে, অষ্টাবক্রমুনি মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপ-লাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে দেখা যাইবে—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল; এবং উহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। দাসরাজ-কন্যা সত্যবতী যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইয়াছিল। নাভাগ এক বৈশ্যকন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। সুতরাং যৌবন-বিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন কালে যৌবন-বিবাহ ছিল এবং সেই যৌবন-বিবাহের অস্তিত্বসূচক তাহার যে অপব্যবহার তাহাও ছিল। যে সব দেশে যৌবনবিবাহের প্রচলন থাকে, সেই সব দেশে মাঝে মাঝে কানীন সন্তান প্রসূত হওয়ার কথা শুনা যায়। দাসরাজ-কন্যা সত্যবতী ও পাণ্ডব-জননী কুন্তী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ থাকিলে সকল সময় পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্যের সীমা রক্ষিত হয় না। কখনও কখনও কন্যার বয়স পাত্রের অপেক্ষা অধিক হয়। জ্যামঘ নামক এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা। জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, তথাপি তিনি ভার্য্যার ভয়ে পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি এক দিন শত্রু-ভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী একটী কন্যা হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। সেই কন্যাকে দেখিয়া শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ?" রাজা বলিলেন, "এ তোমার স্নুষা।" রাণী বলিলেন, "আমার সন্তান নাই, স্নুষা কোথা হইতে হইবে?" রাজা বলিলেন, "এই কন্যা তোমার ভাবী সন্তানের বধূ হইবে।" পরে শৈব্যার বিদর্ভ নামে এক পুত্র হয় এবং সেই পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। এখানে দেখা যাইতেছে, কন্যার বয়স পাত্রের বয়সকে অতিক্রম করিয়াছে। কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ এইরূপ আপনা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা মায়াবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় কন্যা আকুতিকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করেন। আকুতির যমজ সন্তান প্রসূত হয়; এক পুত্র, নাম যজ্ঞপুরুষ ও এক কন্যা, নাম দক্ষিণা। মনু দৌহিত্র যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আলয়ে লইয়া আসিয়া পালন করেন। যজ্ঞপুরুষ বড় হইলে, দক্ষিণা স্বীয় ভ্রাতাকে স্বামিত্বে বরণ করে। এখানে ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ হইয়াছে। কখনও কখনও দেখা যাইবে, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা জ্ঞানালোচনার সুবিধার জন্য কোন কোন কন্যা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। এই ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যৌবন-বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

যদিও রামায়ণে সীতা যেখানে ছদ্মবেশী রাবণকে স্বীয় পরিচয় দিতেছেন সেখানকার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সীতা ছয় বা সাত বৎসরের সময় বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তথাপি সমস্ত রামায়ণখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, সীতার বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলির আলোচনা করিলে, সীতা যে বিবাহকালে যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না। রাজা জনক রামকে সীতার পরিচয় প্রদান কালে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, সীতা যৌবন-দশায় উপনীত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে মহীপালগণ আসিয়া সীতাকে লাভ করিবার বাসনা করিয়াছিল; কিন্তু বীর্য্যশুল্ক প্রদানে অসমর্থ হইয়া তাহারা প্রস্থান করে। সীতাও অরুন্ধতী প্রভৃতিকে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। এই সকল কথার আলোচনা করিলে এবং সীতা স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন এই বিষয় মনে রাখিলে, রামায়ণে বর্ণিত এই পরস্পর বিপরীত কোন্ বিবরণটী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়? সীতার স্বয়ম্বর যখন রামায়ণের একটী প্রধান ঘটনা, তখন ৬ বা ৭ বৎসরে সীতার বিবাহ হওয়ার কথা যে অসঙ্গত ও পরবর্ত্তী কালের যোজনা, বা interpolation সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। আবার সীতা, মাণ্ডবী প্রভৃতি চারি সদ্য-বিবাহিতা কন্যার সহিত জনক রাজা ৪০০ সখী দিয়াছিলেন। সীতার বয়স ৬ বা ৭ হইলে এই সকল সখীদিগের বয়সও উহার অধিক হইতে পারে না। জনক রাজা নিশ্চয়ই দশরথকে ভারাক্রান্ত করিবার জন্য এই দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে দান করেন নাই। প্রাচীনকালে দুই একটী বাল্য বিবাহ হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া দিলেই কখনও প্রমাণিত হয় না যে বাল্যবিবাহ তখনকার সাধারণ প্রথা ছিল। ইয়োরোপেও অনেকে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু ইয়োরোপের বিবাহপ্রথাকে কেহ সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাল্যবিবাহের কোঠায় ফেলিতে চেষ্টা করেন না। সেইরূপ উত্তরা যদি অল্প বয়সেই বিবাহিতা হইয়া থাকে, তাহাকে আমরা সমাজের মানদণ্ডরূপে খাড়া করিতে পারি না। উত্তরার সন্তান পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন; তাহা হইতে লেখক প্রমাণ করিতে চান যে, বাল্য-বিবাহের ফল পরীক্ষিৎ যখন দীর্ঘজীবী হইয়াছেন, তখন বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যুর কারণ হইতে পারে না। কোন মদ্য-পানরত, বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তখন তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লেখক কি বলিবেন, বেশ্যালয়-গমন বা মদ্যপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নহে? পরীক্ষিতের সম্বন্ধে আবার একটু "কিন্তু" আছে। পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর বাঁচিলেও তিনি মাতৃ-গর্ভে একবার নিহত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের যত্নে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং ক্ষীণতা হেতুই তিনি পরীক্ষিৎ নাম পাইয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষিতের উদাহরণ দীর্ঘজীবনের পোষকরূপে উপস্থিত করা চলে না, চলিলেও তাহা দ্বারা লেখকের কথা প্রমাণিত হয় না। লেখক আরও দুই একটী আত্মীয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য ঐ একই। সকল সাধারণ নীতিরই ব্যতিক্রম আছে এবং সেই ব্যতিক্রম স্থানবিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষে খাটিয়া থাকে। প্রাচীন কালের কথা আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া হইয়াছে; ইহার পর কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রাচীন উক্তি তুলিয়া দেওয়া হইল:—যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পিতামহ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত

তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়?" তদুত্তরে ভীষ্ম দীর্ঘ-জীবনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা বলিতে বলিতে এক স্থানে বলিয়াছেন:—

"মহাকুলে প্রসূতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা।
বয়স্থাঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ কন্যামাবোঢ়ুমর্হতি॥"

আর এক স্থানে

"সুরূপাং সুনিতম্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন।"

সুশ্রুত সংহিতায়—

"পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণত্রিংশনে সঙ্গতা।
শুদ্ধেগর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি॥
বীর্য্যবন্তং সুতম্ সূতে ততোন্যূনা বদয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥"

অন্যত্র

"ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" (মনু)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মহর্ষি কৃশরাজা বীরদ্যুম্নকে বলিতেছেন, "লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরোপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শন-লাভে যত্নবান্ হয়েন, যে আশা বৃদ্ধরমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"কন্যাগণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে রজস্বলা যুবতীও গর্ভবতী হইবে। সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই আর একটী প্রসব করিবে এবং ষোড়শবর্ষে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে!" কলিযুগ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বাল্য-বিবাহের সম্বন্ধে সে যুগের ধারণা কিরূপ ছিল। কন্যাগণকে দুহিতা বলা হয়; পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে অবস্থানকালে তাহাদিগকে গাভী দোহন করিতে হইত বলিয়া তাহারা দুহিতা। দোহনকার্য্য অল্পবয়স্কা বালিকা দ্বারা সম্ভব নহে। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, কন্যাদিগের বিবাহ বয়স অল্প ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির যুগের পরও বহুকাল পর্য্যন্ত যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালিদাসের "শকুন্তলা," "কুমারসম্ভব," ভবভূতির "মালতীমাধব," "বীরচরিত" প্রভৃতি কাব্য, বাণভট্টের "কাদম্বরী," "রত্নাবলী" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাস এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়:—পৃথ্বীরাজের পত্নী সংযুক্তা, রাজপুতগৌরব কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি সকলে বিবাহের পূর্ব্বেই প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন সংস্কৃত প্রশস্তিতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন-বিবাহের উল্লেখ আছে।

পর্দ্দা বা অবরোধের শৃঙ্খল যত দৃঢ় হইয়াছে, জাতিভেদের নিগড় যত দেশের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার যত

সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং শিক্ষা, জ্ঞান, স্বাধীনতা, আলো ও বায়ু যত স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, ততই তাহার আনুষঙ্গিক রূপে যৌবন-বিবাহও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। যৌবন-বিবাহ থাকিলে যুবতী কন্যাকে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে; আর এই নির্ব্বাচন প্রণয়ের দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্বন্ধে ভেদ মানিবে না। কাজেই বর্ত্তমান জাতি-ভেদের সময় হইতেই স্ত্রীলোকদিগের যৌবন-বিবাহও লোপ পাইয়াছে। আর এই যৌবন-বিবাহ স্থায়ী করিতে হইলে যে স্বাধীন আবেষ্টনীর আবশ্যক, যে শিক্ষা ও অধিকারের আবশ্যক, সেই আবেষ্টনী ও শিক্ষা ক্রম-অবনতিশীল হিন্দু জাতির দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল কারণে যখন যৌবন-বিবাহ আপনা হইতেই তিরোহিত হইতে-ছিল, তখন বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ও তান্ত্রিকদিগের কুমারী-পূজার বাহুল্যে কুমারীদিগকে বেশী দিন অবিবাহিতা রাখা নিরাপদ না হওয়ায়, বাল্য-বিবাহ যৌবন-বিবাহকে একেবারে স্থানচ্যুত করিল। আলোচনা একটু বিস্তৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অতীতকেও বুঝিতে হইবে। এইজন্যই রোমানরা বৎসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা Janusএর দুইটী মুখ কল্পনা করিয়াছেন। একটী মুখ অতীতের অভিমুখে আর একটী ভবিষ্যতের অভিমুখে পরাবর্ত্তিত। বর্ত্তমান এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।

এক্ষণে বাল্য-বিবাহকে যুক্তির ওজনে মাপিয়া দেখা যাক্। ১৯১১ সালের আদম সুমারি হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সকল জেলায় বালিকা-বিবাহ অধিক সে সকল জেলায় শিশু-মৃত্যুর হার অধিক নহে। প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে এরূপ বিচারে উপনীত হইবার যথেষ্ট উপাদান নাই। যে দেশে সর্ব্বত্রই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশে একটী জেলাকে অন্য জেলা অপেক্ষা বাল্য-বিবাহে অগ্রণী মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হাজারকরা ৫ হইতে ১০ বৎসরের বালিকার বিবাহ যে সকল জেলায় অধিক, সেখানকার ১ বৎসরের ন্যূন ও ১ বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার যে সকল জেলায় ঐরূপ বিবাহ কম তথাকার ঐ বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার, অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু কেবল দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স গণনা করিয়াই এক জেলাকে অপর জেলা অপেক্ষা বাল্য-বিবাহে অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ বলা চলে না। আমরা মনে করি ১৫ বৎসর বয়স বাল্য-বিবাহের কোঠায় আসা উচিত। ঐ বয়সে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় সকল বালিকারই বিবাহ চুকিয়া যায়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই জেলায় বালিকা বিবাহ অধিক, ঐ জেলায় কম এরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চারুবাবু যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন সে তালিকারও কোন মূল্য থাকে না। এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে ১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা হইতে কোন্ জেলায় শিশু-মৃত্যু অধিক কোন্ জেলায় কম তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। ১ বৎসরের অধিক বয়সেও শিশু-মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং ঠিক ভাবে বাল্য-বিবাহের প্রভাবে শিশু-মৃত্যু কোথায় কিরূপ ঘটিতেছে তাহা জানিতে হইলে ১ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকেই গণনা করিলে চলিবে না, আরও উর্দ্ধ দিকে যাইতে হইবে। অতএব এখানেও চারুবাবুর তালিকা হইতে কোনও যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ শিশুমৃত্যুই একমাত্র বাল্যবিবাহের ফল হইবে এমন নহে; সমস্ত জেলার সাধারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্তই বিচার করিতে হয়। সেগুলিও এক প্রকার মৃত্যু। সেরূপ ভাবে যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ঢাকায় শতকরা ৭৫, ময়মনসিংহে ১০৫, পাবনায় ১৫, দিনাজপুরে ২০, নোয়াখালিতে ৭৫ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখকের গণনা অনুসারে এই জেলাগুলিতে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ-সংখ্যা অতি অল্প। আবার বাঁকুড়ায় শতকরা ৫, মেদিনীপুরে ৫, মুর্শিদাবাদে ৪, বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানে ৩, বীরভূমে ৯৫, হুগলিতে ৩ ও নদীয়ায় ৩ হ্রাস পাইয়াছে। লেখকের উদ্ধৃত অঙ্ক হইতে এই জেলাগুলিতে ১০ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকার সংখ্যা পরিউক্ত জেলা-গুলি অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং মোটের উপর দেখা যায় যে, বাল্য-বিবাহে লোকক্ষয় হইতেছে! কেবল ১ বৎসরের শিশুদিগের মৃত্যু হইতে কোন ইতরবিশেষ ধরা না পড়িতে পারে (কেন না, বাল্য-বিবাহের ফল কেবল ১ বৎসরের শিশুর মরা বাঁচাতেই সমস্ত নহে); কিন্তু সমস্ত ক্ষয় বৃদ্ধির আলোচনা করিলে ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কলিকাতার শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে লেখক যে সকল অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য ঐ একই। খৃষ্টান ও মুসলমান-প্রধান ওয়ার্ডগুলিতে যদি শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেশী হয় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই; কেন না তাহাদিগের অনেকেই হিন্দু হইতে নূতন ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ সকল নূতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রায়ই নীচ হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তাহাদিগের অনেক দোষ হিন্দুদিগেরই প্রাপ্য। লেখক ইহাও বলিতে চান যে, কলিকাতাস্থ ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হিন্দু-দিগের অপেক্ষাও অধিক। তিনি যে সকল অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে খৃষ্টানদিগের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে কতগুলি দেশী খৃষ্টান ও কতগুলি ইয়োরোপীয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই কলিকাতাস্থ ইয়োরোপীয়দিগের শিশুমৃত্যুর হার ধরিতে পারা গেল না। আবার যেখানে হিন্দু, মুসলমান, দেশী খৃষ্টান ও ইয়োরোপীয়গণ বাস করে সেখানে যদি শিশুমৃত্যুর হার বেশী হয় এবং ইয়োরোপীয় স্ত্রীর সংখ্যারই আধিক্য প্রমাণিত হয় তথাপি তাহা হইতে ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার অধিক এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। কেন না এখানে সংখ্যার আধিক্য খুবই বেশী নহে। দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক স্ত্রীই অবিবাহিতা অবস্থায় থাকে। তৃতীয়তঃ সন্তান প্রসব বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা ইয়োরোপীয়দিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। আমাদের দেশে বড় অল্প সময় অন্তর ছেলে জন্মে, ইয়োরোপীয় দিগের মধ্যে তাহা নহে।

অধ্যাপক ত্রিগুনারায়ণের পুস্তকে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ বোধ হয় আমাদের তুলনায় ইয়োরোপীয়েরা অধিক শিক্ষিত ও ধনী। J. B. S. Haldane তাঁহার Eugenics and Social Reforms" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—"There is no doubt that the richer classes breed much more slowly than the poorer.....A thousand married teachers under fiftyfive annually beget 95 children, a thousand doctors 103, carpenters 150, general labourers 267. Thus the unskilled workers are breeding much faster than the skilled classes, and in view of the demands for intellectual and manual skill in modern civilization, this is an evil." যেখানে ইংলণ্ডে হাজারকরা শিশু ৩০ জন মরে সেখানে ভারতবর্ষে ২০০ জন মরে। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজদিগের মধ্যে শিশুমৃত্যু হিন্দু অপেক্ষা অধিক হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কোন্ ওয়ার্ডে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর বা কোন্ জাতির শিশুমৃত্যু কত হইল তাহা জানিতে হইলে কোন্ জাতির কত শিশু জন্মিয়াছিল এবং কত মরিল, তাহা সঠিক্ জানা চাই; কেবল কোন্ জাতি কত বাস করে বলিলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে যদি কোন জাতির সংখ্যা অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে সেই জাতির শিশুই যে মৃত্যুর হারের পরিমাণের নিয়ামক, তাহা এক প্রকার বলিতে পারা যায়।

যাহা হউক, আমরা মোটের উপর দেখিলাম যে, শিশুমৃত্যু আমাদের দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং যে সকল দেশে বালিকাবিবাহ অধিক সেই সকল দেশেই লোকসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা লোক-ক্ষয়ের একটী কারণ। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে জন্মের কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশুর মৃত্যু হয়; শিশুর মাতা রুগ্ন না হইলে এরূপ ঘটিতে পারে না। বাল্যবিবাহ এই রুগ্নতার একটী কারণ। মৃত শিশুদিগের শতকরা ৫০ জনের মৃত্যুর হেতু দৌর্ব্বল্য। এই দৌর্ব্বল্য পিতামাতার অপরিণতির হেতুই অধিক হইয়া থাকে।

ইহার পর স্ত্রীমৃত্যু বিচার করিয়া দেখা যাউক্। চারুবাবু বলিতেছেন যে, বিহারপ্রদেশে যেখানে পুরুষদের ১০০ মরে, সেখানে স্ত্রীমৃত্যু ৮৯২, বাঙ্গালায় ৯১২, সমস্ত ইয়োরোপের average ৯০৫। বাঙ্গালার পুরুষের মৃত্যুতুলনায় স্ত্রীমৃত্যু ইয়োরোপের পুরুষের মৃত্যু-তুলনায় স্ত্রীমৃত্যুর সমানুপাতে ঘটিয়া থাকে বলিয়া এরূপ প্রমাণিত হয় না যে বাল্যবিবাহের দরুণ বাংলায় স্বাস্থ্যহানি হইতেছে না। স্ত্রীদিগের বাঁচিবার শক্তি পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী। "The male mortality is greater than the female at every age." (See Bertillion, art. "Mortality")। সেইজন্য সকল দেশে স্ত্রীমৃত্যুর হার পুরুষমৃত্যুর হারের অপেক্ষা কম। আমাদের দেশে স্ত্রীরাও যেরূপ ক্ষীণায়ু হইয়া আসিতেছে, পুরুষরাও সেইরূপ ক্ষীণজীবী হইতেছে। এই নিমিত্তই স্ত্রীমৃত্যুর সহিত পুরুষমৃত্যুর অনুপাত ইয়োরোপীয় দেশগুলির সহিত সমান রহিয়াছে। সুতরাং এই সমান অনুপাত আমাদের দেশের ভাল স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। ইংলণ্ডে পুরুষের গড় আয়ু ৪৬·৫৬ ও স্ত্রীলোকদিগের ৫২·৩০। আমাদের দেশে পুরুষের গড় আয়ু ২২·৫১ ও স্ত্রীলোকদিগের ২৩·৩১। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে আমরা কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। চারুবাবুর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আমাদের দেশে যখন স্ত্রীলোকদেরই বাল্য-বিবাহ হইয়া থাকে, তখন তাহার ফলে স্ত্রীলোকদেরই বেশী ক্ষতি হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষের মৃত্যুতুলনায় স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুহার গণনা করিলে যখন সে ক্ষতি লক্ষিত হয় না, তখন বাল্য-বিবাহ ক্ষতিকর নহে। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, স্ত্রীলোকেরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে কেবল কয়েকটী বিষয়ে চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ, মাতা দুর্ব্বল হইলে সন্তানও দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং বালিকা-বিবাহে কেবল স্ত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ নহে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমস্ত জাতিটিই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে পুরুষদিগের মধ্যেও বাল্য-বিবাহ অপ্রচুর নহে। তৃতীয়তঃ, এদেশে পুরুষরা প্রায়ই দুইবার, তিনবার বিবাহ করে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা একবার বিধবা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করে না। এই কথাগুলি বিবেচনা করিলে পুরুষমৃত্যু-হারের সহিত স্ত্রীমৃত্যুহারের অনুপাত অন্যান্য দেশের সহিত সমান কেন আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি—Sir Edward Gait সাহেব বলিয়াছেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী। Gait সাহেব ইহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবার আতিশয্যই ইহার কারণ। লেখক এই কারণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন যে হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অধিক হইলেও অবিবাহিতার সংখ্যা অতি অল্প; অন্যান্য ধর্ম্মীদিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অল্প হইলেও অবিবাহিতার সংখ্যা অনেক বেশী। অনুপাতে হিন্দুবিধবা ও অবিবাহিতার সংখ্যা একত্রে অন্যান্য ধর্ম্মীদিগের অবিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যার সমান বা কিছু কম। সুতরাং লেখকের মতে হিন্দুবিধবার আতিশয্য হিন্দুরমণীদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনার কারণ নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিধবার সংখ্যাধিক্যই যদি হিন্দুরমণীদিগের vitalityর কারণ না হয় তাহা হইলে অন্য কোনও কারণ আছে, এবং সেই কারণটী যে হিন্দুদিগের বাল্যবিবাহ নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে একই অবস্থার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করিলেও হিন্দুরা সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে কেন? হিন্দুরমণীদিগের মধ্যে vitalityর আধিক্য সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী suggestion করিতে পারি। প্রথম,—ভারতীয় খৃষ্টান অধিকাংশই হিন্দু এবং অতি অল্পকালই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে; এই সকল হিন্দু আবার প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর। সুতরাং খৃষ্টান রমণীদিগের অপেক্ষা হিন্দুরমণীর

vitality অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও সেই একই কথা; অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ,—হিন্দুবিধবাদিগের সহিত অন্যান্য জাতীয় বিধবার তুলনা করা যায় না; যেহেতু অন্যান্য জাতীয় বিধবাগুলি সেই সেই সময়ে বিধবা থাকিলেও ইহার পূর্ব্বে দুই একবার বিবাহিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু হিন্দুবিধবাদিগের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। অবিবাহিতাদিগের সংখ্যাও অনেকটা misleading; যেহেতু, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, গণনার অল্পকাল মধ্যে তাহারা বিবাহিতা হইয়া পড়িতে পারে। তৃতীয়তঃ,—হিন্দুরমণীগণ অধিকতর সংযমী, বার, ব্রত, উপবাস তাহাদের শরীরকে ঘাতসহ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মদ্য, মাংস, তামাকু প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যের ব্যবহার একেবারেই নাই। তাহাদের শক্তি কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট পথে নিয়োজিত হইয়া অযথা ব্যয় বা ক্ষয় হইতে রক্ষা পায়।

সুতরাং চারুবাবু স্ত্রী মৃত্যু সম্বন্ধে যে দুইটী যুক্তির কথা বলিয়াছেন তাহার একটীও বাল্য-বিবাহ স্ত্রীমৃত্যুর কারণ নহে এরূপ প্রমাণ করেন নাই। আমরা বরং দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীগণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতি ধ্বংসের পথে গমন করিতেছে। Martin বলিয়াছেন, "In Calcutta and in Bombay child birth in 1921, entailed death for 25 mothers out of every thousand as compared with less than 4 per thousand in England." ইহা হইতে দেখা যায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই প্রসূতিমৃত্যু ১৫ হইতে ১৭ বৎসরের বালিকাদের মধ্যেই অধিক লক্ষিত হয়। আবার, স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছে দেখুন। বঙ্গদেশে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা :—

১৮৩১,	১৯০১,	১৯১১,	১৯২১
৯৭৩	৯৬০	৯৪৫	৯৩৪

স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এরূপভাবে হ্রাস পাইতেছে কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্ত্রী দুর্ব্বল হইলেই কন্যা অল্প জন্ম গ্রহণ করে। Dr. R. T. Trall বলিয়াছেন, "If the male is older and stronger than the female, the offspring will be more of males than females. It the females are most vigorous the offspring will contain more females." আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে চিরকালই বড়; পূর্ব্বে বরং বয়সের পার্থক্য যতটা অধিক থাকিত, এক্ষণে স্ত্রী পুরুষে সেরূপ বয়সের পার্থক্য থাকে না। সুতরাং আজকাল কন্যা জন্মানরই অধিক সম্ভাবনা। তাহার পরিবর্ত্তে কন্যার জন্মের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, স্ত্রীলোকদিগের জীবনী-শক্তি কিরূপ ভাবে কমিয়া আসিতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক সংখ্যায় যক্ষ্মারোগে হারাইতেছে।

বয়স	হাজার করা পুরুষের মৃত্যু	হাজার করা স্ত্রীলোকের মৃত্যু
১০-১৫	·৪৭	২.১
১৫-২০	১·৪	৭·১
২০-৩০	১.৭	৬.২
৩০-৪০	২·১	৪.৯
সকল বয়সের	১.৬	৩.৭

কেহ কেহ বলিবেন, কলিকাতায় মেয়েদিগের পর্দ্দাই ইহার একমাত্র কারণ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাল্য-বিবাহও যে ইহার একটী হেতু, তাহা বেশ বুঝা যায়। কেননা ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বালিকাগণ খুব অল্পকালই পর্দ্দায় আটকা পড়িয়াছে বলিতে হইবে; তথাপি তাহাদিগের মৃত্যুর হার ঐ বয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয় না কি, যে, বালিকাদিগের অধিকতর বাল্য-বিবাহও এইরূপ মৃত্যুর একটী অন্যতম কারণ? (ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের জীবনীশক্তি পুরুষদিগের জীবনীশক্তি অপেক্ষা অধিক।)

আমরা দেখিলাম যে প্রকৃতপক্ষে বাল্য-বিবাহে স্ত্রীলোকদিগের জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিটাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আরও দুই একটী প্রমাণ হইতে তাহা স্পষ্টতর করা যাউক। হিন্দু ও মুসলমান আমাদের দেশে একই অবস্থায় বাস করিতেছে, তথাপি হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের মৃত্যুর হার অল্প। ইহার এক কারণ, অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু মুসলমানগণ মধ্যে হিন্দুদিগের অপেক্ষা বাল্য-বিবাহ কম হয়, তাহাও একটী কারণ। কেননা যে সকল স্থানে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা দুই গুণ, তিন গুণ বেশী, সেই সব স্থানেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে সকল স্থানে হিন্দু, মুসলমান অপেক্ষা সংখ্যায় তিন গুণ, চারি গুণ, পাঁচ গুণ বেশী, সে সকল স্থানে লোকসংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কেবল হিন্দুদিগের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণই মুসলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নহে। কিরূপ হারে হিন্দু ও মুসলমানগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় দেখুন :—

হাজার করা হিন্দু ও মুসলমানের মৃত্যুর হার :—

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১১		২১.৫
১৯১২	৩০.৪	২৭.৬
১৯১৩	২৯.০	২৮.৪
১৯১৪	৩০.১	৩০.
১৯১৫	২৯.১	৩২
১৯১৬	২৯.২	২৮.৩

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১৭	৩৩.৩	৩১.৯
১৯১৮	৬৪.৬	৫৬.১
১৯১৯	৩৬.৪	৩৩.৬
১৯২০	৩১.০	৩০.০

আর একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল জাতির অধিকতর অল্পবয়সে বিবাহ হইয়া থাকে তাহারা অতি দ্রুতহারে ক্ষয় পাইতেছে

শতকরা লোক সংখ্যার হ্রাস—

ময়রা	তাঁতি	কুমার	সদ্‌গোপ	গোয়ালা
৩.৮	১.০	২.১	৩.১	৯.১

চারুবাবু স্বীয় মত প্রমাণ করিবার জন্য একটী কৌতুকজনক যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭০ সালে এদেশে যখন প্রথম বিলাতি জীবন-বীমা প্রচলিত হয়, তখন এদেশবাসী অপেক্ষা ইয়োরোপীয়দিগের পরমায়ু অধিক এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ এদেশবাসীর নিকট হইতে অধিক premium গ্রহণ করিতে থাকেন। কিন্তু ২০, ২৫ বৎসরের মৃত্যুর হার খতাইয়া যখন তাঁহারা দেখিলেন যে এদেশবাসী ও ইয়োরোপীয়গণ সমকালই বাঁচিয়া থাকে তখন তাঁহারা উভয়ের হার সমান করিয়া দিলেন। জীবন-বীমা কেবল সেই সকল লোকই করিতে পারে যাহারা ডাক্তারি পরীক্ষায় অতি স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্বাস্থ্যবান্ ভারতবাসী ও ইয়োরোপীয় সমসংখ্যক কাল বাঁচিয়া থাকে, ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? যদি এরূপ প্রমাণিত হইত যে, ভারতবাসীর শতকরা যত লোক ডাক্তারি পরীক্ষায় জীবন বীমা করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহাদের সংখ্যা ঐরূপে নির্দ্ধারিত ইয়োরোপীয় সংখ্যার সমান, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতাম যে, এদেশবাসীর স্বাস্থ্য ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইয়োরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তাহা অনেকবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেখকের এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে তাহা অপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা বৃথা।

এক্ষণে দেখা যাউক, শরীরতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সুশ্রুত সংহিতার মত এ সম্বন্ধে কি। সুশ্রুত বলেন, পূর্ণ ষোড়শবর্ষা স্ত্রীর সহিত ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক পুরুষের মিলন হওয়া আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা উহাদের বয়স ন্যূন হইলে নবজাত সন্তান রোগী, অল্পায়ু বা অধন্য হইয়া থাকে; কিংবা গর্ভ একেবারেই হয় না। বর্ত্তমান কালেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, যাঁহার উদ্যোগে এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার জন্য Indian Association for the Cultivation of Science স্থাপিত হয়, তিনিও ঐ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সেই জন্য বাল্য-বিবাহ রহিত করিবার বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে—শরীর ও মন যত দিন পরিণত ও পরিপক্ক না হয় তত দিন তাহার ফলও পরিপুষ্ট ও নির্দ্দোষ হয় না। চারুবাবু বলিয়াছেন যে, Dr Weismann বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, যে সকল জীবকোষ শরীর গঠন ও তাহার পুষ্টিসাধন করে আর যে জীবকোষ সন্তানোৎপাদন করে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহা হইতে চারুবাবু এই অনুমান করেন যে যখন পুষ্টিসাধক কোষ সন্তানোৎপাদক কোষ হইতে বিভিন্ন, তখন সন্তানোৎপাদনের বয়স হইতে সন্তান উৎপাদন আরম্ভ করিলে শরীরের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। সন্তানোৎপাদক জীবকোষ ও পুষ্টিসাধক জীবকোষ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একটী জীবকোষ অপর জীবকোষটীকে সাহায্য করিতেছে না এরূপ মনে করিবার কি আছে? তাহাই যদি না হইবে তাহা হইলে, শরীর পুষ্ট থাকিলে, সবল থাকিলে, নীরোগ থাকিলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কেন? যে পিতামাতা ক্ষীণ তাহাদের সন্তান ক্ষীণ হয় কেন? পিতা বা মাতা জীবনের মধ্য বয়সে (যখন প্রথম সন্তান উৎপাদন করিবার বয়স তাহারা অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবার পর) কোন কঠিন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয় কিরূপে? আবার শরীর পুষ্টির সহিত শুক্র ক্ষয়ের সম্পর্ক না থাকিলে "ব্রহ্মচর্য্য কর, ব্রহ্মচর্য্য কর" একথা উঠে কেন?

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণা।
তস্মদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং॥"

এ কথাই বা আসিল কোথা হইতে? Gait সাহেব হিন্দুরমণীদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা অধিক ইহার কারণ প্রদর্শনে হিন্দুরমণীদিগের বিধবার সংখ্যাধিক্যের কথা তুলিয়া ঐ একই বিশ্বাস প্রদর্শন করিতেছেন না কি? শুক্রক্ষয়ে যখন শরীরের ক্ষয় হয় তখন শরীরের পুষ্টিতে যে শুক্রের পুষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আবার পিতামাতার মানসিক অবস্থাও যে সন্তানে বর্ত্তে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন পিতার সুস্থ অবস্থায় কোন সন্তান হইলে দেখা যাইবে সে সন্তানও সুস্থ; আবার সেই পিতা পাগল হইলে পাগল অবস্থায় যে সন্তান হয় তাহাকেও পাগল হইতে দেখা যায়। সুতরাং পিতার মানসিক অবস্থা সন্তানকে আক্রমণ করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কিরূপ কন্যা বিবাহ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "ঐ কন্যা যেন রোগশূন্যা, ও অসমান কুলগোত্রসম্পন্না হয় এবং উহার যেন কোন অঙ্গ বিকৃত না হয়।" ইহাতে বুঝা যায়, মাতার অঙ্গের বিকার সন্তান পাইতে পারে। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে "প্রসূতির ভুক্ত পীত অন্নরসাদি গর্ভস্থ জীবের উদরস্থ হইয়া থাকে—" প্রসূতি যদি ক্ষীণাহারী ও অজীর্ণরোগী হয় তাহা হইলে কি গর্ভস্থ সন্তানের সুস্থতার ব্যাঘাত হইবে না? মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সন্তানকে বিশেষরূপে আক্রমণ করে বলিয়াই গর্ভিণীকে অতি সাবধানে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সকল সমাজেই লক্ষিত হইবে। গর্ভিণীকে যাহাতে অল্প শ্রম করিতে হয়, গর্ভিণী যাহাতে মনের আনন্দে থাকে—তাহার আয়োজন করা

হয়। এই জন্যই কোন ছেলেকে লোভী হইতে দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে যে, গর্ভাবস্থায় উহার মা কিছু খাইতে ইচ্ছা করিয়া পায় নাই। মনুও এইজন্য বলিয়াছেন যে, সন্তানের জন্য যখন স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, তখন সে পান খাইয়া সাজসজ্জা করিয়া প্রফুল্লমনে স্বামীর নিকট যাইবে। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন, "That a strong mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him, even though he has had no sexual intercourse with him." মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই যে অভিমন্যুও মাতার গর্ভে অবস্থান কালীন ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু নির্গমনের কথা শুনে নাই; সেইজন্য সে যুদ্ধকালে জয়দ্রথরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বাহির হইতে পারে নাই। সেইরূপ শুকদেব ও কপিল মুনিও গর্ভে থাকিবার কালেই সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইবে যে, আর্য্যগণ অনেক পূর্ব্বেই জানিতেন যে, পিতামাতার স্বাস্থ্য ও জ্ঞান সন্তানে সংক্রামিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক পরিণতির পূর্ব্বেই সন্তান হইলে তাহাতে অনেক দোষ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতি দ্বারা কোন শক্তি জাগরিত হইয়া উঠিলেই যে সেই শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। শক্তিটী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত, বর্দ্ধিত ও বশীভূত করা আবশ্যক। নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয় এবং নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে নড়াচড়ার দরুণ যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা প্রকৃতির দ্বারাই পূরণ হয়। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু যেখানে সেই শক্তি সন্তান রূপে অন্য এক ফল প্রসব করিবে, সেখানে এই অপরিপক্ক শক্তিকে অপরিপক্ক সন্তান উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া সেই শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রকৃতির অভিপ্রায় এইরূপ নহে। যেমন সকল বিষয়েই মানুষের প্রলোভন আছে এখানেও সেইরূপ। যদি কেহ কোন নূতন শক্তি লাভ করে তাহার সাধারণতঃ ইচ্ছা হয় যে সে সেই শক্তির ব্যবহার করে। যে নূতন কোন পদবী লাভ করিয়াছে, সে সেই পদবীর আনুষঙ্গিক শক্তি হেতু একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। মানুষও কৈশোর অবস্থায় এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়। সে একটা উত্তেজনা অনুভব করে, কিন্তু সেই উত্তেজনার বশীভূত হওয়া তাহার পক্ষে কখনই সমীচীন নহে। সেই শক্তির সহিত একটা প্রবৃত্তি জড়িত থাকে। এবং সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, এই শক্তি বীজস্বরূপ; ইহা হইতে অন্য বৃক্ষ ফলিবে; সুতরাং এই বীজ যাহাতে অসময়ে অপরিপক্ক অবস্থায়, অস্থানে উপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর লেখক সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইয়া সত্যশরণ সিংহ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "কাঁচা বেগুনের বীজে গাছ পুঁতিলে গাছ বড় হলে কুঁকড়ে যায়। তাহাতে ফল ধরে না। নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু ঘোড়া প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, না হয় চিরকাল রুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে।" এখানে কাঁচা বেগুন অপরিপক্ক বীজের সহিত তুলিত হইতেছে এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি অপরিপক্ক বীজ অপরিণত অবস্থায় গর্ভনিষেকের পরিণাম। সুতরাং তাহার ফল কুঁকড়ান গাছের মতই অঙ্গহীন হইবে। আবার নারিকেল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের প্রথম ফুলে সন্তান হয় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীলোকগণ প্রথম রজোদর্শন করিলেই যে পুরুষের সহিত তাহাকে সঙ্গত হইতে হইবে প্রকৃতির এরূপ উদ্দেশ্য নয়; রজোদর্শনের পরও তাহার শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক হয়। সকল ফুলেই ফল হয় না বলিয়া যে লেখক এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা খাটে না। প্রথম বারের ফুলে একেবারেই কেন ফল হয় না তাহা বিবেচ্য। প্রথম বিয়ানো গরু, ঘোড়া প্রভৃতি রুগ্ন হয়, এ কথা লেখক স্বীকার না করিলেও, তিনি যদি লক্ষ্য করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালীদিগের গৃহে গৃহে প্রথম গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে বৃক্ষে অতি অল্পবয়সে ফল ফলিতে আরম্ভ হয় সে বৃক্ষ আর অধিক বৃদ্ধি পায় না; প্রথম যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা আশানুযায়ী বড় হয় না এবং প্রথমবারে অধিক ফলও ফলে না। অনেক সময় কোন কোন বৃক্ষে ফল ধরিবার আগে তাহার ডালপালাগুলি কাটিয়া দিলে সেই সকল বৃক্ষে প্রচুর ফল ফলিয়া থাকে। প্রথমে ফল হইতে না দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। অনেক পেঁপে গাছে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না; সেই সকল পেঁপে গাছের মাথা কাটিয়া দিলে তাহাতে ফল ফলিয়া থাকে। যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইয়া ফুল প্রসব করাই ইহার বন্ধ্যাত্বের হেতু বলিয়া মনে হয়। কাজেই সাদৃশ্য ন্যায়ও বাল্য বিবাহের অনুকূল নহে। কিন্তু প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ ঠিক্ পশুপক্ষী, গাছপালার ন্যায় নহে। প্রকৃতিকে মানুষ প্রতিপদে অতিক্রম করিতেছে, এবং সেই অতিক্রমের ফলে প্রকৃতির এই বিদ্রোহী সন্তানটী পশুপক্ষী হইতে একটী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। মানুষের স্বভাব পশুপক্ষীর স্বভাব হইতে বিভিন্ন। মানুষ ঘর নির্ম্মাণ করে, খাদ্য পাক করে, রোগ হইলে ঔষধ প্রয়োগ করে। সেইজন্য সে পশু পক্ষীর ন্যায় উদাসভাবে নিজেকে প্রকৃতির অন্ধশক্তির অধীনে ছাড়িয়া দিতে পারে না। প্রকৃতি চালিত জীবজন্তু উত্তেজনা হইলেই গর্ভনিষেক করিয়া থাকে, মানুষকে নিজের প্রকৃতির গঠন বুঝিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। পশুপক্ষী যেখানে সেখানে গর্ভনিষেক করে, মানুষ তাহা পারে না। মানুষ জানে, নিকট আত্মীয়ের সহিত মৈথুন বংশনাশকর। বিজ্ঞান বলে, যদি একই রক্ত চিরকাল মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই রক্তের সজীবতা ও নবীনতা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; এরূপ রক্ত হইতে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "One cause of human deterioration is family marriages. It has almost extinguished most of the royal families of Europe." হিন্দুরাও এ কথা জানিতেন; সেই জন্যই স্বগোত্রে

বিবাহ নিষিদ্ধ। পশুপাখী, জীবজন্তুগণ এ সব নিয়ম মানিয়া চলে না। তাহারা মৈথুন বিষয়ে পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, নিকট দূর কিছুই গ্রাহ্য করে না। মানুষের এ কার্য্য এখানে নির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ। পশুর ন্যায় সকল সময় সে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে দুইটী প্রকৃতি রহিয়াছে:—একটী স্বভাবজ প্রবৃত্তি, আর একটী চৈতন্যময়ী বিবেকসম্পন্ন বিচারশক্তি। এই দুইটী শক্তির সমন্বয়ে মানুষ; মানুষের শরীরে দুইটীই কার্য্য করিতেছে। সে অন্যান্য জীবজন্তু হইতে একটু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সেইজন্যই যে পশু-প্রকৃতি অন্যান্য পশুর পক্ষে অমঙ্গলকর নহে, সেই পশু-প্রকৃতি মানুষের ধাতের সহিত খাপ খায় না। শরীরের উপর যেমন শারীরিক যন্ত্রের আধিপত্য আছে, সেইরূপ মানুষের মনের অনুভূতি প্রভৃতিও কার্য্য করিয়া থাকে। এই অনুভূতির বলেই মানুষ নিজের আত্মীয়স্বজনের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। অনুভূতিকে উপেক্ষা করা চলে না; অনুভূতি বহুকালকার সঞ্চিত ন্যাস; তাহার দ্বারা মানুষের system অনেকটা গঠিত। যেখানে পাশবিক উত্তেজনার ফলে কোন পশু মৈথুন কার্য্য করিয়া একটা আনন্দ পাইয়া থাকে, সেখানে সেই প্রবৃত্তিই আবার সেই পাশবতার দ্বারাই মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। সেই প্রতিক্রিয়া শরীরের পক্ষেও অমঙ্গলকর। বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে যে খুব delicate balance থাকে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম জিনিষেরও ভার ধরা পড়ে; ধান ওজনের পাল্লাতে একসের ধান দিলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। মানুষের শরীরটী নানা কারণে এইরূপ একটী delicate balance; নানারূপ জটিল, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব, অনুভূতি, মনন, ধ্যান প্রভৃতির সহিত জড়িত। সেইজন্য যদি পশু-পক্ষী প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কাজ করে, তাহাতে তাহাদের যে অনিষ্ট হয়, তাহা অতি অল্প; অনেক সময় চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু মানুষ সেই কাজ করিলে তাহার জটিল যন্ত্রটী বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইবার সময় এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। প্রকৃতির দিকে চাহিলে আর একটী সত্য সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। যে প্রাণী যত দেরীতে গর্ভধারণ করে, তাহারা তত উচ্চশ্রেণীর প্রাণী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎকুণ প্রভৃতি জন্মাবার অতি অল্পকাল পরেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে; কুকুর, বিড়াল আরও কিছু বেশী সময় লয়; গরু, ঘোড়া, হাতী তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় লয়, মানুষ প্রথম গর্ভধারণ করে অনেক পরে। আবার এই গর্ভের স্থিতিকাল ও একই কালে প্রসবের সংখ্যার তারতম্যেও নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। মানুষ গর্ভধারণ করিয়া এককালে কেবল একটী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মানুষের ছেলের হাঁটিতে বা চলিতে শিখিতেও বেশী সময় লাগে। ইহার কারণ বোঝা কিছু কষ্টকর নহে; একটী উচ্চাঙ্গের প্রাণীকে জন্ম দিতে হইলে অধিক শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রাচীন পুরাণাদিতেও এইরূপ ধারণার অস্তিত্ব আছে। যেখানেই কার্ত্তিক প্রভৃতি বীরের জন্মবিষয়ে বর্ণনা আছে, সেইখানেই দেখা যাইবে, গর্ভ বহুকাল পরে হইয়াছিল ও বহুকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মানুষ বিবর্ত্তনের ফল; সে ক্রমে ক্রমে নিজের শক্তির চালনার দ্বারা নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অসীমের দিকে চলিয়াছে। তাহার যেমন গর্ভধারণ করিতে অধিক সময় লাগে, সেইরূপ অন্য জীবজন্তু প্রথম গর্ভধারণ শক্তিলাভের পর যত শীঘ্র গর্ভধারণ করিতে রত হয়, মানুষ ঐ শক্তিলাভের পর তাহা অপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করে।

আর অধিক আলোচনা আবশ্যক বোধ হয় না। চীন, জাপান, রাসিয়া, তুর্কী ও মাউরী প্রভৃতির কথা লেখক তুলিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অল্প স্থানের মধ্যে অসম্ভব। অতএব দুই একটী কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। যদিও ঐ সকল জাতির মধ্যে অল্পবিস্তর বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল বা আছে, তথাপি তাহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া ঐ অনিষ্টকর প্রথার উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। রাসিয়ার সর্ব্বত্র বাল্যবিবাহ প্রচলিত নয়;—জাপান বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিয়াছে, তুরস্ক বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং এই সকল জাতি প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিয়াছে। চীনাদের সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ হইলেই যে সমস্ত চীন দেশটি সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। মাউরীজাতি বন্য ও পরিশ্রমী; সুতরাং স্বভাবতঃ তাহাদের দেহের গঠন শক্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে মৃত্যুহার বেশী নয়, বা বাল্যবিবাহ না থাকিলে তাহারা যেরূপ সুস্থ ও উন্নতিশীল জাতি হইতে পারিত, তাহা কে নির্ণয় করিয়াছে? আমাদের দেশে বাগ্দী, বাউরি, প্রভৃতি জাতি শারীরিক শক্তিতে ভদ্রলোকশ্রেণী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; তথাপি তাহাদের মৃত্যুর হার ভদ্রলোকদিগের অপেক্ষা বেশী। বাগ্দী জাতি শতকরা ১১·৮ ও বাউরি জাতি ৩·৪ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার কোন সময় বিশেষে কোন জাতির সৈন্য দ্বারা দেশ বিশেষ জয় করিলেই যে সেই বিজেতৃজাতি সুস্থ ও সবল বা বাল্যবিবাহ না থাকিলে যেরূপ সুস্থ ও সবল হইতে পারিত সেইরূপ আদর্শানুমোদিত এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সৈন্যের বহরেই সমস্ত দেশের সাধারণ শক্তির বিচার করা যায় না। এই বিষয় ঠিক্ ভাবে বিচার করিতে হইলে চীন, জাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য উপস্থিত করা আবশ্যক ছিল, লেখক তাহা করেন নাই। এদিকে আবার লেখক যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগকে বেশী বয়সে বিবাহের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। বড় বড় সহর, কলকারখানা, বদ্ধ বায়ু, পর্দ্দা, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, রোগের সংক্রমণতা—ইহারাই হইল যক্ষ্মারোগের জন্মদাতা। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া লেখক কেবল নিজের সুবিধার জন্য অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহা হউক, যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অকালমৃত্যু ছাড়া, বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যু অপেক্ষাও অনেক অধিক দোষের আকর। মানুষের যাহাতে

সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তাহা একটী দ্বাদশবর্ষবয়স্কা; সংসারজ্ঞানহীনা বালিকাকে বহন করিতে নিয়োজিত করার ন্যায় পাপ আর নাই। সে সকল কথা নাই তুলিলাম; কিন্তু অনেক অকালমৃত্যুও কি, এই অবিবেচক বালিকাদিগের অজ্ঞতা, সংযমহীনতা, দায়িত্ব-বোধহীনতারই ফল নহে? ছেলে যদিই বা আঁতুড় ঘর হইতে জীবন লইয়া বাহির হইতে পারে—তথাপি কি সে মাতার অপটু নায়কত্বে দুশ্চরিত্র, মদ্যপানাসক্ত হইয়া অকালমৃত্যু ও জীবন্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না? সে সকল বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়া, আমরা এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। শেষে কেবল বলিতে চাই, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতার সহিত বাল্যবিবাহও বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর একটী প্রধানতম হেতু। এ কথা অস্বীকার করিলে শত্রুবেষ্টিত শশকের ন্যায় গর্ত্তের মধ্যে মুখ পুরিয়া নিজেকে নিরাপদ ভাবার ন্যায় হইবে।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

১৮

পাপিয়া বহি পড়িতেছিল; আর অমল বিছানায় শুইয়া শুনিতেছিল। একটা উপন্যাস। নায়িকা প্রাণ ঢালিয়া ভালো বাসিয়াও নায়কের মন পাইতেছে না,—নায়ক এক পাষাণীর প্রাণের দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতেছে—তবু সে পাষাণী ফিরিয়া দেখিতেছে না। যখন পাষাণীর কাছে লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়া নাকাল, তখন হঠাৎ পথে কে গাহিয়া উঠিয়াছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

নায়ক তখন বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কে এ... কাছে কে আছে!...

এইখানটা পড়িতে পড়িতে পাপিয়ার বুক বেদনায় ভারী হইয়া আসিল, তার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল!... দুই চোখ বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। এত দুঃখ সত্যই তবে কেহ সহিয়াছিল···তারি মত, এমন প্রচণ্ড, এমনি তীব্র বহ্নি-দাহ!...মহাপুরুষ, মহাপুরুষ এ বইয়ের লেখক, নারীর অন্তরের বেদনা এমন করিয়াও জানিয়াছেন! না জানিলে নায়িকার এই অসহ্য দুঃখ তুলির রেখায় এমন করিয়া কখনো লিখিতে পারিতেন না! এ যে তার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে—নায়িকার অতি-ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু অবধি!...

চোখের জলে বইয়ের পাতা এমন অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল যে আর পড়া চলে না।

পাপিয়া বই পড়া থামাইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

অমল বলিল,—থামলে যে চপলা...

পাপিয়া কহিল,—আর পড়তে পাচ্ছি না। কমলার এত দুঃখ.. বড় কষ্ট হয় যে! চেষ্টা করিয়াও পাপিয়া তার স্বরে অশ্রুবারির জড়তাটা ঘুচাইতে পারিল না।

হাসিয়া অমল কহিল—এ যে বইয়ের গল্প পড়চো! এ কি সত্যি...?

পাপিয়া কহিল,—হোক গল্প—তবু জীবনেও তো এমন হয়!

অমল আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি পাগল হয়েছ!

—না গো, পাগল নই আমি। আমি যে মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের দুঃখ তুমি তো···

—তোমাকেও কি এমন দুঃখ পেতে হয়েছে না কি...?

পাপিয়া শরাহতের মত চমকিয়া অমলের পানে চাহিল —অমলের ঠোঁটের কোণে হাসির বিদ্যুৎ তখনো মিলাইয়া যায় নাই।...নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর···পাইতে হইয়াছে কি! পলে পলে যে বেদনা সে সহিতেছে, তাহা তোমার অতি চমকপ্রদ কোনো উপন্যাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো লেখক তুলির লেখায় ফুটাইয়া তোলে নাই! ফুটাইবার সাধ্য কি! কালির আঁচড়ে এ বেদনা ফুটানো যায় না···এ বেদনা

ফুটাইয়া দেখাইতে গেলে বুকের মাঝে শির ছেঁড়া রক্তে তুলি রঞ্জিত করিতে হইবে যে!...

অমল কহিল,—এইতেই ধরা পড়ে যাচ্ছ চপলা... তোমার মন যে কতখানি কোমল, কি দরদে ভরা,—উপন্যাসে লেখা মিথ্যা নরনারীর দুঃখে এত বিচলিত হও—! সত্যই তুমি দেবী···

কি ক্রূর পরিহাস, অদৃষ্টের এ কি মর্ম্মঘাতী নিদারুণ ব্যঙ্গ!...তবু এ কি নাগপাশেই যে তাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, মুক্তি নাই, মুক্তি নাই...এ বাঁধন কাটিয়া পলাইবার তার কোন উপায়ও নাই। সে জানে, আর ক'টা দিন মাত্র... তারপর তার প্রকাণ্ড ছলনা ধরা পড়িয়া যাইবে, আর সে... অদৃষ্টে যাই থাক, সুধার পাত্র যখন অধরের সামনে এমন করিয়া ধরা আছে, তখন মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ভয়ে কাতর হওয়া নয়,...এ সুধা যতটা পারি পান করিয়া ধন্য হই।—

অমল বলিল,—পড়তে কষ্ট হয় তো থাক্—আর পড়ো না।···মোদ্দা লেখাটা ভালো এমন জায়গায় থেমে থাকলে ভারী অস্থির থাকতে হয়—কি হলো শেষে, বেচারী কমলার...

উছলিত আগ্রহে পাপিয়া কহিল,—তোমার দুঃখ হচ্ছে না কমলার দুঃখে—?

অমল কহিল,—তা হচ্ছে বৈ কি। তা বলে তোমার মত কাঁদবো—এ তো রচা গল্প কথা চপলা...

তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল,—এ তো আমার চপলা নয়, আমার জীবনের একমাত্র সত্য...যে তার দুঃখে আমার চোখে জল পড়বে!···তবে দুঃখ হয়। বড় লিখিয়ের লেখার শক্তিই এই, তাঁর কল্পিত নরনারীর সুখে আমরা আনন্দ পাই, তাদের দুঃখে আমাদের প্রাণ বেদনায় ভরে ওঠে!...

পাপিয়া কহিল, তুমি আমায় তো ভালবাসো···পাপিয়ার কথা বাধিয়া গেল। আর সে কিছু বলিতে পারিল না।

অমল কহিল। বাসি তো···তারপর...? বল...

পাপিয়া কহিল,—আমি যদি এই দুঃখ ভোগ করি, নৈরাশ্যের এমন তীব্র যাতনা···তাহলে...পাপিয়ার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—বেদনা তার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

অমল কহিল,—তাহলে আমি কি করি জানো...? যে হতভাগার জন্যে তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ, ঠিকানা পেলে আমি গিয়ে তার কা'ণ দুটা আচ্ছা করে মলে দি···আর চাবুকের ঘায়ে তাকে এনে তোমার পায়ের উপর তার মুখখানা গুঁজড়ে ধরি...

পাপিয়ার আর সহ্য হইল না, এ বেদনার যে সীমা নাই গো!···পাছে সব গোপনতা ভাসিয়া আসল সত্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া পড়িল এবং বারান্দার এক কোণে পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—ওগো, সত্যই কি তাই!—সত্যই কি পাপিয়ার বেদনা তুমি বুঝিবে, এমনি দরদ করিয়া এমনি সহানুভূতির পুঞ্জিত ধারায়...তবে কি সত্যই আজ তোমায় প্রকাশ করিয়া বলিব গো, এই ছদ্মবেশ, ছলনার পূর্ণ প্রকাণ্ড জাল ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া—কে আমি!... হায়, তুমি কি তা বিশ্বাস করিবে—যে পাপিয়া তোমার একটু ছোট্ট সুখের জন্য আজ হাসিমুখে মরণের কোলে ঝাঁপ দিতে পারে—আর যে চপলার জন্য তুমি পাগল, সে কতবড় পাষাণী...! এ ছদ্ম অভিনয়ে তোমায় ভুলাইয়া রাখিতে পাপিয়ার বুক যে আজ ভাঙ্গিয়া খান্‌খান্ হইয়া যাইতেছে—তার নারীত্ব যেটুকু শুভ্র মহিমায় কালি বাঁচাইয়া মর্ম্মের এককোণে লুকাইয়া পড়িয়া ছিল, সেটুকু যে এ ভাণ, এ মিথ্যার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে!... মানুষের প্রাণ তো...কত সয় আর!···

কিন্তু না, সে কি পাগল হইয়াছে! এ তো উপন্যাস নয়, এ যে জীবন—নির্ম্মম কঠিন ভীষণ জীবন!...এখানে একফোঁটা অশ্রুজলে মানুষের মন ফেরে না, একটা কাতর দীর্ঘশ্বাসে আর একটা প্রাণের গতিও বাঁকিয়া অন্য পথে ছুটিয়া চলে না!...চোখের জল এখানে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস নীরবে বাতাসে মিলাইয়া যায়; সত্যকার জীবনে তার কোন মূল্যও নাই···! তা যদি থাকিত তাহা হইলে এই পৃথিবীই আজ স্বর্গ হইত, বেদনার মেঘও আজ পৃথিবীর বুকে কালো দাগের মত তাকে মলিন করিয়া রাখিত না···!...

রাত্রে অমল বলিল,—আর ক'দিন আছে চপলা?

পাপিয়া কহিল,—আজ সতেরো দিন হলো।

অমল কহিল—আর তেরো দিন পরে তোমায় দেখতে পাবো।···

পাপিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

অমল কহিল,—এই তেরোটা দিন যদি এই আজ রাত্রের একটি ঘুমে কাটিয়ে দেওয়া যেতো চপলা...অমল হাত বাড়াইল। পাপিয়া বুঝিল, অমল তাহাকে পাশে চাহিতেছে!...তার মন ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু মনকে কেন আর এ আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখানো, এ মরীচিকায় প্রলুব্ধ করা বৈ তো নয়!—তবু তেরোটা দিন! দীর্ঘকাল! হায় রে! অমল চাহিতেছে এই একটা রাত্রির মাঝেই যে তেরোটা দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। আর সে...? সে চায় এই তেরোটা দিন যেন আর শেষ না হয়...!

অমল কহিল,—কাছে এসো চপল...আমার হাতে হাত দাও...

পাপিয়া তাই করিল—অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিল,ডাকিল,—চপল...

পাপিয়া কহিল,—কি বলছো?

অমল কহিল,—আমার অন্ধতা ঘুচলে আমায় তুমি ফেলে যাবে!...বল—বল—তা যদি যাও তো কাজ নেই আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া এনে—আমি যেন চির-অন্ধ হয়েই থাকি!

পাপিয়া কহিল, ছি, ও কথা কি বলতে আছে...আমি তুচ্ছ নারী...

অমল কহিল,—তুচ্ছ নারী...! তুমি দেবী...

পাপিয়া কহিল—দেবীই বটে! স্বর্গ আমায় কামনা করছে!

অমল কহিল,—আসবেই তো অন্ধের প্রতি পূর্ণমমতায়; ভগবানও তো অন্ধ নয়! পাপিয়া কথা কহিল না।

অমল কহিল,—কিন্তু একটা কথা চপল! আমার চোখ সারবে, আমি রোজ রোজ তোমায় দেখবো, এ আশায় আমার যে আনন্দ ধরচে না—কিন্তু তুমি কেন সে রকম আনন্দ প্রকাশ করছো না;—তুমি কেন দূরে সরে সরে যাচ্ছো...তবে কি আমায় তুমি ছেড়ে যাবে...আমার এ অসহায়তা ঘুচলে...

পাপিয়া কহিল,—তুমি যদি তাড়িয়ে না দাও, তো আমি কোথাও যাবো না—কোথাও না—স্বর্গ পেলেও নড়বো না। কিন্তু তুমি কি আমায় সহ্য করতে পারবে—এই ভয়েই আমি শিউরে শিউরে উঠচি.....

অমল কহিল,—ও কথা বলো না—আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে.....

পাপিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল,—আমি যে কত বড় ছলনাময়ী, কত বড় ছলনা অন্ধ অবস্থায় পেতে তোমাকে কি মোহেই ভুলিয়েছি, এ জানতে পারলে তুমি আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে;.....

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমল কহিল,—আবার!...মোহ, ছলনা—এমনি মোহে আমায় তুমি চিরদিন ভুলিয়ে রাখো—এ ছলনা আমার যে আজ কাম্য.....

হায় অন্ধ, সত্যই তুমি অন্ধ বেচারা!

১৯

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। কাল সকালে অমলের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হইবে। আনন্দের উল্লাসে, উত্তেজনায় অমলের চিত্ত মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইতেছে—আর পাপিয়া...ঝরা ফুলের মত তার মুখ শুকাইয়া ম্লান, মুখে তার কথা নাই—চোখের দৃষ্টি উদাস, অসহ্য কাতরতায় ভরা। এ কয়দিনে সে এমনি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাকে দেখিলে মনে হয় কোন্ দুশ্চর তপস্যায় তনু তার ক্ষীণ, যৌবনোজ্জ্বল জীবন্ত পাপিয়ার এক বিবর্ণ ছায়ার মত সে এই জীর্ণ গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!...আর এই একটা রাত্রি! আজ মহীয়সীর পরিপূর্ণ মহিমায় ভরিয়া ওঠা চাই...তারপর কাল সকালে জীর্ণ মলিন রিক্তের মত তাকে পথে বাহির হইতে হইবে! এই একটি রাত্রি যা রাজসিংহাসনের রাণীর মহিমায়...কাল সকালে সর্ব্বহারা নিঃস্ব ভিখারিণী...!

অমল বারবার অনুযোগ করিতেছিল, চপলা যেন তাকে ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে—এ আনন্দের মাঝখানে তাকে যেন সে ভুলিয়া যাইতেছে...! এ দুঃখ যে অমলের বড় বাজিতেছে—চোখ ফুটিলেও যে তার সব আনন্দ উবিয়া যাইতেছে!.....

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ ছিলে বলেই না তুমি আমায় সহায় চেয়েছিলে! আর এখন তো সহায়ের দরকার নেই!...তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এই অন্ধতার আবরণ ছিল বলিয়াই না তাকে অমল মালিন্য-কলঙ্কের স্পর্শলেশহীন শুধু নারী বলিয়াই ভাবিতে পারিয়াছে। কাল চোখ চাহিয়া যখন দেখিবে, এ নারীর সর্ব্ব অবয়বে পাপের গভীর কালি তাকে কি কালো

করিয়া রাখিয়াছে, মুখে চোখে কালির গভীর রেখা! মন তার নারীত্বের লাঞ্ছনায় পাথর হইয়া আছে..... তখন...?

অমল কহিল—তুমি যেই হও,...যদি তুমি আপত্তি না কর, তা হলে তোমায় আমি চির দিন এমনি পাশটিতে রেখে আমার জীবনকে সার্থক করবো।...আর কিছু না হোক, অকৃতজ্ঞতার পাপেও যে আমি লিপ্ত হতে চাই না—এত বড় সেবায় কি কৃতজ্ঞতাও কিছু নেই চপলা, যে, তুমি বার বার এই সব যা-তা ভেবে আমায় ক্ষুণ্ণ করছো, অপমানিত করছো...

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু এই ভয়েই যে আমি সর্ব্বক্ষণ শিউরে কুণ্ঠিত হয়ে আছি...

—না, না—কোন কুণ্ঠা, কোন ভয় নেই, চপলা। সমাজ তার ভ্রূকুটি নিয়ে এলেও, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে বলতে পারি, এই নারী আমার সেবায় তার প্রাণ পণ করেছিল...এ নারী যেই হোক, সমাজের চোখে সে যতই লাঞ্ছনার যোগ্য হোক্—আমার কাছে দেবী। যদি তার আপত্তি না থাকে, তো এই নারীকে আমি বিবাহ করবো—এবং আমার ক্ষুদ্র জীবনে তাকেই সঙ্গিনী করে সহধর্ম্মিণী করে আমার যা ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটুকু, তা সযত্নে পালন করবো।...সমাজ শত ধিক্কার দিলেও, এই আমার পণ...

পাপিয়া অবিচল চিত্তে অমলের কথাগুলি শুনিল।... তবু ভয় কি ঘোচে...এ যে কত বড় ছলনার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে এ সেবা করিয়াছে—সে ছলনার কি শাস্তি নাই!...

তবু রাত্রি নিবিড় হইয়া আসিল। পাপিয়াকে জোর করিয়া কে সাজাইয়া অমলের কাছে পাঠাইয়া দিল। এই একটি রাত্রির জন্য তার জীবন আলোয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক, যৌবন বসন্তের পরিপূর্ণ প্রীতে ভরিয়া উঠুক, দেহ মন এই একমাত্র পুরুষকে সেবা করিয়া, তাকে তৃপ্তি দিয়া সার্থক হউক...নৈরাশ্যের অকূল সমুদ্র—কা'ল তো সে সমুদ্রে ভাসিতেই হইবে। তবু কালিকার সে দুর্ভাবনায় আজিকার এ আগত পুলককে ঠেলিয়া নাই রাখিলাম! আপনাকে সে অসঙ্কোচে অমলের হাতে সঁপিয়া দিল—নাও বঁধু, আমায় নাও...আমার জীবনের আজিকার এ শেষ পূজা তুমি গ্রহণ কর, গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হও, প্রসন্ন হও...! কা'ল অন্ধকার আসিবে বলিয়া আজ এ আলোর দীপ্তিকে তো অন্ধ হইয়া ঠেলিয়া রাখা যায় না!

রাত্রির অন্ধকার ঠেলিয়া আলোর ছটা ফুটাইয়া পাখীর গানে দশ দিক ভরাইয়া প্রভাত আসিয়া দেখা দিল। পাপিয়া কম্পিত বক্ষে গিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিল। তার পর অমলের মুখ হাত ধোয়াইয়া তার জন্য জলখাবার আনিয়া দিল।

অমল কহিল,—আর এ কতটুকু সময়...তার পর... চপলা—আজ আমার পুনর্জ্জন্ম! সব দৈন্য ঘুচিয়ে আজ আমায় তুমি রাজাসনে বসিয়ে দেবে!...

পাপিয়া দৃঢ় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার তার শক্তিও ছিল না। সে পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল! শুধু দম খাওয়া পুতুলের মতই নিত্যকার কাজ করিতেছে! মনের ভিতর তার কোন অনুভূতি নাই—চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে মন তার সত্যই পাষাণ হইয়া গিয়াছে!...

বেলা আটটা—ঐ ডাক্তারের গাড়ী! পাপিয়ার মনে হইল, মৃত্যুর আহ্বান আপনা হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে—তবু তার কর্ত্তব্য—বড় কঠিন, তবু এ বড় কর্ত্তব্য!...নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ সে আগাইয়া দিয়াছে! অনুশোচনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। সে তো বেশ ছিল এই অন্ধকে লইয়া; এই ঘন ছায়ার অন্তরালে—সে যে সকল সুখে সুখী ছিল। নিজের প্রাণে তৃপ্তির যে সীমা ছিল না!...তবু... না—মানগোবিন্দই তাকে শিখাইয়াছে, যাকে ভালবাসো তার তৃপ্তি আগে খোঁজো, নিজের সুখ বলি দিয়াও, তাকে সুখী কর!...বেশ! সেই ভালবাসাই তার লক্ষ্য হউক! বেদনা—সে তো পাইতেই হইবে! এ যে কত পাপের শাস্তি!...প্রায়শ্চিত্ত কি নাই তার!...

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—এবার চোখ খুলবো—

পাপিয়া অবিচল মূর্ত্তিতে ডাক্তারের কাজে সাহায্য করিল—তার পর ডাক্তার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিলেন। পাপিয়ার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, পায়ের নীচে পৃথিবী ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিল। টলিতে টলিতে সে সে-ঘর হইতে আসিয়া পাশের ঘরে মূর্চ্ছিতের মত মেঝেয় লুঠাইয়া পড়িল। বুকের মধ্যটা এমনি দুলিতেছিল, এমনি তার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বক্-ধ্বক্...

যে পাপিয়া আর সব ভুলিয়া গেল। সেই শব্দটাই তার কাণের কাছে ভীষণ হুঙ্কারে গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেন এ শব্দ ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নাই, রূপ রস স্পর্শ, কি তাদের কিছু মাত্র না.....

ঐ পাশের ঘরে কার হাসির উচ্ছ্বাস—না? না বাতাসের গর্জ্জন!...ঐ—না বাহিরে পাখী ডাকিতেছে! ঐ যে। ঐ যে...না গঙ্গার বুকে নৌকার দাঁড় পড়িতেছে! ওঃ ভগবান, ভগবান, এ কি রকম মুহূর্ত্ত যার বেদনায় জর্জ্জরিত করিবার জন্য তাকে আজও বাঁধিয়ারাখিয়াছে!—

সত্যই সে চরম ক্ষণ আসিল।...অমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আলো, আলো—চপলা কোথায় তুমি, আমার কাছে এসো, তোমায় আমি দেখি।

ডাক্তার বাইরে আসিলেন। তাঁর পয়সা কড়ি আগের দিন তাঁকে পাঠানো হইয়াছিল—এত দূরে আসিয়াছেন—তিনি আর দাঁড়াইলেন না, কি কয়টা ফর্দ্দ করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঐ তাঁর মোটরের হর্ণ...ঐ গাড়ী চলিয়া গেল! পাপিয়ার মনে হইল, গাড়ীটা যেন বুকের উপর দিয়ে তার বুকের হাড় পাঁজরা কখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গেল!—তার যেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে...মৃত্যু, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই যে হাত-পা অবশ! নড়ে না—কে যেন পেরেক আঁটিয়া তাকে এই মেঝের সঙ্গে আঁটিয়া দিয়া গিয়াছে!...

—চপলা—চপলা—অমলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর!—হারে দুর্ভাগিনী!

অমল বাহিরে আসিল—কোথায় তুমি, কোথায় গেলে?...

অমল আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। মূর্চ্ছিতের মত লুণ্ঠিত পাপিয়াকে ধরিয়া তুলিয়া ডাকিল, চপলা—

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল। অমল শিহরিয়া উঠিল,—তুই...

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাপিয়া আকুল চোখে অমলের পানে চাহিল!

অমল চলিয়া গেল, নিজের ঘরগুলা খুঁজিল। কোথায় চপলা...?

ক্রোধে ক্ষেপিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—কোথায় সে—চপলা! কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছিস্, বল...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না। নির্জ্জীবের মত উদাস-নেত্রে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—তুই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্—শয়তানী...

পাপিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া অমলের পায়ে হাত দিল, কহিল!—আমায় মাপ কর...

অমল গর্জ্জন করিল—তাকে কোথায় তাড়ালে, বল, বল এখনি...

পাপিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—তাকে তো তাড়াইনি..

অমল কহিল—তবে সে গেল কোথায়?

—কে?

—চপলা।

পাপিয়া সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। কহিল,—চপলা এখানে ছিল না—কোন দিন তো আসেও নি এখানে!

আসেনি! অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।...তাও কি সম্ভব!...তার পরে কহিল,—মিথ্যা কথা। এই সেবা, এ যত্ন,...আমার অন্ধতায় তার ঐ দরদ—তারপর আমায় সারিয়ে তোলার জন্য এই চেষ্টা, এই অজস্র পয়সা ব্যয়...

পাপিয়ার মন অভিমানে ফুলিয়া উঠিল; সে আর মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—সে আসেনি গো, কোনদিনই আসেনি সে.....

—তবে?

—আমি পোড়ারমুখীই...তার ছদ্মনাম নিয়ে অন্ধ তুমি, তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি.....বরাবর, এতদিন...সে তোমার জন্য থিয়েটারের টিকিটও পাঠায়নি...তারপর তোমায় দেখবে বলে সে রাত্রে মোটর গাড়ীতে অনেক সেধেছি—সে ফিরেও চায়নি! আমিই তোমার তখনকার ঐ ব্যাকুল ব্যথিত দৃষ্টি দেখে তার মর্ম্মও বুঝেছিলুম।—কিন্তু.....পাপিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

অমল কহিল,—ছলনা, ছদ্মনাম.....তাহলে চপলা আমার সেবা করেনি,...সে তুমি...?

—সে আমি, সে আমি গো!...সেদিন পিছনে হৈ হৈ

শব্দ উঠ্‌লো—আমি গাড়ী দাঁড় করিয়ে চাকরকে পাঠালুম। সে যে খবর দিলে...আমি স্থির থাকতে পারলুম না...তার পরে যা হলো, তুমি সব জানো...অন্ধ তুমি, কে তোমায় দেখবে, তাই আমি এসেছিলুম...কিন্তু আমার পরিচয় পেলে যদি আমার সেবা না নাও, তাই, শুধু তাই গো, তার নামে পরিচয় দিয়েছিলুম.....

অমল কহিল,—কিন্তু এর কারণ জানতে পারি কি?

পাপিয়া কহিল,—অন্ধ, অসহায় তুমি,—কে দেখবে, তাই! তাই...

অমল কহিল,—তাই...?

পাপিয়া কহিল,—হাঁ,—তার বেশী—সে যে দুরাশা—তার লোভও হয়েছিল, কিন্তু সে অনেক পরে। প্রথমে এ দুরাশার কথা মনে ছিল না—তোমার আদরে ও প্রশ্রয়ে তা দেখা দেছে—আজ তুমি সেরে উঠেছ—আজ আর আমায় সাহায্য করতে হবে না...বেশ, চলে যাচ্ছি—হাসপাতালেই থাকতে যদি, কি বাড়ীতেই থাকতে যদি তো একটা দাসী কি চাকরের সাহায্য তো দরকার হতো ...ভেবো আমি সেই দাসী কি চাকরেরই কাজ করেছি। তুমি যে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছ, তাই আমার চূড়ান্ত পুরস্কার!—এর বেশী তোমার কাছে প্রত্যাশাও করিনি কখনো, তার কামনার দুরাশাও আমার নেই। ছলনা করে যে অপরাধ করেছি, তার জন্য মাপ করো—ছলনাময়ী গণিকা আমি—ছলনাই ব্যবসা আমাদের.....

অমল স্থির হইয়া সব কথা শুনিল। তারপর ধীরে ধীরে গমনোদ্যত হইল।—পাপিয়া কহিল,—কোথা যাচ্ছ?

অমল কহিল,—চপলার সন্ধানে। তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না...

অমল চলিয়া গেল, পাপিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল।

(ক্রমশঃ)

হিমালয়ের পত্র

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ, এম- আর-এ-এস (লণ্ডন)

(দ্বিতীয় পত্র)

৺কেদারনাথ ধাম
২৬ শে মে ১৯২৪

দিদি,

দেবপ্রয়াগ হ'তে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম। আজ আমি ৺কেদারনাথে—বারো হাজার ফিট উঁচু, তুষার-মৌলি হিমালয়ের উপত্যকায়। দার্জ্জিলিং প্রায় ছয় হাজার ফিট উঁচু। সেই অনুপাতে আমি কত উঁচুতে আছি বুঝুন। হরিদ্বার হ'তে আশী ক্রোশ পদব্রজে এসেছি। এখান থেকে সত্তর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে বদরিকায় যাবো।

লক্ষ্মণঝোলা হ'তে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গাকে বামে রেখে এসেছিলাম, সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত অলকানন্দাকে বামে রেখে এসেছি। রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম হ'য়েছে। বৃহৎ লৌহসেতু (suspension bridge) হ'তে সফেণ বিক্ষুব্ধ নদী সঙ্গমের ও স্বল্প-বৃক্ষ পর্ব্বতমালার দৃশ্য দেখলাম। কেদার—ও বদরিকার রাস্তা দুটীরও সঙ্গম হ'য়েছে এখানে। এক রাস্তায় অলকানন্দাকে বরাবর বামে রেখে উত্তর-পূর্ব্বে অনেকদূর গেলে বদরীনারায়ণ মেলে। অন্য রাস্তাটী লৌহসেতু পেরিয়ে মন্দাকিনীর তীর দিয়ে, ক্ষুদ্র সহরটীর মধ্য দিয়ে, ঠিক উত্তর মুখে কেদারে গেছে। আমরা সেই রাস্তায় কেদারে এসেছি।

মসৃণ রাস্তার দু'ধারে একশ' দেড়শ'খানি একতালা দোতালা বাড়ী; দোকান, ডাক-বাংলা, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস এবং ক্ষুদ্র কয়টী মন্দির ও আম গাছ ল'য়ে রুদ্রপ্রয়াগ সহর। প্রাচীন মন্দিরটী কয়েক বছর আগে বন্যায় ভেঁসে গেছে। সহর থেকে অনেকগুলি

পাথরের ধাপ নেমে মন্দাকিনীর শীতল জল পান করলাম।

মহাপ্রস্থান কালে ভীম সেন যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন, সেখানে মন্দাকিনীর পুল পেরোলাম। মন্দাকিনীকে বরাবর ডান দিকে রেখে আমরা এখানে এসেছি।

আপনাকে লিখেছি যে পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেই উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে আমরা এ-পাহাড়, ও-পাহাড়, এ-নদী, ও-নদী এবং ছোট-বড় অনেক জলপ্রপাত অতিক্রম করে এসেছি। কি মিষ্ট, শীতল ও হজমী জল এই দেশে! দশ ক্রোশ হেঁটে এসে দু আঁজলা জল খেলে সমস্ত শ্রমের অপনোদন হয়, ক্ষুধা পায় এবং গভীর নিদ্রায় দেখতে দেখতে রাত্রি কেটে যায়। নির্ঝরিণীর কলগানে, পাখীর কূজনে যাত্রী জেগে ওঠে। পুস্তকে লেখা আছে এবং অনেকের মুখে শুনেছি, যে, এপথে ঝরণার জল খেলে পেটের অসুখ হয়। কেউ কেউ গঙ্গাজলও ফুটিয়ে নিয়ে পান করতে বলেন। ঔষধ-পত্র, আহার্য্য, শয্যা এবং গাত্রবস্ত্রের যে ফর্দ্দগুলি তাঁরা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা' পড়লে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সাধারণ গৃহস্থেরা অত ব্যয় করতে পারবেন না ভেবে কেদার-যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আমার কিন্তু ওষুধ সুরা, চা বিস্কুট, ওভার-কোট নেই। আঁজলা আঁজলা ঝরণার জল, বনের কুল, ছোলা গুড়, মোটা রুটী ও একঘেয়ে কুমড়ার তরকারী খেয়েছি, বিশ মাইল চড়াই উৎরাই অতিক্রম করেছি, অথচ আমার এক দিনের জন্যও সর্দ্দি হয় নি, পা ফোলে নি বা মাথা ধরে নি। ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের অরণ্য মাঝারে একছড়া কলা ও একটি আধপাকা পেঁপে খেয়ে এক দিন ছিলাম। মাঘের রাত্রি জৈসলমের মরুভূমিতে আকাশ-তলে শুয়ে কাটিয়েছি,—পথ হারিয়েছিলাম, চটি পাইনি। টাকা ফুরিয়ে গি'ছলো, এবং কলকাতা থেকে টাকা যেতে দেরী হচ্ছিলো। অগত্যা মৈসুরে আমি, কর্জ্জন পার্কের সন্নিকটবর্ত্তী "পূর্ণেয়ার চৌলট্রী" নামে অতিথি ভিখিরীদের জন্য যে অন্নসত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় ভিক্ষান্নে তিন দিন প্রাণধারণ করে অন্ধের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছিলাম—কৈ সরঞ্জামের অভাবে এক দিনের জন্যও তো আমার ভ্রমণ বন্ধ করতে হয়নি! সন্ন্যাসী খোলা গায়ে কেদারে এসেছেন। আলস্য ও বিলাসিতার প্রভাবে আমরা দুর্ব্বল হ'তে দুর্ব্বলতর হ'য়ে পড়ছি—বাড়ী থেকে বেরুলেই ঠাণ্ডা লাগবার ভয় করি। Murray's Guide Bookএর সরঞ্জামের তালিকা অথবা Shackletonএর দক্ষিণ মেরুর অভিযানের রসদপত্র স্বাধীন জাতির পক্ষে প্রযোজ্য,—পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে নহে।

মহাপ্রস্থানকালে ভীম যেখানে দেহত্যাগ করেন, মন্দাকিনী-তীরের সেই ভিরি চটীতে ভীমের মন্দির আছে। সেথা আমরা এক রাত কাটাই। অর্জ্জুন বিল্ব কেদারে কিরাত-

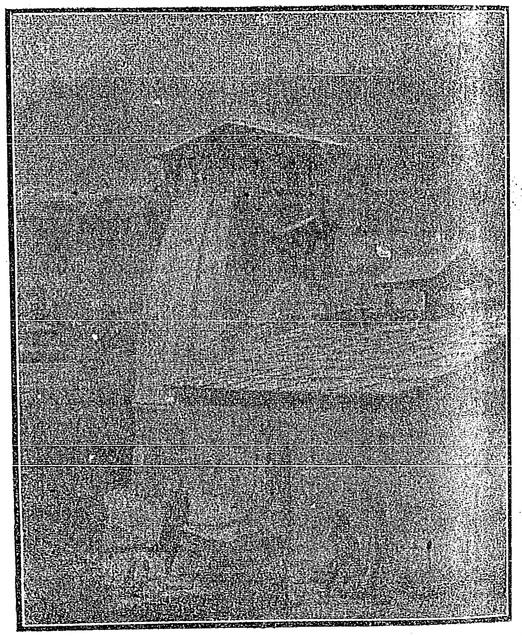

বিশ্বনাথের মন্দির, ত্রিযুগীনারায়ণ

বেশী মহাদেবের প্রসাদে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন, সেখানে গিছলাম। ত্রিযুগী নারায়ণ-তীর্থে গিছলাম। খাড়া চড়াই, দুর্গম রাস্তা। বনের মধ্যে। সেখানে হরগৌরীর বিবাহ হয়। বিশ্বনাথ মন্দিরে বিবাহের যজ্ঞকুণ্ড আছে। কুণ্ডে বিবাহের কাল হ'তে অদ্যাবধি, ত্রিযুগ ধরে, হোমানল জ্বলছে—সন্ন্যাসীরা অহোরাত্র হোম করছেন—সে অনলের নির্ব্বাণ নেই! কাঠের পর কাঠ দেওয়া হচ্ছে। আমিও দিলাম। দেবীর বিবাহের বেদী সমন্বিত বিশ্বনাথ মন্দিরের আলোক-চিত্র নিয়েছি। ত্রিযুগী

নারায়ণ জনপদটী হিমালয়ের একটি উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত। অনেকটা সমতল ক্ষেত্র, শস্য-শ্যামল। যব, তামাক, গম হয়েছে। গ্রামের পিছনে—আকাশ-চুম্বী তুষার-কিরীটিনী পাহাড়। কে যেন পাহাড়ের উপরে রাশি রাশি চূণ ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। তদুপরি যখন মধ্যাহ্নের রবি-কিরণ প্রতিফলিত হয়—এমন চক্ চক্ করে

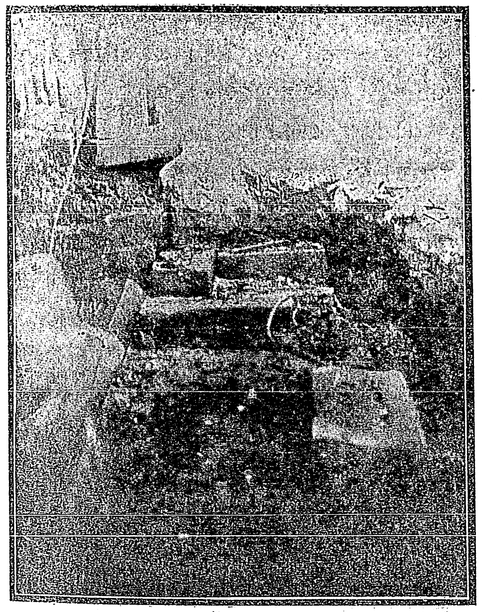

চড়াই পথ

সে শৃঙ্গ—কি বলবো! চোখ ঝল্‌সে যায়। স্থানটী মনোরম, নির্জ্জন। বিহঙ্গের কল-গানে উপবন মুখরিত। মেয়েদের চাঁদমুখ। গৌরী হিমালয়ের কন্যা উমা বলেই বোধ হয়। কিন্তু ফটো নিতে দিল না।

হিমালয়ে আমি বাংলার মত সমতল, শস্যশ্যামল, এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে কয়টী রমণীয় উপত্যকা দেখেছি, "অগস্ত্যমুনি" তন্মধ্যে একটি। মখমলের মত উজ্জ্বল শ্যামল। ধান, গম প্রভৃতির ক্ষেত। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে যাত্রী যাবার রাস্তা। মেটে নরম রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে বুক ভোর উঁচু প্রাচীর—রাশি রাশি ছোট বড় নুড়ি জড় করা প্রাচীর। কথিত আছে, এখানে একটি হ্রদ ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে তাই অনুমান হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন,—সমগ্র হিমালয়ই একদা সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কেবল দক্ষিণ-ভারত তখন ছিল সেই জলধি-বক্ষে দ্বীপের মত ভাসমান। পরে আরাবল্লী বা অর্ব্বুদ পর্ব্বত (আবু) সমুদ্র ভেদ করে ওঠে। তৎপরে হিমালয়। কাশ্মীর অঞ্চলে সামুদ্রিক জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। হিমালয় যে সমুদ্র-গর্ভে ছিল তার অন্যান্য প্রমাণ আছে। সুতরাং 'অগস্ত্যমুনির' হ্রদ নিম্নে থাকা বিচিত্র নয়।

স্থান-মাহাত্ম্য, কৌলিন্য, প্রাচীনতা এবং ভয়াবহ ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে 'উখী মঠ' ও 'গুপ্ত কাশীই' কেদারের নীচে।

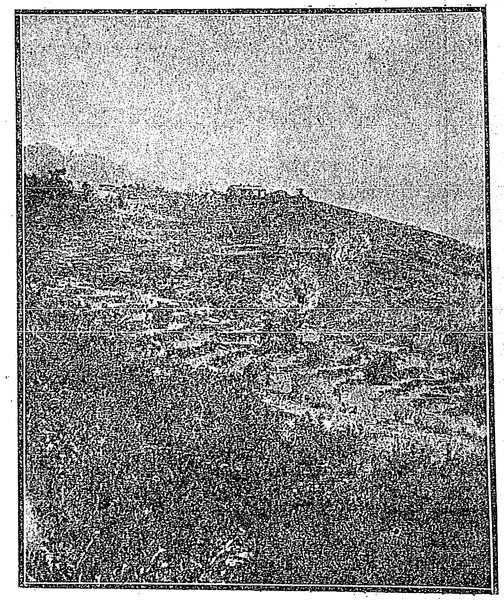

অনন্তের আভাস

দুই সারি অতি দীর্ঘ, অতি উচ্চ তরঙ্গায়িত হিমশৃঙ্গ, প্রায় সমান্তরাল, উভয়ের পাদ দেশের ব্যবধান শত হস্তের অধিক নয়, স্কন্ধ ভাগের ব্যবধান এক ক্রোশ হবে। উভয়ের মধ্যে বিশটা মনুমেণ্টের মত গভীর খদ। পূর্ব্ব-দিকের সেই তরঙ্গায়িত পর্ব্বত বক্ষে উখীমঠ অবস্থিত। যাঁরা লাসার ছবি দেখেছেন তাঁরা উখী মঠের চিত্র অনুধাবন

ক'রতে পারবেন। শীতের ছ'মাস কেদারনাথের মন্দির বরফে ঢাকা থাকে। সে সময়ে ৺কেদারনাথ উখী মঠে এসে অধিষ্ঠান করেন। উখী মঠ হ'তে খদের ওপারে অর্থাৎ পশ্চিমে মেঘের আকৃতি পর্ব্বতের বক্ষদেশে গুপ্ত কাশীর বাড়ীগুলি অতি ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়। উভয় স্থান ঠিক সামনা-সামনি। মনে হয় কাছে। কিন্তু তিন হাজার ফিট উৎরাই ও খাড়া চড়াই পথে খদ অতিক্রম করে ওই স্থানে যেতে অনেক পরিশ্রম হয়। পাহাড়ীরা বোঝা লয়ে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে কিন্তু!

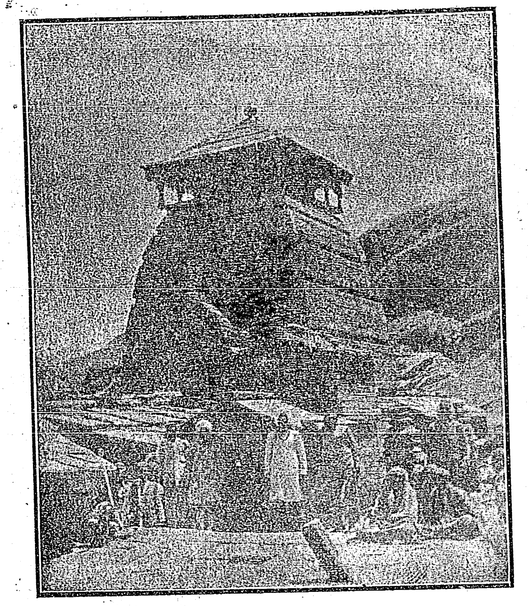

তুঙ্গনাথ

গুপ্ত কাশীতে এবং তাহার উপকণ্ঠবর্ত্তী 'নালা'তে বৌদ্ধ যুগের এবং ব্রাহ্মণ্যযুগের—শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের—নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপ, বোধিসত্ত্ব, এবং হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি, শিলালিপি, ও বিবিধ কারু-কার্য্য ও অলঙ্কার খোদিত তক্ষণ মূর্ত্তি আছে। আলোক-চিত্র নিয়েছিলাম। সেগুলি পরিস্ফুট হয়নি। কয়টী হিন্দু মন্দির আছে, তাদের গঠন দেখলে স্তূপ বলে ভ্রম হয়। উদয়গিরির যেরূপ 'ইন্দ্রকিল্লা' আছে, নালার মন্দিরগুলির পশ্চাতে সেরূপ একটি চত্বর বিদ্যমান। তার পাশে 'গঙ্গা পথ' নামে নিম্নমুখী রাস্তা। এক প্রান্তে উঁচু কাঠের দোলা আছে, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন। একটি পাথরের বেদী বা গদি আছে। এই জনপদ বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল।

দার্জ্জিলিং, শিলং, মেমিয়োতে যেরূপ নর্দ্দামা ও পানীয় জলের পাইপের সুবন্দোবস্ত দেখেছি এবং সে সব দেশের কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহের জন্য যেরূপ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হয়েছে—বিশেষতঃ মৈসুর রাজ্যে—অতি প্রাচীনকালে গুপ্ত কাশীতেও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত গুপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের চিত্রের নিম্নে দেখুন—কুণ্ডতে বা চৌবাচ্ছায় দুটী পিতলের গোমুখ দিয়ে ঝরণার জল পড়ছে। সেই জলকুণ্ডের এবং মন্দির-প্রাঙ্গণের তলদেশ দিয়ে এবং মন্দিরের সিংহ-দ্বারের সম্মুখস্থ যাত্রীপথের নিম্ন ভাগ দিয়ে নর্দ্দামার মত, অতঃপর জলপ্রপাতের মত, ধাপে ধাপে পাষাণ-গাত্র প্লাবিত ক'রে সেই ধারা অবশেষে সেই গভীর খদে পড়ছে।

ছবির পশ্চাতে, অর্থাৎ পশ্চিমে, পাহাড় দেখছেন। পূবে, অর্থাৎ মন্দিরের সম্মুখে, যাত্রী যাবার রাস্তা, তার পরে খদ—ওপারে উখীমঠের বাড়ীগুলি তাসের খেলাঘরের মত দৃশ্যমান। মন্দিরের ডাইনে ও বামে, অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে লম্বা গুপ্তকাশী সহর। অল্পবিস্তর নক্সা করা কাঠের থামওলা ঘেঁসাঘেঁসি পাথরের বাড়ী। সবই প্রায় বসত বাড়ী। তাদেরি সংলগ্ন দোকানঘর, গোয়ালঘর, কামার-শালা, মদের দোকান, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি। দোতালা বাড়ীগুলির উপর তলে বাসগৃহ, নীচে কাপড়ের, বাসনের, মুদীর ও মনোহারী দোকান প্রভৃতি। প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা সামাজিক ও ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়া উপলক্ষে মন্দিরে অথবা সংঘারামে মিলিত হতেন। অপরাধীর বিচার, সামাজিক সমস্যার সমাধান, উৎসব পার্ব্বণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভোজনের ব্যবস্থা ও সমাপন, সাপুড়ের সাপ খেলানো, যাত্রা, কথকতা, ছেলের কর্ণবেধ, শিক্ষা প্রচার সমস্তই নাকি সেখানে সম্পন্ন হ'ত। রেঙ্গুনের শোয়েডেগুন প্যাগোডায় এবং শাণ-কাচিন-চীন দেশের ফুঙ্গী চঙএ আমি একালেও তাহার কিছু কিছু লক্ষ্য করেছি। মারাঠীরা ভবানী মন্দিরে 'কথা' উপলক্ষ করে রাজনৈতিক গুপ্ত মন্ত্রণা করতেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি,

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির, জৈসলমেরের জৈনমন্দির, কামাখ্যার মন্দির ঐরূপ উৎসব পার্ব্বণে মুখরিত। গুপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও তাই। নানা দিক্ দেশ হ'তে সমাগত যাত্রীরা, জটা-কৌপীনধারী সন্ন্যাসীরা, নানা কাজে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও প্রকোষ্ঠে নিযুক্ত। কেহ কুণ্ডে স্নান, বিশ্বনাথের অর্চ্চনা করছেন। দ্বারী নাটমন্দিরের ছাদে ঝোলানো ঘণ্টাটি ঢং ঢং করে বাজাচ্ছে—সামগানে মন্দির ও হিমালয় মুখরিত। শত সহস্র বছর ধরে গোমুখ দিয়ে ঝর

গুপ্তকাশীর পথে শ্রীশরৎচন্দ্র চন্দ্র

ঝর করে জল পড়ছে। চসমাধারী কেদারখণ্ড পড়ছেন—নানা শ্রেণীর যাত্রী তাঁর সম্মুখে বসে। জননী ছেলেকে কোলে শুইয়ে তার মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। ধর্ম্ম কথাও শুনছেন। কেহ শাস্ত্রের তর্ক করছেন। কেহ ডালরুটীর ব্যবস্থা করছেন। কেদার থেকে যাত্রী নেমে এসেছেন। তাঁরা সেই ভয়াবহ স্থানের দুর্গমতা ও প্রচণ্ড শীতের কথা—সকালে বরফ কেটে কিরূপে চটীগুলির দরজা খোলা হয় তার কথার উল্লেখ করছেন। উনি দোকান থেকে সওদা করে এলেন। তিনটা বাজলো। "কেদার-নাথ স্বামী কি জয়" বলে বৃদ্ধা লাঠি ধরে উঠলেন। কেদার যাবেন। তাঁর কন্যা পুটলি মাথায় তুলে তাঁর সঙ্গ নিলেন। একে একে অনেকেই উঠলেন। সকলেরই চোখে উৎসাহ। মন্দিরের প্রাঙ্গণটী প্রায় ষাট হাত লম্বা এবং ত্রিশ হাত চওড়া। তার পশ্চাতে প্রাচীর ও পাহাড়—আর তিন ধারে যাত্রী থাকার ঘর, দালান, এবং ঠিক মধ্যস্থলে পেরেক-মারা বৃহৎ সিংহদ্বার আছে। আমরা একটি দালানে ছিলাম। সঙ্গে ক'জনা বাঙ্গালী বৈষ্ণবী ছিলেন—বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। আমরা তিন দিন গুপ্ত কাশীতে ছিলাম। সেই অবকাশে সাবান দিয়ে কাপড় কেচে নিই। ক্যামেরার পায়া সেরে নিই এবং কম্বল কিনি। সহযাত্রী ফ্ল্যানেলের জামা তৈরী করিয়ে নিলেন। যদি কিনতে হয়, আমার মতে কলকাতা থেকে

নীহারস্ফোট, কেদারনাথ

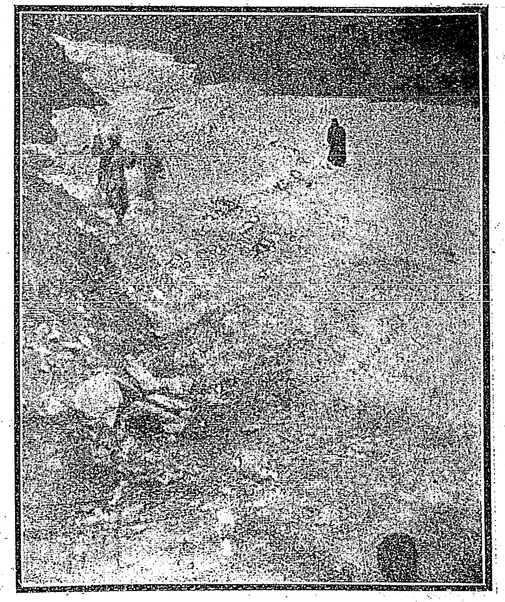

কম্বল প্রভৃতি ভারী বোঝা সঙ্গে নিয়ে আসবার দরকার নেই। গুপ্ত কাশীতে সবই পাওয়া যায়। এ পথে এক এক সের জিনিস নিয়ে আসতে প্রায় ২৲ হিসাবে ভাড়া দিতে হয়েছে, ঝঞ্ঝাটও অনেক। পূর্ব্বে আমরা বেশী শীত পাইনি। গুপ্ত কাশী থেকে শীত আরম্ভ হ'ল। ২॥০

টাকা সেরের ঘী এবং কিছু আটা ও চিনি কিনে নিলাম। কেদারে দাম বেশী হবে। কলকাতা হ'তে যে আহার্য্য দ্রব্য আনা গিছলো তা' ফুরিয়ে আসার দরুণ কাণ্ডীওলার বোঝা ক্রমেই কমে আসছে। সুতরাং ঘী প্রভৃতি নিতে কাণ্ডীওলা আপত্তি করবেনা। কাণ্ডী ঝাঁপানওলারা মোটা রুটী ও নূন খেয়ে জীবন ধারণ করে। আমাদের কাছ থেকে হলুদ, লঙ্কা, আচার, ছুঁচ, সূতা প্রভৃতি চায়। পেলে বড় খুসী হয়। তারা কষ্টসহিষ্ণু ও প্রফুল্লচিত্ত।

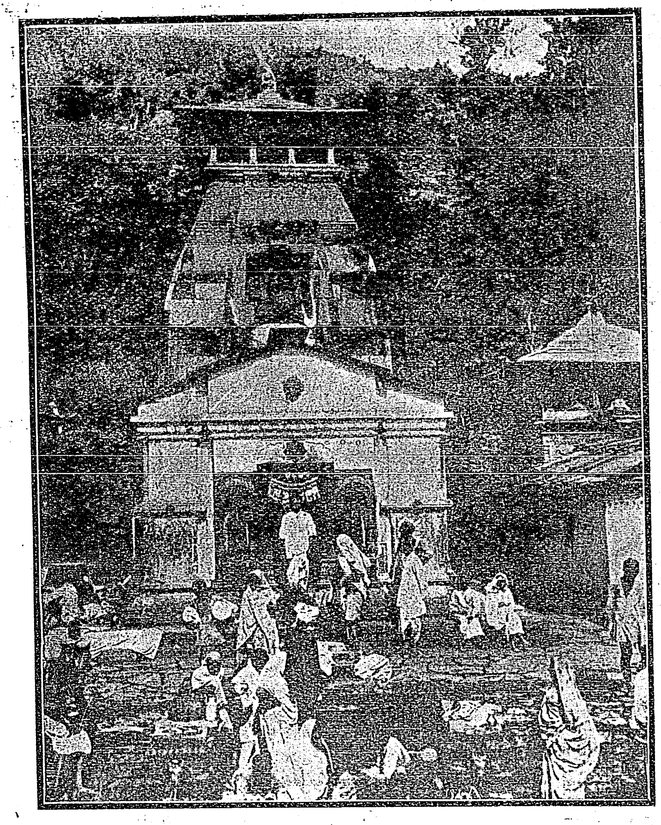

গুপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির

বিশ্বনাথের পাশে অর্দ্ধনারীর মন্দির আছে। মন্দির-গুলি সহস্রবর্ষাধিক প্রাচীন হ'বে। গর্ভ-মন্দিরটী কিরীট-কলস-শোভিত। তৎসমক্ষে নাট-মন্দির। গঠন ও স্থাপত্য খাঁটি হিন্দু ভাবের, তবে বরফের দেশ বলে ছাদগুলি ভিন্ন ধরণের, যা কেবলমাত্র হিমাল প্রদেশেই দেখা যায়।

সহরের এক প্রান্তে একেবারে পাতাল পর্শী খদের ধারেই একটি বৃহৎ বাংলা বাটী আছে। যাদের মধ্যে বিশেষ ধনী ও রাজারা সে বাটীতে থাকে। সেথান থেকে হিমালয়ের যে বিরাট শোভা যায়, তা ভোলবার নয়। আমার শ্রদ্ধেয়, শিক্ষি বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্দ্র ওরফে "বেচাচন্দ্র" মহাশয় দা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে সে বা ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য করেছেন। এই প্রবন্ধের সমস্ত আলে চিত্রগুলি তাঁরই তোলা। 'নালা' তে একটি রাস্তা খদের মধ্যে নেমে ও য়ায় চড়াই পথে উঠে উখীমঠের ভিতর বদরীনাথে গেছে।

নানা স্থান হতে বর পাহাড়ের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। খুব চুতে উঠেছিলাম—বন্ধুর, পিচ্ছিল ও অতীব সঙ্কীর্ণ পথে। স্থল বিশেষে পথ দেড় হাতের অধিক চওড়া নয়। মনে করুন, দেড় হাত চওড়া পথ, মসৃণ রের, প্রতি পদক্ষেপে হড়কাবার ভয়। ডাইনে গভীর খদ। সে খদ অন্ততঃ বি মনুমেণ্টের মত গভীর। বামে আমাদে ঠিক পাশেই যে শৃঙ্গটী একেবারে খাড়া সোজা ভাবে দণ্ডায়মান, তার শিখর দেখা যায় না। বহু নিম্নে মন্দাকিনী। খদের মধ্যে বাধু-প্রবাহ ছুটেছে—যেন দূর থেকে পাঞ্জাব মেলের শব্দ আসছে। ওপাশের পাহাড়ে নানা আকারের জলপ্রপাত। এদিকে আমি কয়টী জলপ্রপাতের ওপরকার সেতু দিয়ে এসেছি। স্থান বিশেষে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী আমাদের যাবার রাস্তা দিয়েই চলেছেন। এ পাথর থেকে ও পাথরে, ও পাথর থেকে সে পাথরে এমনি কোরে পার হ'লাম। গুহার মধ্য দিয়ে পথ—বৃহৎ, গভীর গুহা। অতিক্রম কালে—মাথার উপরিভাগের

গুহার চুয়ে বারিধারার মত অতি শীতল জল প'ড়ল।

ওক্, আখরোট, খোবানী, তেজপাতা ও লাঠির বাঁশের অরণ্য এসেছি। সে অরণ্য মাঝারে গোলাপ, চামেলী,

তুষারের দৃশ্য

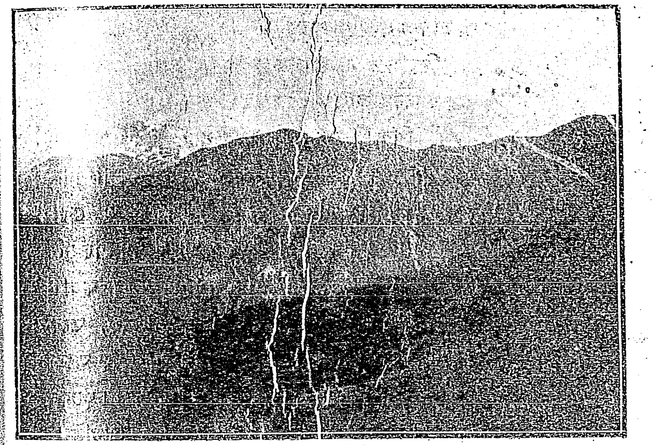

কাঠমল্লিকা ও অজানা সুগন্ধি ফুলের কুঞ্জ। রাশি রাশি ফুল। প্রাণ মাতোয়ারা করে দেয়। আমার অজানা, অদেখা কত রকম গাছ আছে। বিশল্যকরণী ও ওষধি-লতা। গোলঞ্চ দেখলাম। অম্ল-মধুর গৌরী ফলের ও বুনো কুলের গাছগুলি ফলের ভারে অবনত। ফল খেলে তৃষ্ণা দূর হয়। আখরোটের কাঁচা ফল পাড়লাম। নখ দিয়ে খুঁটে শুঁকে দেখলাম, কর্পূর ও জায়ফল একত্রে মেশালে যেরূপ গন্ধ হয় সেরূপ গন্ধ।

সেই বিরাট বনস্পতির রঙীন পাতার ফাঁকের মধ্য দিয়ে, তার অতি ঊর্দ্ধে ঝুলন্ত বেতসালতার বৃহৎ পত্রপুষ্পের এবং দোদুল্যমান অর্কিডের মধ্য দিয়ে ঈষৎ পীতাভ আলোকমালা চুপি সাড়ে এসে এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। পলাশের মত ঘোর লাল ফুলের গাছ—করবী ফুলের পাতার মত তার সরু সরু লম্বা লম্বা পাতাগুলো শাখায় এমনি লেপ্‌টে থাকে যে, দেখলে মনে হয় যে, লক্ষ ফড়িং ডানা গুটিয়ে ঘুমুচ্ছে। এই ফুল সাহেবদের বড় প্রিয়—নাম Rhododendron। এই ফুল কাশ্মীর উপত্যকায় অত্যধিক পরিমাণে জন্মায়। ঝাউ গাছ ব্যতীত এমন একটিও গাছ দেখলাম না, যা ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে!—প্রত্যেকেই সেই খদের বা আলোকের দিকে হেলে আছে। কেউ কেউ বেজায় হেলে আছে—হিমালয় যেন হাত বাড়িয়ে আছেন। কেউ বা বৃহৎ প্রস্তর শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। একটি গাছের কাঁধে অন্য গাছ এবং শাখাগুলির গায়ে শেওলা ও শূঁয়ো পোকার মত লতাগুল্ম। উই-ঢিবি দেখলাম। ক্ষীণকায়া প্রস্রবণ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো গাছের শ্রেণী—শাখাগুলির মাঝে মাকড়সার জাল। স্যাঁৎসেঁতে, আধো-আঁধার স্থান, সোঁদা গন্ধ।

নানাবর্ণের ফুলফল, লতাপাতাওলা এক : আখরোট জঙ্গলে,—দু'হাত চওড়া বন-বীথিকার ধারে, শৈবাল-মাখা পাথরের উপরে, পা ছড়িয়ে বসে আমি বিশ্রাম করলাম এবং গাছে হেলান দিয়ে আলো ও ছায়ার, ফুলের ও পাতার

বরফের নদী—'মামা' কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

লুকোচুরি খেলা দেখলাম। আর নির্ঝরিণীর কলতান ও পাখীর আবাহন গান শুনলাম। সকাল—বেলা আটটা বেজেছে। "বৌ কথা কও", বুলবুল, ডাহুকী, কোকিল, পাপিয়ার ঐক্যগান। সে গানের, সে শীসের বিরাম নাই। বেলা বাড়ছে—বসন্তের আলো, বসন্তের অনিল।

তন্ময় হ'য়ে বসেই আছি—নির্জ্জন সেই বনবীথিকায়, সঞ্চারিণী দীপশিখার মত, দুইজন পার্ব্বত্য রমণী, তাঁ'দের রূপের প্রভায় বনপ্রান্ত আলোকিত করে ওটি ওটি আমার সকাশে এলেন। * * * মার নাম রত্নী, মেয়ের নাম হীয়ুঁলী। মা'র নাকে দু'টী মুক্তার নথ—মেয়ের মাথায়

বঙ্গ মহিলা কাণ্ডী মধ্যে

শীষফুল নামে মন্দিরের চূড়ার মত অলঙ্কার দেখলাম। কিচমিচ ও মিছরি পেয়ে তারা খুসী হ'ল। ছুঁচ সুতা চেয়েছিলো।

একদল হনুমান দেখলাম। ছোটো কালো মুখ, সাদা দাড়ী, লোমে শরীর আবৃত। গরীলার মত চাউনি। ঈগল দেখলাম, বৃহৎ চিলের মত। বাংলায় চিল-শকুনি আমাদের মাথার উপরেই আকাশে ওড়ে—এদেশে দেখা যায় চিল আমাদের নীচে উড়ছে—যেহেতু আমরা খুব উঁচু দিয়ে যাচ্ছি। এদেশে চিলের গলা সাদা হয়—গয়ার চিলের মত। দাঁড়কাক দেখেছি। সেদিন পাহাড়ে ময়না ও প্রসিদ্ধ সুন্দর নন্দন পাখী দেখলাম। এখানে এক রকম পাখী আছে তারা বলে "যা—আত্রী (যাত্রী) ধীরি ধীরি।" তাদের দে'খতে পাওয়া শক্ত। ছোট্টো, কালো পাখী, পাতার আড়ালে থাকে।

হিমালয়ে নানা প্রকার পাথর আছে। কলকাতার যাদুঘরে তাদের কয়েক প্রকারের নমুনা দেখা যায়—সবগুলির নয়। শিবালিক শ্রেণীর প্রসিদ্ধ পাথর দেখলাম—অতি প্রাচীনকালে তার উদ্ভব হয়েছিল। চুনাপাথর, বেলে পাথর, লোহার পাথর, গ্রাণাইট, শ্লেট ও কোয়ার্জাইট দেখলাম। অধিকাংশ চটি ও অট্টালিকার ছাদগুলি শ্লেটে ঢাকা। তামা, কয়লা ও রূপার অস্তিত্বের কথা সরকারি একজন সাহেব ইঞ্জিনীয়রের মুখে শুনেছি, তবে চোখে দেখিনি। অভ্রের পাহাড় দেখলাম। বড় বড় অভ্রের চাঁই। গুঁড়া অভ্রে রাস্তা ঢাকা, তদুপরি রোদ পড়ে চক্‌চক্ করছে। সীসার পাথরের পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছি। সাদা, ঈষৎ নীল ও হলুদ বর্ণের মার্ব্বেল দেখেছি। লালসাঙ্গার নদীতীরে একই স্থানে নীল ও সাদা মার্ব্বেল দেখলাম। প্রত্যেক পাথরের নমুনা লয়েছি। যদি সুলভ, দুর্গম গম্য না হ'ত, আমার বোধ হয় লোকে এখান থেকে সে সকল পাথর চালান দিয়ে ব্যবসা ক'রতেন। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের আগ্নেয়গিরি হ'তে গলিত প্রস্তর ও ভস্মরাশি উদ্গত হ'ত। এখন তাহা নির্ব্বাপিত। কিন্তু সে পাথর ও ভস্মরাশি এখনো আছে—শিয়াল কাঁটা ও কয় প্রকার আগাছা ব্যতীত সে উপত্যকায় অন্য বৃক্ষ নাই। সে স্থান অতিক্রম করে যাত্রীদের যেতে হয়। কালো ভস্মরাশি। বহুদিন ধরে জমে শক্ত হয়ে গেছে। বৃক্ষলতাহীন এরূপ কালো কালো পাথরের পাহাড় দক্ষিণ ভারতের কোনার সোণার খনির উপত্যকায় দেখা যায়—সেও অগ্ন্যুৎপাতের ফল—কিন্তু সে স্থান দেখতে ভীষণ।

গুপ্তকাশী ও কেদারের মধ্যে কেবল গৌরীকুণ্ড তীর্থটীর উল্লেখ করি। গৌরী দেবী এখানকার কুণ্ডে স্নান করেছিলেন। পাথরের কুণ্ডে অথবা চৌবাচ্ছায় পিতলের গোমুখ দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জল পড়ছে। এর নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে গিয়ে ঠিক পাশেরই নদী

মন্দাকিনীতে মিশে যাচ্চে। বালতি করে মন্দাকিনীর বরফ জল এনে গোমুখের ফুটন্ত জল মিশিয়ে স্নান করলাম। জল আবাদন করলে প্রথমে মিষ্ট ও পরে কষা লাগে। হরপার্ব্বতীর মন্দিরে পূজা করলাম। মন্দাকিনীর পাশেই একটি দোতালা চটীতে ছিলাম। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চটিতে মাছির উৎপাত ছিল, এখান থেকে মাছির হাত হ'তে অব্যাহতি পাই। রাত্রে অত্যন্ত শীত অনুভব করেছিলাম। দেবদারু ও cedar বৃক্ষের সারি দেখলাম।

গৌরীকুণ্ড হ'তে কয়টী চটীর পরে রামবাড়া এবং তার পরে কেদারনাথ। সমস্ত রাস্তাটী ভীষণ চড়াই। বিশেষতঃ রামবাড়া হ'তে কেদারের চার ক্রোশ পথ। এই চার ক্রোশ একেবারে খাড়া চড়াই ও বিপদসঙ্কুল। কয়েক স্থানে পথ এতই সঙ্কীর্ণ ও ঢালু যে পথ নাই বলিলেই চলে। বারাণসীর কেদারঘাটে ওঠবার কালে হাঁফাতে হয়; কিন্তু সেটা মোটে শত ফিট উঁচু। এই পথ অনুমান ছয় সাত হাজার ফিট উঁচু হ'বে। যাবার কালে ডানদিকে, নীচে, নদী পর্য্যন্ত তাকালে মাথা ঘুরে যায়। হয়ত আপনি হাত দেড়েক চওড়া আলসের মত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন—বামে আপনার ঠিক পাশেই খাড়া পাহাড়, ডাইনে খদ। অর্থাৎ দেড় হাত চওড়া ঝুলন্ত রাস্তায় আপনি দণ্ডায়মান—আকাশ পাতালের মাঝখানে। আমি দেখেছি আমার হাতের দেড় হাত চওড়া রাস্তা। যাঁরা ডাণ্ডী, কাণ্ডী অথবা ঝাঁপানে বসে যান, তাঁদের এসব রাস্তায় নামতে হয়; বাহকেরা তাঁদের ধরে উপরে তুলে নিয়ে যায়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে কতই তুচ্ছ জ্ঞান করেন দেখলাম। এই পথে ওঠবার কালে তাঁদের ভীত মুখের চেহারা আমার স্মরণ থাকবে।

হিমালয়ের চির-তুষারমণ্ডিত শীর্ষদেশে আমরা যাচ্ছি—ভস্মাচ্ছাদিত মহাদেবের মত বরফের চূড়াগুলির নৃত্য দে'খতে দে'খতে। আমার জননী ঝাঁপানে চেপে এগিয়ে যাচ্ছেন—দূরে আছেন। অন্যান্য যাত্রীরা ঝাঁপানে, ডাণ্ডীতে অথবা পদব্রজে আসছেন, আমার পিছনে।

তখন অপরাহ্ণ ৪টা। হঠাৎ মেঘ করে এলো, ঝড় উঠলো,—সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! বারি পতন। সবেগে অগ্রসর হ'লাম। একটা মুদীর দোকানের সামনে ঝাঁপানওলারা মাকে বাইরে রেখে নিজেরা দোকানের ভিড়ের মধ্যে বসেছিল। গিয়ে দেখলাম, মা বাইরে বসে ভিজচেন। ঝড়ে তাঁর ছাতা ভেঙ্গে গেছে। আমার ছাতাটী তাঁকে জোর করে দিলাম এবং আমার বর্ষাতিতে বা ওয়াটার প্রুফে তাঁকে আচ্ছাদিত করে তাঁকে সেখানে রেখে, তাঁর স্নেহের নিষেধ সত্ত্বেও আমি এগোলাম। আমার গাত্রে কলকাতার শীতকালের সাধারণ জামা। আমি যদি তাঁদের যাবার আগে কেদারে গিয়ে তাঁদের জন্য আগুণ করে না রাখি, তাঁরা কষ্ট পাবেন, এই ভেবে আমি চল্লাম।

বরফের উপরে বঙ্গমহিলা

সে প্রান্তরে কেবলমাত্র সেই একটি দোকান ছাড়া অন্য লোকালয় নাই। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে একা আমি চল্লাম। সঙ্গীরা কেউ দোকানে, কেউ সন্ন্যাসীর গুহার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে আশ্রয় লয়েছিলেন। একবার আমার পদস্খলন হ'ল। পড়িনি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের কোণে একটি বাঁকের মুখে বামে ফিরতেই—! কি ভয়াবহ অপরূপ দৃশ্য! খুব পাশাপাশি দুটি শৃঙ্গের মধ্যে বরফের জমাট নদীই বলুন বা নীহার-স্ফোট (avalanche) বলুন, তাই। উচ্চ শৃঙ্গ থেকে

আমার পাদদেশ পর্য্যন্ত বিষম ঢালু বরফের নদী, হাত-পঞ্চাশ চওড়া। তার উপর দিয়ে যেতে হবে। নদীর মাঝখানে কূপের মত দুটী গহ্বর দেখলাম। চোরাবালির উপর দিয়ে যাবার কালে কোনও পথিক ভূগর্ভে সেঁধিয়ে গেলে যেমন গর্ত্ত হয়, সেই চোরা নদীর উপরে সেইরকম গর্ত্ত। লাঠি জোরে চেপে চেপে, পিছলাতে পিছলাতে গর্ত্তের পাশ দিয়ে সভয়ে সাবধানে নদী পার হ'লাম।

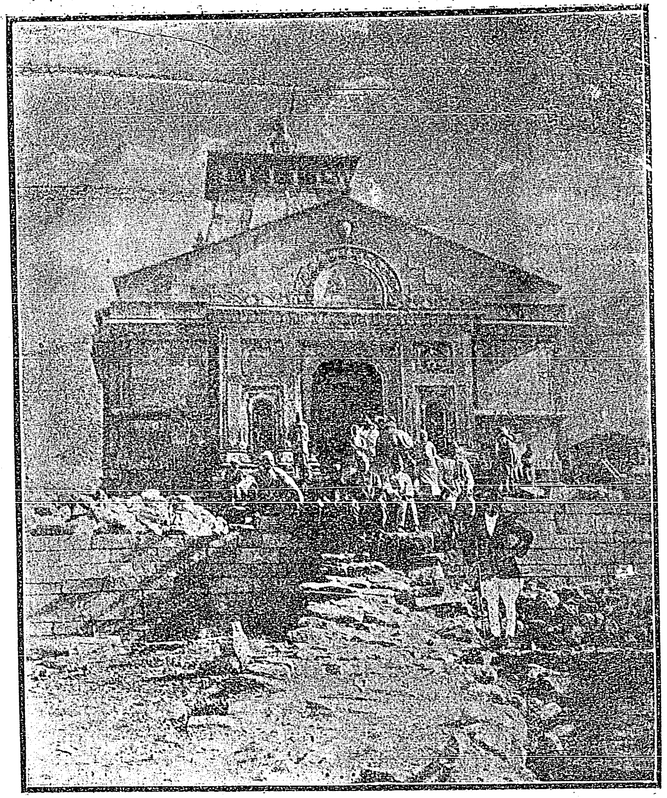

কেদারনাথ—সম্মুখে লেখক দণ্ডায়মান

বরফের নীচে জলের স্রোত আছে এবং জলপ্রপাত রূপে, আমার ডানদিকে, মন্দাকিনী বক্ষে ঝাঁপ দিচ্ছে বহু সহস্র ফিট উপর থেকে। আমার মা ও সঙ্গীরা সেখানে এসে কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছিলেন শুনলাম। দুজনা পড়েও গিছলেন। দিনকয়েক পূর্ব্বে একজন যাত্রী সেখানে মারা যান।

আমার চারিধারে, উপরে, নীচে তুষারের রাশি। উপত্যকার যেখানে ভাঁজ আছে—উঁচু নীচুর জন্য—সেখানকার নালা দিয়ে গলিত তুষারের ধারা বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে দিকেই তাকাই—হয় জমাট তুষারের চাদর, নতুবা বরফজলের লক্ষ ধারা! তুষার পরীক্ষা করলাম। ঠিক যেন দোবরা চিনি জলসিক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ডেলা পাকিয়ে খেলাম! দাঁত যে বেশী কন্‌কন্ করলো তা নয়। সেখানকার বাতাসে যেরূপ শৈত্য, তার চেয়ে একটুখানি বেশী ঠাণ্ডা লাগলো, মুখের ভিতর গরম কি না! হাতে বেশী ঠাণ্ডা লাগলো না!

কেদারে পৌঁছবার শেষের আধ-ক্রোশ পথে বেজায় কাদা। গভীর কর্দ্দম ভেঙ্গে যেতে হয়। প্রতি পদে পিছলাবার আশঙ্কা। দূর থেকে ৺কেদারনাথের মন্দির দেখলাম। প্রাণ নেচে উঠলো। জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়!

স্থানটী কি রকম? কল্পনা করুন,—তিন চার ক্রোশ লম্বা এবং এক পোয়া আন্দাজ চওড়া একটি সাদা নৌকা। তার পিছনটা খোলা বা কাটা। কেদার উপত্যকাটী সেরূপ একটি বরফের নৌকার মেঝের মত। তার সামনে অত্যুচ্চ কেদারনাথ শৃঙ্গ। দু'পাশে উনুনের ঝিঁকের মত শত শত, ঘেঁসাঘেঁসি, আকাশচুম্বী বরফের টোপর। হাজার হাজার ফিট উঁচু। সামনেকার "কেদারনাথ" রূপী মুকুটটী ও আমি যেথায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই উপত্যকাটী, সমুদ্রতীর হ'তে যথাক্রমে ২২,৮৫৩ এবং ১১৭৫৩ ফিট উঁচু। অর্থাৎ "কেদারনাথ" শৃঙ্গটী (২২৮৫৩—১১৭৫৩—) ১১,১০০ ফিট উঁচু খাড়া বরফের চাঁই। এরূপ একেবারে এত উঁচু খাড়া শৃঙ্গ না কি হিমালয়ে আর নাই। সেই শৃঙ্গের পাদস্পর্শ করে কেদারমন্দির। দুপাশের অন্য শৃঙ্গগুলি তত উঁচু নয়, তবে সবাই খাড়া। ঘুরে

দেখলে মনে হয় যেন কেদারনাথ মহেশ্বরের দুই হাত ধরে দু'সারি ভূত প্রেত দাঁড়িয়ে। দু'সারি ভূতের পাদ মধ্যবর্ত্তী আধমাইল স্থানে লোকালয় ও মন্দির আছে। কেদারনাথ শৃঙ্গ হ'তেই মন্দাকিনী নেমেছেন। এবং মন্দিরের পাদ প্রক্ষালন করে, লোকালয়ে প্রবেশের জন্য পাথরের যে ক্ষুদ্র সেতু আছে, তার নীচে দিয়ে খরবেগে চলেছেন নৌকারূপী উপত্যকার খোলা পশ্চাদ্ভাগের দিকে—এখান থেকে ব্যোমযানে উঠলে হয়ত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালার দক্ষিণে ভারতের নিম্নভূমি দেখা যায়।

কাদা ভেঙ্গে উত্তরমুখে গেলাম; পরে পূর্ব্বমুখে সেতু পেলাম। আবার উত্তরদিকে গ্রামের রাস্তা। সেতু থেকে মন্দির পর্য্যন্ত সেই একটিমাত্র রাস্তা,—দশ হাত চওড়া, পাঁচশ' হাত লম্বা হ'বে। সেতু থেকেই গ্রাম আরম্ভ, মন্দিরে গিয়ে শেষ। রাস্তার দু'পাশে অর্থাৎ পূবে ও পশ্চিমে ছোট ছোট একতালা দোতালা ৫০।৬০ খানি পাথরের বাড়ী। শ্লেটের ছাদ খড়ে ছাওয়া, তদুপরি তুষার পড়েছে।

সিংহদ্বার গ্রামে গেলাম। রাস্তার ডান অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কয়টী পান্থশালা দেখলাম—প্রতিষ্ঠাতার নাম ধাম কাষ্ঠফলকে লেখা। সন্ধান করে পাণ্ডার বাড়ী গেলাম। দোকানই বাড়ী। দ্বিতলে এবড়ো খেবড়ো মাটির মেঝের উপরে কাঠের আগুণ জ্বালিয়ে বসলাম। হাত পা জমে যাচ্ছিলো। দু'খানি আট হাত লম্বা ও ছ' হাত চওড়া ঘরের মধ্যভাগে নীচে নামবার উঁচু উঁচু ধাপের পাথরের সিঁড়ি। দুই ঘরে দুটী ক্ষুদ্র জানালা আছে। রাস্তার দিকে। উপরের ডান দিককার ঘরের নীচের ঘরে মুদীর দোকান, বাম দিককার ঘরের নীচের ঘরে আমাদের বাহকেরা আগুন জ্বেলে থাকবে। এই চারখানি ঘর লয়ে বাড়ী। মুদীরই বাড়ী। তার কাছ থেকে আহার্য্য কিনবো, সেজন্য বাড়ীর ভাড়া লবে না।

সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামলো। মা ও সঙ্গীরা এলেন। আগুণের ধারে বসলেন। ছোটো দু'টী ঘরে আট জনে থাকবো। একজন সঙ্গীকে এক ঘণ্টার উপর ঘী মালিস ও সেক করতে হ'ল। কাঠের ধূমে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। রাত্রে দোকানদারের প্রস্তুত লুচি, আলুর তরকারি ও চিনি ভক্ষণ এবং শয়ন। চাল ১॥০, ঘী ৪৲, আলু ॥০ ও চিনি ২৲ সের। কথা ছিল কেদারে দু দিন বিশ্রাম ক'রব এবং নিজেরাই রান্না করে খাবো। কিন্তু সঙ্গীরা এতই ভীত হয়েছিলেন যে, ঠাকুর দর্শন করে পরদিন প্রাতেই পালাবার জন্য সঙ্কল্প জানালেন। পাণ্ডারা যাত্রীদের লেপ সরবরাহ করেন। সমস্ত রাত ঘরে আগুণ জ্বল্‌ল।

প্রাতে বরফ কেটে নীচেকার দরজা খোলা হ'ল। গরম জলে মুখ ধোয়া ও কাপড় ছেড়ে পাণ্ডা সমেত মন্দিরে গিয়ে দেব দর্শন, ফটো তোলা এবং টাকা নিতে ক্ষুদ্র পোষ্ট অফিসে গমন। সে নাবালক পোষ্ট অফিসের মাষ্টার মশায় একজন পাণ্ডা। তিনি তখন যাত্রী লয়ে মন্দাকিনীতে গেছেন।

মন্দিরটী প্রাচীন। স্থাপত্যে মোগল প্রভাব দেখলাম না। সুদৃশ্য মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে লিঙ্গ-মূর্ত্তি ও নাটমন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পুরোভাগে ও দ্বারের চারিদিকে যে কুলুঙ্গিগুলি আছে, তন্মধ্যে দেবমূর্ত্তি আছে। সুন্দর মূর্ত্তি, প্রাচীন ভাবের। মন্দিরের সদাব্রতে অতিথি, ভিখারীরা প্রসাদ পান। কালী কমলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতও আছে।

কাল বৈকালে যখন এখানে আসছিলাম, আমার সামনে পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর খসে পড়েছিল। নীহারস্ফোট বা avalancheএর ক্ষীণ গুড় গুড় শব্দ শুনেছিলাম। আজও শুন্তে পাচ্ছি। নচেৎ প্রকৃতি মৃতের ন্যায় নীরব। লোকের কোলাহলও নাই।

সকালে যখন মেঘ-নির্ম্মুক্ত নীল আকাশে রোদ উঠল, প্রকৃতি হাস্যময়ী। মধ্যাহ্নে যখন কেদারনাথের মুকুটে রবিকিরণ প্রতিফলিত হ'ল—তখন সেদিকে তাকাতে পারা যায় না, চোখ ঝল্‌সে যায়। রোদ দেখে যাত্রীরা শান্ত হ'লেন।

এ দেশে উদ্ভিদ তো দূরের কথা, একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত দেখি নি—কেবল বরফ আর বরফ। যেখানে বরফ নাই, সেখানে কেবল ধূসরবর্ণ প্রস্তর। শীতের ছয় মাস কাল মন্দির ও বাটীগুলি বরফে ঢাকা থাকে। তাদেরই মধ্যে দ্রব্য সামগ্রী রেখে গৃহস্থেরা নিম্নভূমে যান। ৺কেদারনাথ উখী মঠে বিরাজ করেন। গৃহস্থেরা গ্রীষ্মকালে আবার আগমন করেন। জিনিসপত্র অবিকৃত অবস্থায় পান। এখন এ সময়েও প্রত্যেক ছাদ বরফে ঢাকা। রোদের প্রকোপে একটু একটু করে বরফ গলে, ছাদ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ে। একটু মেঘ করলো কিম্বা একটু জোরে হাওয়া দিল, তো পুরু বরফ জমে গেল।

অদূরে ভৈরব ঝম্প নামক একটি খদ আছে। সেকালে সন্ন্যাসীরা সেখানে ঝম্প প্রদানে শিবলোকে যেতেন।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান কালে এখানে এসেছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এই কেদার ধামে মোক্ষ লাভ করেন। (?) কেদারনাথের মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

আজ এ পর্য্যন্ত। আবার লিখবো। * * *

স্নেহের ভাই
শ্রীশ।

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১৩)

পল্লব মুখে মিসেস সিংহকে যতই কেন না জোর ক'রে 'হ'তেই পারে না', 'অসম্ভব' প্রভৃতি বলুক, মিসেস সিংহের প্রশ্নে তার আশঙ্কা যেন চতুর্গুণ বেড়ে উঠ্‌ল। বিশেষতঃ সম্প্রতি মোহনলাল প্রায়ই অনেক রাত্রে বাড়ী ফির্‌ত ও পল্লবের ঘুম না ভাঙিয়েই তার পাশের বিছানায় শুয়ে পড়্‌ত। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে বিরস স্বরে বল্‌ত থিয়েটারে গিয়েছিলাম, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম্ ইত্যাদি।

এমন সময়ে পল্লব একদিন হাম্‌ষ্টেড্ হীথে চিন্তাকুল ভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক নির্ভৃত কুঞ্জে মোহনলাল ও মিস স্মিথকে একটি বেঞ্চির ওপর বসে গভীর আলাপে মগ্ন দেখে। তারা এমন আলাপমগ্ন ছিল যে পল্লব তাদের দেখ্‌তে পেলেও তারা পল্লবকে দেখ্‌তে পায় নি।

পল্লব অনেক কথাই ভাব্‌ত। মোহনলাল মিস স্মিথের স্বামী হ'লে কি রকম ভাবে কথা কইবে, তার ও কুঙ্কুমের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার কর্‌বে এ সম্বন্ধে নানান্ জল্পনা কল্পনাই কর্‌ত। কিন্তু তখনই আবার নিজের এই উধাও কল্পনার রশ্মি সংযত ক'রে নিজের মনকে বোঝাত যে 'না না। এ মোহনলালের সাময়িক মোহ।' যদিও তার আদর্শস্থানীয় বন্ধুযুগলের একজনের এরূপ সাময়িক পতনে সে আঘাত না পেয়েই পারে নি, তবু সে বিজ্ঞভাবে নভেলের ভাষায় নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পেত: 'হাজার হোক্ মানুষের মন ত! তাই এরকম দুর্ব্বলতা কখন কাকে অতর্কিতে এসে আক্রমণ করে কে বল্‌তে পারে?' ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু সে জীবনে এ যাবৎ কোনও অনুরূপ পরীক্ষায় পড়ে নি সেহেতু এ সব কথার মধ্যেকার মঙ্গল-স্পর্শ সে পেত না। তার কাছে এসব কথা যেন অনেকটা মুখস্থ বুলি আওড়ানোরই সামিল হ'য়ে উঠ্‌ত।..... সে সময়ে সময়ে ভাব্‌ত মোহনলালকে তীব্রভাবে তিরস্কার করবে। কিন্তু মোহনলালের প্রতি তার বাল্যের সম্ভ্রম এখনও মুছে যায় নি। তাই সে মনস্থির কর্‌তে পার্‌ত না।...সে প্রায়ই আশা কর্‌ত যে মোহনলাল তাকে নিজেই একদিন সব কথা বল্‌বে। কিন্তু মোহনলাল তার সেদিন রাত্রের সামান্য ঠাট্টার পর থেকে তাকে আরও এড়িয়ে চল্‌তে আরম্ভ করেছিল। এমন কি পল্লবের দিকে বড় একটা চোখ তুলে চাইতও না। পল্লব বুঝ্‌ত যে এতে সে যেমন ব্যথা পাচ্ছে তার বাল্যবন্ধু তার চেয়ে বড় কম ব্যথা পাচ্ছে না। কিন্তু কোন ইঙ্গিত সে দেখ্‌তে পেত না!...সুতরাং এ ব্যথার কথা উত্থাপন করতেও সে ইতস্ততঃ না ক'রে পার্‌ত না।

তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। পল্লব ভাব্‌ত যে মোহনলাল একদিন না একদিন তাকে নিভৃতে ডাক্‌বেই বল্‌বে যে সে তার মোহকে মন থেকে আমূল উপড়ে ফেলে দিয়েছে। একা মোহনলালই একদিনের সঙ্কল্পে তা পারে। কারণ তার মনের জোর যে অসাধারণ!... এরূপ আশায় ও সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় সে কাল কাটাতে লাগ্‌ল।

এমন সময়ে একদিন গভীর রাত্রে শোবার সময়ে মোহনলাল তাকে হঠাৎ একটু অদ্ভুত রকম হেসে বল্‌ল: "ভাই পল্লব তোমার কথাই ফল্‌ল। আমি ও মিস স্মিথ আজ বিবাহপণে আবদ্ধ হ'য়ে এসেছি।" ব'লে সে বিছানার উপর ধপ্ ক'রে বসে প'ড়ে দুই করতলে নিজের গণ্ডদ্বয় ন্যস্ত কর্‌ল।

পল্লব বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়্‌ছিল। সে বই ফেলে তড়িৎস্পৃষ্টের মতন লাফিয়ে উঠে ব'সে বল্‌ল: "সেকি!!!"

বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে সত্যগোপন ক'রে আসার দরুণ মোহনলালের হৃদয়ে ব্যথা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল। আজ তার সে নিরুদ্ধ বেদনা পল্লবের স্নেহত্রস্ত মুখ ও কাতর দৃষ্টির স্পর্শে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌তে আরম্ভ

কর্‌ল কেমন ক'রে সে আসক্ত হয়ে পড়্‌ল।...মোহনলাল বল্‌তে লাগ্‌ল: "ভাই পল্লব এই প্রথম প্রেম—সত্যকার প্রেম।...অবশ্য তুমি বা কুঙ্কুম হয়ত বল্‌বে যে এ প্রেম নয়, ক্ষণিক চোখের মোহ মাত্র।...কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না সত্য প্রেম যে কি বস্তু তা আমি এর আগে উপলব্ধি করি নি। তাই এ আসক্তি সত্য কি ভেজাল পরীক্ষা কর্‌ব কোন্ কষ্টিপাথরে? তবে সে কথা যাক্। আসল কথা হচ্ছে এই যে এ উন্মাদনা আমার জীবনে এই প্রথম। তাই ইতিপূর্ব্বে আমি এ প্রথম উন্মাদনার শক্তি সম্বন্ধে নানারকম প'ড়ে শুনে থাক্‌লেও অভিজ্ঞতায় কিছুই জান্‌তাম না। কারণ জান ত যে সব বিষয়েই মনের ওপরে শোনা-কথার প্রভাব একরকম ও হৃদয় দিয়ে বোঝার প্রভাব আর এক রকম হ'য়ে থাকে। তাই মিস স্মিথের যৌবনলাবণ্য ও হাবভাব আমাকে প্রথম থেকেই একটু আকৃষ্ট করলেও আমি তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়েছিলাম কোনও দুষ্য মৎলবে নয়। আমি মনকে বোঝাতাম যে, দোষ কি? এদের দেশে ত এরকম মেয়েপুরুষের নির্দ্দোষ মেলামেশা বিরল নয়!... হায় তখন যদি আমার কোনও ধারণা থাক্‌ত যে এ আকর্ষণ অলক্ষিতে দুদিনেই কি প্রবল ও দুর্দ্দম্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে! তাহ'লে হয় ত—হয়ত আমি আমার নিজের আশাচিত্র অনুসারে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুল্‌তে পারতাম। কিন্তু এখন...এখন...আর হয় না।" বল্‌তে বল্‌তে সে দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ কর্‌ল।

পল্লব বিস্ময়ে ক্ষোভে ব'লে উঠ্‌ল: "মোহনলাল, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, কিছুতেই না। তোমার বাবা মা কি ভাব্‌বেন? তুমি তাঁদের এক ছেলে। তোমার বন্ধুবান্ধব সকলে কি বল্‌বে? আর, আর—সব চেয়ে যেটা বড় কথা—তোমার জীবনকে এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া...না না মোহনলাল, তুমি হয়ত আজ মোহে প'ড়ে বুঝতে পার্‌ছ না যে মিস স্মিথ প্রথম থেকেই তোমাকে ধনীর সন্তান জেনে ফাঁদ পেতেছিলেন; কিন্তু এ সত্যটি আর কারুরই চোখ এড়ায় নি।"

কথাটা ব'লেই পল্লবের মনে হ'ল যে সে সম্পূর্ণ সত্য বলে নি। কারণ মিস স্মিথ যে প্রথম দিন থেকেই মোহনলালের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন একথা আর যারই অগোচর থাকুক না কেন পল্লবের অগোচর ছিল না। এবং তখন মোহনলালের অবস্থার কথা তিনি জান্‌তেন না।

পল্লবের শেষ কথাটির মধ্যেকার খোঁচা খেয়ে মোহনলালের সুগৌর মুখখানি অল্প রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে সে তৎক্ষণাৎ খোঁচাটিকে পরিপাক ক'রে নিয়ে বল্‌ল: "পল্লব, তুমি যা বল্‌ছ হয়ত সবই ঠিক্,—কেবল আমি যে ভবিষ্যৎ ভাবি নি তোমার এ ধারণাটি ছাড়া। আমি হয়ত দেশে আর না-ও ফিরতে পারি। কারণ এদেশের মেয়েকে বিবাহ ক'রে দেশে ফিরলে অসুবিধে ও অশান্তি যে কত সে নিয়ে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে কত আলোচনা ক'রেছি। তবে কি জান পল্লব? তর্কে জানা এক, আর তদনুসারে কাজ করা আর। বিশেষতঃ এরূপ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে।"

পল্লব মোহনলালের একটি হাত চেপে ধরে বল্‌ল: "কিন্তু ভাই, তোমার মনের জোর যে অসাধারণ ব'লে জান্‌তাম!"

মোহনলাল একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্‌ল: "ভাই, মনের জোরের কথা আর বোলো না। আমরা সময়ে অসময়ে চিত্তজয়ের গৌরব করি বটে, কিন্তু তখন ভেবে দেখি না যে ভাল ছেলেদের মধ্যেও শতকরা নিরানব্বই জন 'ভাল ছেলে' থাকে শুধু সুযোগের অভাবে।"

পল্লব অজ্ঞাতে একটু আহত হ'য়ে বল্‌ল: "মোহনলাল, এ ভাই তোমার বাজে কথা।"

মোহনলাল বল্‌ল, "ভাই পল্লব ভগবান্ না করুন—তবে তুমি যদি কখনও মোহে পড় তখন আমার কথার মর্ম্মটী বুঝবে। তাই আজ আমার অনুরোধ কেবল এইটুকু মাত্র যে তুমি মনে কোরো না আমি তোমাকে ভোলাবার জন্য এভাবে আত্মসমর্থন করছি।"

পল্লব গাঢ়স্বরে বল্‌ল: "তা কি আমি মনে করতে পারি মোহনলাল। তোমাকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি তা হয়ত তুমি—"

মোহনলাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বাধা দিয়ে বল্‌ল: "জানি ভাই পল্লব। তবু কি জান? আমাদের অভিমান বস্তুটা এমনই বিশ্বাসঘাতক যে কখন কোন্ ফাঁকে প্রবেশ ক'রে যে আমাদের সত্যনিষ্ঠার মোড় ফিরিয়ে দেয় তা কেউ বল্‌তে পারে না। যাক্, আমি যা বল্‌ছিলাম। 'ভাল

ছেলে'র ভালত্ব সম্বন্ধে এখনি যা বল্লাম তা যে একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয় একথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না। আমি আমাদের দেশের 'ভালছেলে' সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুব বেশি মিশেছি ব'লেই একথাটা এত জোর ক'রে বলতে পারি। বাবাকে মফঃস্বলে তাঁর জমিদারী দেখ্‌তে হ'ত ব'লে আমাকে বরাবর কল্‌কাতায় হষ্টেলে থেকে পড়তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের দেশের ভাল মন্দ দুই রকম ছেলের সঙ্গেই একটু ঘনিষ্ঠতা করার আমার সুযোগ হ'য়েছিল। তাই আমি তোমাকে বল্‌ছি যে আমাকে তুমি বিশ্বাস কর যে বাইরে যারা খুব ভাল ছেলে ব'লে খ্যাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ভেতরে তারা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য রকম দুর্ব্বল। কতখানি দুর্ব্বল তা তুমি—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌লঃ "একথা ভাই সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ তুমি যা বল্‌ছ তা যদি ভাল ছেলের ক্ষেত্রেও সত্যি হ'ত তাহ'লে 'অন্যে পরে কা কথা'।"

মোহনলাল একটু দৃঢ় স্বরে বল্‌লঃ "ভাই পল্লব, তুমি আমার একথা নির্ভয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পার। দশে গিয়ে খোঁজ কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে যে আমার ভুল হয় নি। তোমাকে যে লোকে ছেলেমানুষ বলে সেটা ভাই—রাগ কোরো না—নিতান্ত মিথ্যা নয়। তোমার বাবা তোমাকে বরাবর বড় সন্তর্পণে নিরালায় তাঁর স্নেহচ্ছায়ে মানুষ ক'রেছেন। তাই তোমার বয়সের পক্ষে তুমি এখনও যে কতটা ছেলেমানুষ রয়েছ সেকথা আজ তুমি নিজেই জান না।...হয়ত একদিন তুমি বুঝবে যে এ বয়সে তুমি জীবনের একটা মস্ত দিক্ সম্বন্ধে কত কম জান্‌তে। এই জন্যই—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌লঃ "দেখ তোমার এ ধারণাটা কিন্তু—"

মোহনলাল বল্‌লঃ "আমাকে আমার কথাটা শেষ কর্ত্তে দাও পল্লব। আজ আমার মনটা তার সঞ্চিত গুরু-ভারটা হাল্‌কা না করলে আর নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারছে না। তাই আজ তোমাকে গোটাকতক কথা বলি শুনে' যাও। কেবল আমার আবোল তাবোল শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ো না এইটুকু গোড়াতে তোমায় বলে রাখি। কুসুম বা আমাদের কলেজের সেই স্বর্ণেন্দুর মতন দুএকজন সত্যিকার অসাধারণ বলীয়ান্ ছেলেকে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে বোধ হয়। তাই একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে অধিকাংশ আদর্শ স্থানীয় ছেলেরাও অনেক সময়েই যাকে বলি নিষ্কলঙ্ক থাকে শুধু সুযোগ অভাবে।"

পল্লব একটু বেদনা বোধ ক'রে কি একটা বল্‌তে যাবামাত্র মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌লঃ "ভাই পল্লব, তুমি একথাটা যে সহজে পরিপাক করতে পারবে না তা আমি জানি। এ সত্যটি সম্বন্ধে যখন আমার প্রথম চোখ ফোটে তখন আমিও তোমার মতনই ব্যথা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, এতে বেশী ব্যথা পাবার কিছু নেই। কারণ 'ভাল ছেলেরা' কর্‌বে কি বল ত? তাদেরও ত বিধাতা মানুষ ক'রে গড়েছেন? তাই আমরা জোর করে তাদের যোগী ক'রে তুলে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে কি হবে? দেহের এ আকাঙ্ক্ষার স্থান যে তার দুর্নিবারতার ক্ষুধাতৃষ্ণার পরেই, একথা কে না জানে? অথচ আশ্চর্য্য এই যে কার্য্যক্ষেত্রে ভালছেলে ও মন্দছেলের মধ্যে এক স্বকল্পিত গণ্ডী কেটে আমরা একের ক্ষেত্রে এ তৃষ্ণার কথা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়ে, অপরের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বও স্বীকার করতে রক্তিম হয়ে উঠি। ভাল ছেলের পানাহারের দরকার কি মন্দছেলের চেয়ে এক বিন্দুও কম? নয় ত! তাহ'লে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার বেলায়ই বা একে অস্বীকার করি কোন্ যুক্তিবলে?"

পল্লব বল্‌লঃ "ভাই মোহনলাল। তুমি যখন এত কথা বল্‌লে তখন আমাকেও দুএকটা কথা বল্‌তে হয়। আমি এ সব বিষয়ে আলোচনা করতে বরাবরই একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তার মূল কারণ হচ্ছে যাকে ইংরাজীতে বলে prudery অর্থাৎ পাছে অপরে কি মনে করে এই নিহিত আশঙ্কায়ই আমি এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা কর্ত্তে সঙ্কুচিত হই। অনেকটা এই জন্যই তোমরা অনেকে মনে কর যে আমি ছেলেমানুষ, সরল, অনভিজ্ঞ ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুতঃ তোমাদের এ রকম ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি। কারণ এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি ও নানাক্ষেত্রে দেখেওছি নিতান্ত কম নয়। কাজেই তুমি সহজেই বিশ্বাস করতে পার যে আমি নিজেও জানি যে এবিষয়ে যাদের লোকে মন্দছেলে বলে থাকে তাদের চেয়ে বিশেষ সবল নই। দৈহিক আকাঙ্ক্ষার শক্তি যে কতখানি প্রবল

সেটা আমি যথেষ্ট উপলব্ধি করছি জেনো। তবে আসল কথা কি জান? আমি নিজে এ বিষয়ে দুর্ব্বল হবার দরুণ তোমার বা কুসুমের দৃষ্টান্তে বরাবর নিজের মনের বলের খোরাক সঞ্চয় ক'রে আস্‌তে চেয়েছি। এইমাত্র। অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ক'রে আস্‌তে চেয়েছি যে তোমাদের মতন ভাল ছেলেরা আমাদের চেয়ে অনেক সহজে এ তৃষ্ণাকে জয় কর্‌তে পারে। এ বিশ্বাস আমার এখনও যায় নি। যেহেতু তোমাদের মনের জোর সাধারণ ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি একথা বোধ হয় বস্তুতঃ অসত্য নয়। তাই তুমি বা কুসুম যখন বল্‌তে বিবাহ করবে না তখন সে কথা অবিশ্বাস করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

মোহনলাল গম্ভীরস্বরে বল্‌লঃ "পল্লব, তুমি যখন বিবাহের কথাই পাড়লে তখন এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলি শোন। একথাটা আমার ক্রমেই বেশি ক'রে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় নিচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ, পরমহংসদেব, সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতির আদর্শ এজন্য অনেকটা দায়ী। আমরা যখন প্রবৃত্তির তাড়নার শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিনা বা বুঝি না তখন এই সব সত্যিকার মস্ত মস্ত চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখে ও তাঁদের উপদেশ প'ড়ে মনে ক'রে বসি বুঝি আমরাও তাঁদের মতন শক্তি ধরি। তাই এত চিরকুমার সভায় নাম লেখানো ও শেষে একে একে লুকিয়ে সে সভার খাতা থেকে নাম কাটানোর বিড়ম্বনা।"

পল্লব বল্‌লঃ "তার মানে তুমি কি বল্‌তে চাও যে এ সব আদর্শে ক্রমে আমাদের মন্দ হয়েছে?"

মোহনলাল মুখ নীচু ক'রে বল্‌লঃ "না ঠিক্ তা আমি বলি না—যদিও আমার দুই একজন উপভোগবাদী বন্ধুর তাই মত। আমার নিজের মনে হয় এরূপ আদর্শের প্রভাবে বাল্যজীবন গ'ড়ে ওঠাটা অনেক দিক্ দিয়ে বাঞ্ছনীয়। কারণ কিছুদিন এ আদর্শ অনুসরণ করলেও এর জন্য মনের মধ্যে যে একটা ছাপ থেকে যায় পরে এ আদর্শ হ'তে স্খলিত হ'লেও সে ছাপ সম্পূর্ণ মুছে যায় না। কাজেই এ সব আদর্শের স্বাদ যে একবারও পায় নি তার চেয়ে যে একবারও এ স্বাদ পেয়েছে সে খতিয়ে বড় থেকে যায় বলেই আমার মনে হয়। এক কথায়, এ রকম আদর্শকে একবারও যে লক্ষ্য ক'রে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে তার চলার পথ যে একবারও চায় নি তার পথের চেয়ে উঁচু না হয়েই পারে না। তবে তা সত্ত্বেও আমার এ আদর্শের দোষ ধরায় উদ্দেশ্য—কেবল এই কথাটি মাত্র বলা যে এ সব আদর্শকে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রবলের স্বরূপটি সম্বন্ধে একটু সচেতন হ'লে ভাল হয়। আমরা ছেলেবেলায় প্রায়ই মনে করে বসি আমরা এক এক রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ। এইটে না মনে কর্‌লেই আমাদের লম্বা লম্বা কথা বলাটা বোধ হয় একটু কমে ও নিজের যথার্থ প্রবৃত্তিটির সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি একটু বাড়ে।"

পল্লব চুপ করে রইল। মোহনলাল একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগ্‌লঃ "সেদিন এখানকার একজন মস্ত বৈজ্ঞানিকের লেখা পড়ছিলাম। তিনি বলেছেন যে 'আমরা বিশ্বাসের মহিমা প্রায়ই বড় গলা ক'রে প্রচার ক'রে থাকি বটে—কিন্তু বস্তুতঃ অবিশ্বাসের মহিমাও যে নিতান্ত কম নয় সেটা বড় একটা ভেবে দেখি না।' কথাটা আমার বড় ভাল লেগেছিল পল্লব।"

পল্লব একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লঃ "অবিশ্বাস করার মহিমা...তার মানে?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "মানে আর কিছুই নয়, মানে শুধু এই যে সত্য কি সেটা আমার পক্ষে অবিশ্বাস করাটাও একটা মস্ত পন্থা হ'তে পারে। যেমন, ধর না কেন যে কথা বল্‌ছিলাম যে—ব্যক্তিগত জীবনে নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের দৃঢ় ধারণাগুলিকে অবিশ্বাস ক'রে চলাটা অনেক সময় আমাদের বড় কম আলো দেয় না। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।—একটু ভেবে দেখ দেখি, কত সময়েই না আমরা দেখ্‌তে পাই যে অশৈশব দারুণ ভীষ্মব্রতধারী ব্রহ্মচারী বিলেতে আস্‌তে না আস্‌তে আবিষ্কার করেন যে তিনি আসলে ভীষ্মর ছায়াও মাড়ান নি। নয় কি? বরাবর নিজেকে বিবেকানন্দ মনে ক'রে আসার দরুণ কত ছেলেই না আগুণ নিয়ে খেলা করতে যায়। এঁদের যদি নিজেদের চরিত্রবল সম্বন্ধে আত্মম্ভরিতা অভ্রভেদী না হ'ত তাহ'লে হয়ত এঁদের জীবনে অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ধ্বংস হ'তে হ'ত না।...পল্লব, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে প্রথম থেকে একটু অবিশ্বাস ক'রে চল্‌তে শেখার মত বন্ধু জগতে কমই আছে।"

ব'লেই মোহনলাল একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লঃ "তবে হয়ত এ কথাও ঠিক্ যে এটা ভুক্তভোগী না হ'লে ঠিক্ বোঝা যায় না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে যে ঠেকে নি সে বোধ হয় দেখে শিখ্‌তে পারে না,—তা আমরা যতই কেন না উপদেশ দেই।"

পল্লব একটু চুপ ক'রে চিন্তাকুল স্বরে বল্‌লঃ "মোহনলাল, তোমার কথার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ অবিশ্বাসের কি একটা মন্দ দিক্‌ও নেই? আমার ত মনে হয় যে নিজের দৃঢ়তাকে সর্ব্বদা অবিশ্বাসের চোখে দেখার একটা মস্ত কুফলও ফল্‌তে পারে। সেটা এই যে এর ফলে হয়ত আমরা এই সব দৈহিক প্রবৃত্তিকেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিতে পারি। নয় কি?"

মোহনলাল চিন্তিতভাবে বল্‌লঃ "এ আশঙ্কা তোমার সম্পূর্ণ অমূলক নয়। কারণ নিজের মনের জোরকে বড় ক'রে দেখ্‌বার অভ্যাসের ফলে যে আমাদের একটুও লাভ হয় না তা আমি বলি না। তবে কি জান? আমার মোটমাট বক্তব্য এই মাত্র যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের কাছে ছদ্মবেশ পরিয়ে বেশিদিন জাহির করা চলে না। তুমি ত জান যে আমি নিজে দেশে থাক্‌তে কখনও থিয়েটারে যেতাম না, নাটক নভেল পড়তাম না, মেয়েদের ছায়াও মাড়াতাম না ইত্যাদি। কিন্তু এখন ত বুঝতে পারছি যে এ ভাবে উপবাসে রাখ্‌লেই নারী সঙ্গলাভের দুর্জ্জয় বাসনাকে শুকিয়ে মারা যায় না!"

পল্লব ধীরে ধীরে বল্‌লঃ "কিন্তু···ঐটা উচিত কি না···"

মোহনলাল বল্‌লঃ "ভাই সে সমস্যা নিয়ে কি আমি একটুও মাথা ঘামাই নি ভাব্‌ছ? তবে আমার এখন মনে হয় যে এরূপ স্থলে উচিত-অনুচিতের যুক্তিতর্ক মানুষকে বড় ঠেকাতে পারে না।"

পল্লব বল্‌লঃ—"তবে কিসে পারে?"

মোহনলাল একটু চিন্তাকুলস্বরে বল্‌লঃ "ভাই, কিসে যে পারে তা বলার চেয়ে কঠিন কাজ বোধ হয় সংসারে কমই আছে।...এ সম্বন্ধে নানা রকম তুকতাক্—যা এক সময়ে এ সব প্রবৃত্তির অমোঘ ঔষধ ব'লে আমার মনে হ'ত—নিজের ও অপরের ক্ষেত্রে একে একে ব্যর্থ হ'তে দেখেছি।...হয়ত বাল্যকাল থেকে পুরাকালের যোগীদের মতন অরণ্যে বাস, জপতপ করা—এ সবে এ প্রবৃত্তিকে খানিকটা জয় করা যায়।···কিন্তু যদি সংসারে প্রতিদিন নারীর চাহনি, স্পর্শ, সেবা প্রভৃতি স্নেহের দানের প্রভাবে গড়ে উঠ্‌তে হয় তাহ'লে বোধহয় আমাদের মনটিকে নারীর মাধুর্য্যমোহ হ'তে মুক্ত রাখা অসম্ভব হ'য়ে না উঠেই পারে না।"

পল্লব ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লঃ "মোহনলাল···এ ত দেখ্‌ছি নিছক্ নিরাশার বাণী! শেষটা তোমার এই হ'ল? নারীর প্রভাব হ'তে মানুষের উচ্চাশা মুক্তিলাভ করতে পারবেই না এই-ই কি মেনে নিতে হবে? না, কোনও প্রতিষেধকই নেই এই-ই মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চরম কথা?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "না চরম কথা নয়। চরম কথা যদি কিছু থাকে তবে সেটা বোধহয়—মানুষ এজন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছে সেই পন্থাই অবলম্বন করা। অর্থাৎ—বিবাহ করা রূপ টীকে নেওয়া। নইলে বোধহয় নারী-সঙ্গের নানারূপ ছোট বড় আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই স্তূপীকৃত হ'য়ে শেষটা সব যুক্তি-তর্ক, বাধা-নিষেধ, শাস্ত্রবাক্য-বিবেক, প্রভৃতি বড় বড় ঠেকানে-ওয়ালাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অন্ততঃ জীবনে পনর আনা তিন পাই লোকের ক্ষেত্রে ত প্রত্যহ এই-ই হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌তে পাই।···অবশ্য লোক-নিন্দার ভয়ও অনেকটা কাজ করে একথা মানি। তবে জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি পৃষ্ঠায় যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাতে ত মনে হয় যে বিবাহরূপ টীকে না নিলে এ মোহের বীজাণুকে শুধু বিবেক ও লোকনিন্দা দিয়ে বড় বেশিদিন ঠেকানো যায় না।"

পল্লব এ কথায় একটু স্তম্ভিত হ'য়ে বল্‌লঃ "মোহনলাল! তোমার চিরকালকার আদর্শবাদের আজ এই পরিণাম! শুধু চিরকুমার ব্রত বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি ক্ষান্ত নও বিবাহের মতন পবিত্র বন্ধনকে শুধু মোহের বীজাণুর বিরুদ্ধে টীকে-দেওয়া ব'লে প্রচার করছ? আশ্চর্য্য! প্রথম মোহ মানুষকে এত বদ্‌লে দিতে পারে! তুমি কি সেই মোহনলাল?"

মোহনলাল একটু সন্তপ্ত স্বরে বল্‌লঃ "হয়ত আমার বর্ত্তমান স্বপ্নভঙ্গের বা disillusionmentএর অবস্থার বিবাহকে আমি ঠিক্‌মত দেখ্‌তে পারছি না। তবে এটা আমার আসল বক্তব্য ছিল না ভেবে হয়ত তুমি এ কথাটিকে মাফ কর্‌তে অসম্মত হবে না। যদিও আমি বল্‌তে বাধ্য যে অধিকাংশ লোকেই শুধু প্রবৃত্তির রাশ ছেড়ে দেবার জন্যই প্রথমটা বিবাহ করে। তবে হয়ত শেষটায় যে বিবাহটা যাকে তুমি বল্‌ছ 'পবিত্র বন্ধন' তাই হ'য়ে দাঁড়ায়। সে বিষয়ে এখ আমি জোর ক'রে না বল্‌তে চাই না; কেননা এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, আর পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা আমি অনুচিত মনে করি।...কিন্তু সে কথা যাক্। আমি আজ তোমায় যা বল্‌ছিলাম।...মনে কোরো না যে আমি আজ নিজে মোহে পড়ে গেছি ব'লেই সব ভাল ছেলের ভালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে ব'সে নিজেকে সমর্থন কর্‌তে চাইছি। আমি সত্যিই দেশে ও এখানে আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ভাল ছেলের আচরণের খবর রাখি। আমি দেখেছি যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই মনের দিক্ দিয়ে না হোক্ দেহের দিক্ দিয়ে যাকে বলি ভাল ছেলে থাকি শুধু—প্রলোভনের অভাবে। অথচ এজন্য আমাদের অহমিকার আর সীমা থাকে না।...পরে একদিন যখন নিয়তি হেসে আমাদের অহঙ্কারের দুর্গের নীচে থেকে একখানি মাত্র পাথর খুলে নেন, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের কল্পিত গাঁথুনি বস্তুতঃ কত দুর্ব্বল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের আদর্শবাদ জীবনের যথার্থ স্বরূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না ব'লে দু একটি ঘা খেলেই গোড়া থেকে টলমল করে।"

পল্লব বল্‌লঃ "'বিশেষতঃ আমাদের দেশে' কথাটি বলার মানে? অর্থাৎ তুমি কি বল্‌তে চাও যে এ সব দেশে বরাবর আদর্শবাদ বজায় রাখা বেশি সহজ?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "আমার আগে তা মনে হ'ত না' কিন্তু আজকাল ক্রমেই বেশি ক'রে মনে হচ্ছে। মনে কোরো না যে আমার মোহমুগ্ধ হওয়াটাই আমার এ গভীর পরিবর্ত্তনের মূল। এ পরিবর্ত্তন আমার অনেকদিন ধরেই ধীরে ধীরে হচ্ছিল, আজ কেবল সেটা পর্ব্বতের চূড়ার মতন সহসা প্রকাশ হয়েছে মাত্র।...দেখ পল্লব আমি তোমার আসার বছর দেড়েক আগে এসেছি। তাছাড়া আমাকে এসেই কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হ'তে হয় নি, লণ্ডন এডিনবরা প্রভৃতি পর্য্যটন ক'রে বেড়াতে হয়েছিল। ফলে, এদেশে আমাদের ছেলেরা কি রকম ভাবে জীবন কাটায় সে সম্বন্ধে আমার ভাগ্যে অনেকের চেয়ে একটু বেশি অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল। এমন কি সম্প্রতি দু তিন জন অতি সচ্চরিত্র ছেলের পদস্খলনের ভিতরকার ইতিহাস জান্‌বার আমার সুযোগ হ'য়েছিল। এ সব দেখে শুনে আমার একটা কথা বার বার মনে হ'য়েছে। সেটা এই যে আমাদের এদেশে এসে একবার পদস্খলন হ'লে যে আর কিছু ধ'রে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকে না তার প্রধান কারণ—আমরা ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত থাকি।"

পল্লব বল্‌লঃ "কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌লে ভাল হয়।"

মোহনলাল বল্‌লঃ "অর্থাৎ আমার মোট বক্তব্যটি শুধু এই মাত্র যে ছেলেবেলা থেকে অল্পবিস্তর মেয়েদের সঙ্গে মেশাটা হচ্ছে যৌবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার একটা মস্ত প্রতিষেধক। এ কথার মস্ত প্রমাণ—এদেশের ভাল ছেলেদের দৃষ্টান্ত। যৌবনের মোহে এরা যথেষ্ট পড়ে। কিন্তু সেজন্য এরা জীবনকে ধ্বংস হ'তে দেয় না। কেমন ক'রে এরা এ শক্তি পেল এ কথা আমি অনেকদিন ভেবেছি। শেষটায় আমার মনে হয়েছে যে কারণ শুধু এই যে ছেলেবেলা থেকে নারীর সঙ্গ কমবেশী পেয়ে আসার দরুণ সেটার মোহ এদের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতন দুর্দ্দম্য হ'য়ে ওঠে না। এবং তার ফলে এরা যৌবনে নারীর সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে যদি স্খলিতও হয় তা হ'লেও তাতে তত বিচলিত হয় না, নিজের কাজটা ক'রে যায়। অপর পক্ষে আমরা ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হ'য়ে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকি ব'লে হঠাৎ যখন এদেশের ললনাগণের সঙ্গে মেলামেশার অনেকটা অবাধ স্বাধীনতা পাই তখন আর টাল সাম্‌লাতে পারি না।"

পল্লব সন্দিগ্ধভাবে বল্‌লঃ "তার মানে এরা পারে?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "আমার বোধহয় অনেকটা পারে। এ কথাটা তোমাকে আজ সাধ্যমত একটু বিশদ ক'রে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। তোমাকে কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুন্‌তে হবে পল্লব।"

"বৎসরখানেক আগে একজন মস্ত নরওয়ের লেখকের উপন্যাসে একটি কথা আমাকে এ বিষয়ে প্রথমে ভাবিয়ে

দেয়। তিনি এক যায়গায় লিখেছেন যে এ সংসারে কে এমন 'মূর্খ' আছে যে কোনও না কোনও সময়ে নীতির শত নিষেধ সত্ত্বেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় গা-ভাসান দেয় নি! 'মূর্খ' কথাটির ব্যবহার লক্ষ্য কোরো। চিন্তাশীল লোকের লেখায় এ রকম দায়িত্বহীন কথা প'ড়ে আমার মনটা যে বেশ একটু বিচলিত হ'য়েছিল তা এখনও পরিষ্কার মনে আছে। কারণ এ সম্পর্কে তাঁর মূর্খ কথাটি ব্যবহার করার সদর্থ কি শুধু এই নয় যে 'সংসারে এরকমটা শুধু হ'য়ে থাকে তাই নয়, এ অসংযমের অভিজ্ঞতাটা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়? তবে এ উচ্ছৃঙ্খল সিদ্ধান্তটি যখন প্রথম পড়ি তখন আমার মনের পূর্ব্ববিশ্বাস এতটা দৃঢ় ছিল যে এ কথাটায় আমার মনকে একটু নাড়া দিয়ে দিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ আমি এ দায়িত্বহীন কথাটাকে খুব গভীরভাবে বিচারযোগ্য ব'লে মনে করি নি। কিন্তু ক্রমশঃ য়ুরোপের আরও দুচারজন চিন্তাশীল লোকের চিন্তাধারা আলোচনা ক'রেছি ও এদের দেশের অনেক 'ভাল ছেলের' সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ করেছি। ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এরা Puritanismকে শুধু যে মুখে ঠাট্টা করে তাই নয় মনে মনেও হাস্যাস্পদ মনে ক'রে থাকে। কাজে কাজেই এরা মেয়ে পুরুষের আচরণে পান থেকে চুণ খস্‌লেই আর্ত্তনাদ করে ওঠে না, বা নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে গোড়া থেকে অসম্ভব রকম ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে বসে থাকে না।"

পল্লব কুঙ্কুমের সঙ্গে প্রায়ই মোহনলালের য়ুরোপীয় সভ্যতার গুণপক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে তর্ক করত। কিন্তু এ যাবৎ অন্ততঃ পল্লব অনেকটা তর্কের খাতিরেই তর্ক করত। কারণ মনে মনে সে কখনও ভাবেনি যে মোহনলালের য়ুরোপপ্রীতির কোনও কুফল ফল্‌তে পারে। আজ তার হঠাৎ মনে হ'ল যে হয়ত বিলেতে এসে মোহনলালের মনটির পরিবর্ত্তনটির গভীরতা যে কতখানি তা সে এতদিন ঠিকমত ঠাহর করতে পারে নি। এ সন্দেহ তাকে একটু বেশি বেদনা না দিয়েই পার্‌ল না। যাকে বরাবর নিকট-বন্ধু মনে ক'রে আসা গেছে হঠাৎ একদিন তার হৃদয়টি অপরিচিত ব'লে মনে হ'লে বন্ধুত্বের অভিমান ব্যথা না পেয়েই পারে না। তাই পল্লব একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে অল্প উষ্মার সুরে ব'লে উঠ্‌ল:—"তাই ব'লে কি সেটা ভাল বল্‌তে হবে? না জীবন ও নীতি সম্বন্ধে এদের মূলসূত্রগুলিই অকাট্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে? মোহনলাল! আজ তোমার মুখে এই সব কথা শুনে আমার মনে যে কি রকম ভাবের উদয় হচ্ছে তা ব'লে বোঝানো সহজ নয়। .....নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখ্‌তে খুব বেশির ভাগ লোকই অক্ষম,—মানি। প্রলোভনের হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করতে পারা-না-পারা-বিষয়ে ভালছেলে মন্দছেলে সব সমান একথাও না হয় মেনে নিতে পারি। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের দেশের 'নৈতিক পবিত্রতা', 'বৈরাগ্য' 'মরালিটি' প্রভৃতির আদর্শের ওপরেও গায়ের ঝাল ঝাড়াটা আমি ঠিক্ পরিপাক কর্‌তে পারছি না। কার্য্যক্ষেত্রে নৈতিক পদস্খলনকে মার্জ্জনা করা এক, আর আদর্শ জগতে কালাপাহাড়ি আর। একথা তোমার মুখেই বারবার শুনেছি। তাই তোমার মুখে আজ সব উল্‌টো উল্‌টো কথা শুনে—"

মোহনলাল উত্তেজিত পল্লবের কাঁধে একটি হাত দিয়ে বলে উঠ্‌ল:—"শোন শোন পল্লব। তুমি আমাকে উত্তেজনার মাথায় একটু ভুল বুঝেছ। নৈতিক পবিত্রতার 'আদর্শে'র সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। প্রয়োগ নিয়েই আজ আমার মাথাব্যথা। কারণ আদর্শ হিসাবে যে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ একটা বড় আদর্শ একথা কে না মান্‌বে?"

পল্লব একটু ব্যঙ্গের সুরে বল্‌ল: "কেন—তোমার অনেক তথাকথিত চিন্তাশীল লোকেই ত মানেন না দেখ্‌তে পাই, বিশেষতঃ এদেশে!"

মোহনলাল বল্‌ল:—"তুমি বোধ হয় Oscar Wilde, Shaw, Ludovici, Russel, Anatole France প্রমুখ দুচারজন লেখকের কথা মনে ক'রে এ রকম রুষ্ট ভাষা ব্যবহার কর্‌ছ, না?.....কিন্তু দেখ আমার মনে হয় যে এঁরা আসল পবিত্রতার ভাণকেই ব্যঙ্গ ক'রেছেন, খাঁটি পবিত্রতা বা আদর্শবাদকে করেন নি। আর যদি তা ক'রেও থাকেন, তাহ'লেও বলা চলে না যে এ সব আদর্শের এদের মনো-রাজ্যে কোনও প্রভাবই নেই।"

পল্লব একটু সবিদ্রূপ হেসে বল্‌ল:—"অর্থাৎ?" তার ক্ষোভ তখনও যায় নি। সে কেমন যেন অজ্ঞাতে মোহন-লালের অনেক সরল উক্তিকে নিজের প্রতি কটাক্ষপাত হিসেবেই গ্রহণ না ক'রে পারছিল না।

মোহনলাল বল্‌ল: "অর্থাৎ সব দেশেই আদর্শবাদে সত্য সত্য সাড়া দেয় কম লোক। তাদের এক কথায় একটা জাতির choice spirits বলা যেতে পারে। কাজে কাজেই যদি এদের দেশের choice spiritsরাও আদর্শবাদ দ্বারা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে অক্ষম হ'য়ে ওঠে, কেবল তখনই বলা যেতে পারে যে এদের সভ্যতায় আদর্শবাদের প্রভাব নেই। এখন দেখ, এদের দেশে কত লোক যুদ্ধের সময় সত্যই দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিয়েছে —স্বার্থের জন্য নয়। কত Quaker শত বাধা সত্ত্বেও খৃষ্টের নীতি অনুসারে জীবন যাপন ক'রে থাকে, যেমন যখন তারা conscientious objector হ'য়ে জেলেও গেছে কিন্তু দেশের জন্য অস্ত্র ধরে নি; কত সাহিত্যিক দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেও লোকপ্রিয় হবার জন্য আর্টকে জলাঞ্জলি দেয় নি; কত বৈজ্ঞানিক আমরণ দেহসুখ, বিলাস ত্যাগ করে লেবরেটরিতে একাগ্রচিত্তে সত্যের সাধনা ক'রে গেছে। তবে এ সব একটু অবান্তর কথা এসে পড়্‌ল। যে কথা বল্‌ছিলাম।.....

"আমি বল্‌ছিলাম কি যে তুমি আমার উপর একটু অবিচার করেছ; অর্থাৎ আমাকে ভুল বুঝেছ। কারণ আমি আদর্শজগতে নৈতিক পবিত্রতা, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে বড় জিনিষ ব'লে এখনও অবধি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।—হাজার হোক্ আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি আদর্শের যে tradition যুগ যুগ ধ'রে চ'লে আস্‌ছে দু-চার বৎসর বিলেতে থাক্‌লেই কিছু সে আদর্শের প্রভাব মন থেকে একেবারে দূর ক'রে দেওয়া যায় না। নৈতিক স্খলনের বিষময় ফলের কথাও আমার অগোচর নেই। তবে তা সত্ত্বেও আমি বল্‌তে বাধ্য যে নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে নিছক আদর্শকে সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে দেখারও একটা কুফল অনেক সময়ে ফ'লে থাকে। সেটা এই যে এ সব দেশে এসে—বা আমাদের নিজেদের দেশেও—আমাদের একবার পতন হ'লে আমরা স্বতঃই মনে ক'রে বসি যে সব গেল। আমি সম্প্রতি অনেকগুলি.....সত্যিকার মহৎচরিত্র আদর্শবাদী ছেলেকে...সামান্য ভুলের জন্য এভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে দেখেছি ব'লে একথা আরও এতটা জোর দিয়ে বল্‌তে পারছি।"

বল্‌তে বল্‌তে মোহনলালের স্বর গাঢ় হ'য়ে এসেছিল। এমন কি পল্লবের মনে হ'ল যে শেষ কথাটি বল্‌বার সময় যেন মোহনলালকে দু'তিনবার একটু ইতস্ততঃ ভাবের মধ্যে প'ড়ে যেতে হ'ল। সে কি একটা প্রতিবাদ করতে উদ্যত হ'তেই মোহনলাল তাকে বাধা দিয়ে বল্‌ল: "পল্লব, আজ আমার কথাগুলিকে তুমি তর্ক হিসেবে নিয়ে ভুল কোরো না এই আমার অনুরোধ। আমি আজ যতটা আন্তরিক ভাবে তোমার কাছে নিজের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে কথা বল্‌ছি সেই ভাবটা ধরতে চেষ্টা কর। সুযুক্তি প্রয়োগ ক'রে বুদ্ধি জাহির করার ক্ষেত্র এ নয়—একথা তুমি বিশ্বাস কর। বোধ হয় একদিন বুঝবে যে জীবনে এরকম অকপট স্বীকারোক্তি করাটা যেমন লাভ সেটা শুনতে পাওয়াও তার চেয়ে বড় কম লাভ নয়। তাই আমার আজকের কথাগুলি তুমি একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর এইই তোমার বন্ধুর মিনতি। শোন পল্লব, তুমি সত্যি একথা নির্ভয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পার যে অসম্ভব বড় আদর্শ সমাজের সাধারণের কাছে ধরার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে। হয়ত সেই জন্যই আমাদের দেশে অধিকারীভেদ ব'লে একটা কথার ওপর আমাদের দার্শনিক, নীতিবাদী সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি এত জোর দিয়েছেন। অবশ্য উচ্চ নৈতিক আদর্শ অনুসারে চল্‌বার চেষ্টা করারও যে একটা উল্‌টো খারাপ দিক্ আছে একথা শুন্‌লে মনে প্রথমটায় ধাক্কা লাগা অস্বাভাবিক নয়! যখন একথাটা আমার প্রথম মনে উদয় হয় তখন আমার নিজেরও খুবই ধাক্কা লেগেছিল। তবে সত্যই যখন জগতের নিয়ন্তা তখন তাকে যত শীঘ্র মেনে নেওয়া যায় ততই ভাল। তাই আমি মনে করি যে একথা শান্তভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় যে আদর্শ জগতে এদের নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার মানদণ্ড আমাদের মতন সূক্ষ্ম না হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে তাতে এদের বিশেষ ক্ষতি হয় নি।"

পল্লব বল্‌ল:—"কেমন ক'রে? নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার মধ্যে যে একটা সত্যিকার বড় তৃপ্তি আছে একথা তুমি কি অস্বীকার কর?"

মোহনলাল বল্‌ল: "করি—যদি তুমি নৈতিক নিষ্কলঙ্কতা বল্‌তে সাধারণে যা মনে করে, তাই মনে ক'রে থাক। অর্থাৎ, আমি নিছক্ দৈহিক নিষ্কলঙ্কতার উপকারিতা অস্বীকার না করলেও সেটা যে একটা positive উপলব্ধি

তা ম'নে করি না, যদি সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি না থাকে। এবং চিত্তশুদ্ধি যে কত কঠিন ব্যাপার তা তুমি নিশ্চয়ই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে থাকবে। একথা যদি তুমি স্বীকার কর তাহ'লে তোমার এ-ও স্বীকার করতে হবে যে যে আদর্শকে আমাদের দেশে লক্ষের মধ্যেও একজনকে উপলব্ধি করতে দেখা যায় কি না সন্দেহ, সেটাকে খুব বড় ক'রে না দেখলেও কার্য্যক্ষেত্রে তত ক্ষতি হয় না। শুধু তাই নয়, কার্য্যক্ষেত্রে এ আদর্শকে অনধিগম্য মনে ক'রে চললেও তাতে সমাজের সৃষ্টিশক্তির বা গতিশক্তির তেমন লোকসান হয় না। অর্থাৎ একটা জাতির sex সম্বন্ধে নৈতিক শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সত্যকার দানে মস্ত হবার তার কোনও বাধা নেই।"

পল্লব বল্‌লঃ "এটা অতি অসার কথা।"

মোহনলাল বল্‌লঃ "একটু ভেবে দেখলে দেখতে পাবে যে অনেক দৃশ্যতঃ অসার কথার মধ্যে অনেক সময় গভীর সত্য নিহিত থাকে। আমার কথাটা বোঝবার একটু চেষ্টা করলে হয়ত এ কথাটা তোমার কাছে তত অসার মনে হবে না। নৈতিক নিষ্কলঙ্কতাকে খুব বড় করে না-দেখার যে সুফলও থাকতে পারে এটা আমাদের প্রথমটায় অসার কথা মনে হ'তে পারে বটে। ছেলেবেলা থেকে কোনও আইডিয়াকে প্রকাণ্ড, মহান্, গরীয়ান্ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত ক'রে দেখার ও শুনে-আসার অভ্যাসের ফলে মনটা অনেক সময়েই এ সব বিশেষণের hypnotismএর মধ্যে প'ড়ে যায়। ফলে হয় এই, যে এ সম্বন্ধে অন্য কোনওরূপ ধারণা যে পোষণ করা চলে সে সম্বন্ধে আমরা স্বতঃই যথেষ্ট সচেতন থাকতে পারি না। সেই জন্যই নীতিরাজ্যে দুর্দ্ধর্ষ আদর্শ পোষণ-না-করারও যে একটা ভাল দিক্ থাকতে পারে এ কথাটা স্বীকার করতে তুমি আজ কুণ্ঠিত হচ্ছ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে হয়ত পরে এর মধ্যেকার সত্যটুকু তুমি গ্রহণ না ক'রেই পারবে না।"

পল্লব বল্‌লঃ "সে ভাল দিক্‌টা কি শুনি?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "সে ভাল দিক্‌টা এই যে যৌবনে এ সব ছোটখাট নৈতিক স্খলনকে এরা সত্যিই তত গুরুতর মনে করে না ব'লে এদের ভাল ছেলে মন্দ ছেলে কেউই এ রকম দুচারটে পদস্খলনে বিশেষ বিচলিত হয় না। তারা এ সব গুলোকে জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলে মনে করে—শুধু ছেলেরাই যে করে তাই নয়—বুড়োরাও করে। তার একটা প্রমাণ দেখতে পাবে এরা প্রায়ই যৌবনের ছোটোখাট অবিচার গুলোকে sowing of wild oats ব'লে ক্ষমা ক'রে থাকে।"

পল্লব বল্‌লঃ "এ কথা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে আমার মনে হয় যে এদের দেশের প্রবীনেরা প্রায়ই নবীনদের এ সব বিষয়ে অতিচার ক্ষমা করেন এই ভেবে যে তাঁরাও যখন নবীন ছিলেন তখন তাঁদেরও এ গুণে ঘাট ছিল না।" শেষ কথাটির মধ্যে সে ইচ্ছে ক'রেই একটু ব্যঙ্গের সুর এনেছিল। মোহনলাল এ ব্যঙ্গের রেশটি বুঝলেও সেটাকে গায়ে না মেখে ভালমানুষি সুরে বল্‌লঃ "এ কথা তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় পল্লব। তবে কি জান, এ সব বিষয়ে এদের স্খলনকে ব্যঙ্গ করবার সময় আমরা অতি সহজেই এ সাদা সত্যটি ভুলে যাই যে নৈতিক আচরণে বস্তুতঃ আমরাও নিতান্ত কেও-কেটা নই। আমাদের পতন হয়ত গুনতিতে এদের চেয়ে কিছু কম হ'তে পারে, কিন্তু তার প্রধান কারণ আমাদের সুযোগ সুবিধের অভাব—সদিচ্ছার অভাব নয়। সুযোগ পেলে যে আমাদের পক্ষেও বাইরণ বা Louis XIVকে টেক্কা দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয় সে বিষয়ে আমাদের উচ্চ-বংশীয়েরা ও রাজারাজড়া জমিদার প্রভুরা জলন্ত প্রমাণ। তবে যা বল্‌ছিলাম সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক্।... হ্যাঁ...আমি বলছিলাম কি যে নৈতিক অসংযমকে এরা অনেকটা সাদা চোখে দেখে ব'লেই এদের ভাল ছেলেরা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের স্খলনে আমাদের ভাল ছেলেদের মতন অবলীলাক্রমে আত্মসম্মান হারিয়ে বসে না বা অধঃপতনের চূড়ান্ত ক'রে চিচিক্কার ক'রে ফেলে না। তার অবশ্য অন্য কারণও যে নেই তা নয়। এদের জীবনের মধ্যেকার প্রাণশক্তি বা vitalityর স্রোতটা এদের একটা সত্য সম্পদ্। তার সামনে এ সব অসংযমের পাহাড় প্রায়ই আবর্জ্জনাও অনেক সময় মুছে ভেসে যায়, যেখানে আমাদের স্রোতহীন জীবনে খড় কুটোটিও জলকে পঙ্কিল ক'রে তোলার পক্ষে যথেষ্ট হ'য়ে থাকে। তবে এ কারণের কথা এখন থাকুক, কেন না আজ আমি এদের ও আমাদের আদর্শের প্রয়োগ নিয়েই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে

চাই। প্রথমতঃ আমার ত খুবই মনে হয় যে sex বিষয়ে মূলতঃ আমাদের প্রবৃত্তিও যা এদের প্রবৃত্তিও তাই—প্রভেদ যা কিছু আচার ও সুযোগ নিয়ে। তবে এ রকম সাদা সত্যকেও যে আজ জোর ক'রে বলতে হচ্ছে তার কারণ, আমরা অতি সহজেই মনকে চোখ ঠেরে নিজেদের এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মধ্বজ জাতি ব'লে প্রচার করতে ভালবাসি। যেন সত্যিই ওরা ব্রহ্মার পা থেকে জন্মেছিল ও একা আমরাই তাঁর হৃদয়পদ্ম হ'তে জন্মলাভ করেছি। যিনিই আমাদের মেস হষ্টেল প্রভৃতি ছেলেদের আচরণের বিষয়ে ভেতরকার খবর রাখেন তিনিই জানেন বস্তুতঃ আমাদের ছেলেদের প্রকৃতির সঙ্গে ওদের ছেলেদের প্রকৃতির পার্থক্য আমাদের কতখানি স্বকপোলকল্পিত।...তবে এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই একটা গোলমাল ক'রে বসি। সেটা হচ্ছে আদর্শ নিয়ে। এদের ও আমাদের মধ্যে sex বিষয়ে 'আচরণে' বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও 'আদর্শে' আছে এ কথাটা বোধ হয় সত্য। প্রভেদটা কি রকম একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। আমাদের কোনও ভাল ছেলে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অসংযত হ'য়ে পড়লেও সত্যি সত্যিই মনে মনে সেটা গুরুতর অন্যায় ব'লে বিশ্বাস করে। কারণ আমাদের দেশের ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, চিত্ত-শুদ্ধি প্রভৃতির আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ ছেলেদের মনের ওপর অলক্ষিতে কম প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু এদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনের উপরও খৃষ্ট, সেণ্ট পল বা সেণ্ট ফ্রান্সিসের প্রভাব প্রায় নেই বললেই হয়—এবং যেটুকু ছিল, science, psycho-analysis প্রভৃতির প্রচারে অতি দ্রুতবেগে ক'মে আসছে। (এখানে অবশ্য আমি উচ্চ-শিক্ষিতদের কথা বলছি। কারণ উচ্চশিক্ষিতেরা আজ যা বলবে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতেরা কাল সেই কথা বলবে।) এখন দেখ, মেয়ে পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধে এদের কুণ্ঠা সঙ্কোচ ক্রমেই কমে যাওয়ার পরিণাম কি হয়েছে?—হয়েছে এই যে এরা এ সব বিষয়ে একটু বেশি সাহসী ও সত্যবাদী হ'তে পেরেছে। কাজেই যে আচরণে আমাদের দেশের ভাল ছেলেদের মন একেবারে নুয়ে পড়ে—তাদের সত্যগোপন ও অনেক সময়ে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয় ব'লে—ঠিক্ সেই আচরণে এদের মনের প্রসার তেমন কমতে পারে না।"

পল্লব বল্‌লঃ "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মোহনলাল।"

মোহনলাল বল্‌লঃ "আমার বোধ হয় কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলার দরকার আছে। গোড়া থেকে বলি। আমার মনে হয় যে আমরা অনেক সময়ে একটা আচরণের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে গিয়ে একটা ভুল ক'রে বসি। কোনও আচরণ ভাল কি মন্দ সেটা নির্ভর করে আমাদের মনের উপর তার কি রকম ছাপ পড়ে তার উপর। নয় কি? কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে একটা আচরণ বা ব্যবহারের গুরুত্ব দেশকালপাত্রভেদে একই রকম থাকে না। অর্থাৎ কিনা একের কাছে যে আচরণ অশোভন বা অন্যায় অন্যের কাছে তা শোভন ও ন্যায়সঙ্গতও হ'তে পারে।

পল্লব বল্‌লঃ "তা ত বটেই। একটা শিশুর আচরণে যা সুন্দর তা যুবকের আচরণে অসুন্দর ত হ'তেই পারে।"

মোহনলাল বল্‌লঃ "ঠিক কথা। তবে এই কথাটা আরও একটু বেশি সাধারণ ভাবে বলতে গেলেই গোল বাধে। অর্থাৎ যদি আমি বলি যে আমাদের কাছে একটা নৈতিক স্খলন যত গুরুতর য়ুরোপীয়দের কাছে সেটা তার চেয়ে ঢের কম গুরুতর হ'তে পারে, তাহ'লে সম্ভবতঃ নাতিবাগীশেরা মহা কলরব করে উঠবেন। তারা বলবেন যা পাপ তা সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই পাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার সম্প্রতি বিশেষ করেই মনে হয়েছে যে যাকে আমরা নৈতিক স্খলন বলে গালি দেই সেটা ক্ষতিকর হ'য়ে ওঠে কাজটির জন্যে তত নয় যত তার দরুণ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার জন্যে। তাই আমাদের দেশে ওর কুফল যত গুরুতর হ'য়ে থাকে এদেশে তা হয় না।"

পল্লব বল্‌লঃ "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মোহনলাল। অমিতাচারের কি physical কুফলও যথেষ্ট নেই? আর তার দরুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতিও কি নিন্দনীয় নয়?"

মোহনলাল বল্‌লঃ "এ কথাটা একটু অবান্তর হ'য়ে পড়ল। তাছাড়া 'নিন্দনীয়' কথাটি ব্যবহার করার দরুণ তুমি একটা মস্ত প্রশ্ন তুললে। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন এ প্রশ্নটির সম্বন্ধে আমি যে দুচারটি কথা ভেবেছি তা নিয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ নয়।

"প্রথমতঃ দেখ, কোনও কাজ সমাজে নিন্দনীয় হ'লেই

যে বস্তুতঃ গর্হিত হবেই হবে একথা বলা চলে না। এ সম্বন্ধে চরম কষ্টিপাথর হওয়া উচিত—নিজের উচিত-অনুচিত বোধ, সমাজের নয়। নইলে সমাজ অনড়, অচল, স্রোতহীন হয়ে পড়ে। উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে সমাজের আদেশ যে ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়ই লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য হ'য়ে থাকে, সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে না। উদাহরণতঃ সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, সমুদ্রযাত্রা, ছুৎমার্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সমাজের বিধি নেওয়া যেতে পারে। তাই কোনও কাজ নিন্দনীয় বলতে তুমি কি বলতে চাচ্ছ সেটা প্রথমতঃ স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে। অর্থাৎ সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় না ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে নিন্দনীয়। যদি বল সমাজের চক্ষে, তাহ'লে আমি বলব যে সমাজ অনেক সময়েই কোনও আচরণকে নিন্দা করে সমাজের মঙ্গলের কথা ভেবে নয়, গতানুগতিকতার প্রভাবে। নয় কি?"

পল্লব বল্‌ল: "তাই কি সত্য? একটা কাজ নিন্দনীয় দাঁড়ায় কি মূলতঃ তাতে সমাজের হানি হওয়ার দরুণই নয়?"

মোহনলাল বল্‌ল: "না, সব সময়ে নয়। আমরা সচরাচর অসংযমকে নিন্দা ক'রে থাকি—খানিকটা, পাঁচজনের সঙ্গে মত দিলে জীবনে অনেকটা অসুবিধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ব'লে, ও খানিকটা, অপরের নিন্দা করবামাত্র অজ্ঞাতে নিজের শ্রেষ্ঠতার কথা মনে হ'য়ে আনন্দ হয় ব'লে।"

পল্লব বল্‌ল: "মানুষ এত লঘুচিত্ত তা স্বীকার করা—"

মোহনলাল বল্‌ল: "পল্লব একথা শুনলে মনে ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক, মানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার না ক'রেই উপায় নেই যেহেতু এটা সত্য।"

পল্লব একটু উষ্ণভাবে বল্‌ল: "কারণ তুমি বলছ সত্য—এই ত?"

মোহনলাল বল্‌ল: "ভাই পল্লব রাগ কোরো না। আমার যুক্তি অন্ততঃ এতটা অসার নয়, যে আমি শুধু আমার বিশ্বাসের বলে তোমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা পাব। তবে তুমি যখন নেহাৎ প্রমাণ চাচ্ছ তখন দু একটা কঠিন উদাহরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে আমার দৃষ্টান্তগুলির কঠোরতায় কিছু মনে করতে পাবে না—তা আগে থেকেই ব'লে রাখছি।...আমি বলছি এই কথা যে আমরা নৈতিক শিথিলতাকে সচরাচর নিন্দা ক'রে থাকি অহমিকতা চরিতার্থ করার জন্য ও যূথমতের প্রভাব বশে, যাকে ইংরাজীতে বলে herd-instinct...তুমি বলছ 'না অসংযমটা দোষের ও তার ফলে অসংযমীর স্বাস্থ্যহানিটাও দুঃখের বিষয় ব'লেই সমাজ তাকে দুষ্য মনে করে।' তোমার এ ধারণা যে যুক্তিসঙ্গত নয় তার একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, যে সমাজ অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে সামান্য অশোভন আচরণের ওপরেও অগ্নিশর্ম্মা ও খড়্গহস্ত হ'য়ে থাকে, সেই সমাজই পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে শতগুণ অসংযমকেও দেখেও দেখে না। অসংযম যদি পাপ হয় তবে রুগ্ন স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বছর বছর রুগ্ন সন্তানের জন্ম দেওয়াটা কেন কেউই পাপ মনে করে না! এরূপ সন্তানের জন্মদাতাকে কেন আমরা একঘরে করি না? অবিবাহিত অবস্থায় অমিতাচারে যতখানি স্বাস্থ্যহানি হয়, পুরোহিতের দুটো মন্ত্র উচ্চারণের পরই কি সে অসংযম মিতাচারের পরাকাষ্ঠা হ'য়ে দাঁড়ায়?...তাছাড়া, যদি স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াটাই অসংযত জীবনের হেয়তার একটা মস্ত হেতু হয় তাহ'লে কি বলা যেতে পারে না যে একটু বুঝে সুঝে চললে নৈতিক শিথিলতা সত্ত্বেও অন্য পাঁচজনের মতনই স্বাস্থ্য বজায় রেখে চলা মোটেই অসম্ভব নয়? তুমি মাতাল ও লম্পটের মধ্যে এ রকম খুব সুস্থ লোক দেখ নি? না, তাহ'লে বলবে যে তাদের অসচ্চরিত্রতা ততটা দোষের নয়? তা যদি বল তাহ'লে ত তুমি আমার কালাপাহাড়িকেও হার মানালে। কাজেই তোমার স্বীকার না ক'রেই উপায় নেই যে নৈতিক শিথিলতার বাড়াবাড়িটা physical দিক্ দিয়েও দুষ্য হ'লেও এ শৈথিল্যের কুফল সম্বন্ধে সেইটেই চরম যুক্তি নয়। আসল কথা—মন নিয়ে, ও সেইটেই হওয়া উচিত। কারণ আদর্শ হিসেবেও দেহের চেয়ে যে মনের স্থান উচ্চে এটা 'কাল্‌চারে'র গোড়াকার কথা।"

পল্লব চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বল্‌ল: "তা বটে।" তার পায়ের নীচে যেন সে মাটির নাগাল পাচ্ছিল না। তার অনেকদিনের যত্নপুষ্ট অনড় ধারণাগুলির ভিত্তি আজ টল্‌মল করে ওঠাতে সে ভেবেই পাচ্ছিল না মোহনলালের যুক্তিগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে।

মোহনলাল বল্‌ল: "তাহ'লেই দেখ, যাকে আমরা immoraliity বলি সেটা সত্য সত্য অন্যায় হ'তে পারে যদি তার দরুণ আমাদের মনের ওপর একটা বিশ্রী ছাপ পড়ে। কারণ প্রতি আচরণ আমাদের মনের গায়ে কি ভাবে রঙ ফলায় তার ওপরেই তার ভালমন্দ নির্ভর করা উচিত।... একথা যদি অস্বীকার না কর তাহ'লে আমি যা বলছিলাম সেটার সমর্থও বুঝতে পারবে। দেখ না কেন, যাকে আমরা নৈতিক স্খলন বলি সেটা দূষণীয় হ'য়ে দাঁড়ায় প্রধানতঃ লোকমতের প্রভাবে, নয় কি? এটা হ'য়ে দাঁড়ায় এই জন্যে যে সচরাচর মানুষের সুনীতি-দুর্নীতির ধারণা, উচিত-অনুচিতের বিচার—এক কথায় জীবনের মোটা outlookটি—গড়ে ওঠে তার নিজের সমাজের লোকমতের প্রভাবে। এখন আমাদের দেশে sex সম্বন্ধে আমাদের সমাজের লোকমতের প্রভাব কি রকম ভাবে পরিণতি লাভ করেছে একটু ভেবে দেখ। Sex সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নীতি এসব দেশের চেয়ে ঢের বেশি অনুসৃত হ'য়ে থাকে ও পান থেকে চুণ খস্‌লে লোকমত ঢের বেশি রক্তচক্ষু হ'য়ে ওঠে। সুতরাং সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় স্খলিত হ'লে সেটা ঢাক্‌বার জন্য অম্লানবদনে মিথ্যা বলে, নিঃসঙ্কোচে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয় ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে একটা পদস্খলনের জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তির বা নৈতিক স্বাস্থ্যের যতখানি হানি হয়, এই সদাসন্ত্রস্ত ভাব ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার মুখোষ পরে থাকার দরুণ তার চেয়ে ঢের বেশি নৈতিক অবনতি হয়। কিন্তু য়ুরোপের লোকমত এ বিষয়ে ঢের বেশী সহিষ্ণু ব'লে নৈতিক স্খলনের জন্য তাদের আমাদের মতন ভীতত্রস্ত হ'য়ে কাল কাটাতে হয় না। একজন শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয়ের নৈতিক স্খলনে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর নৈতিক স্খলনের চেয়ে কম অপকার হয়—এই কারণে। এই কথাটি বুঝলে আমরা য়ুরোপীয়দের নৈতিক শিথিলতাকে অনেকটা ঠিক্ চোখে দেখতে পারতাম ব'লে মনে হয়। আমার মনে আছে আমি একদিন ভারি আঘাত পেয়েছিলাম যখন আমার এক শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সতীর্থ আমাকে নিঃসঙ্কোচে আন্তরিক ভাবে বলেছিলেন যে মেয়েদের সঙ্গে flirt করা—যেমন তাদের চুম্বন করা প্রভৃতি—তিনি সত্যিই অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু পরে মনে হয়েছে যে তিনি মূলতঃ খুব অন্যায় কথা বলেন নি।"

পল্লব আদর্শস্থানীয় বন্ধু মোহনলালের মুখে এতটা বাড়াবাড়ি রকমের নির্লজ্জ উক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার কর্ণমূল আরক্ত হ'য়ে উঠল। সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল: "মোহনলাল...একথাও কি আমাকে...তোমার মতে...মেনে নিতে..." সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌ল: "পল্লব, আমার মতন গোঁড়া puritanও যে আজ নিঃসঙ্কোচে এরূপ মতামত প্রকাশ করছে এটা তোমার আশ্চর্য্য ঠেকতে পারে সন্দেহ নেই। তবে...তবে..." ব'লে সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌ল: "মনে কোরো না যে আমি নিজে আজ জড়িয়ে পড়েছি ব'লেই এমন সব উচ্ছৃঙ্খলতার ওকালতি করতে চেষ্টা পাচ্ছি। কারণ বিশ্বাস কর যে আমার এসব মতামত মিস স্মিথের প্রতি আসক্ত হবার অনেক আগেই আমার মনের মধ্যে গ'ড়ে উঠছিল। কাজেই তুমি আমাকে ভুল বুঝবে যদি মনে কর যে এসব যুক্তিপ্রয়োগ আমার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ভেবে দেখলে হয় ত তুমি আমার আজকের কথাগুলির মর্ম্মার্থ ধরতে পারবে। ভেবে দেখ, কুঙ্কুমের বা স্বর্ণেন্দুর দু-একটা পদস্খলন হ'লে তাদের হঠাৎ যেভাবে নিরবলম্বন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, আমার ইংরাজ বন্ধুটির সেরকম কোনও পদস্খলনে কি সেরূপভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে? পারে না ত? কিন্তু কেন পারে না সেটা ভেবে দেখেছ কি?—পারে না এইজন্য যে নৈতিক পবিত্রতার কাম্যতা সম্বন্ধে তার ধারণা কুঙ্কুম বা স্বর্ণেন্দুর মতন দৃঢ় নয়।.....তাছাড়া শুধু সে ছেলেটি ব'লে বলছি না, এদেশে সর্ব্ববিষয়ে উচ্চহৃদয় বুদ্ধিমান্ যুবকের ক্ষেত্রেও এরূপ ছচারটে পদস্খলনকে লোকমত ধর্ত্তব্য ব'লেই মনে করে না। বর্ত্তমান সময়ের একজন মস্ত চিন্তাশীল ইংরাজ লিখেছেন যে যেখানে একজন যুবক ও যুবতী বিবাহ না ক'রেও মিলিত হয় সেখানে সমাজের ন্যায়তঃ কিছুই বলবার থাকতে পারে না যদি তার পরিণামে সন্তান সম্ভাবনা নিবারণ করা যায়। আর একজন মস্ত ফরাসী লেখক লিখেছেন যে শক্তিমান্ হৃদয়ের কাছে পদস্খলন ব'লে কোনও কিছু থাকতেই পারে না। এরকম

দৃষ্টতঃ নীতিমূলক নীতি এদের আরও অনেক বড় বড় লোকের লেখা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। তাই এটা একটা সত্যি কথা যে এদের শ্রেষ্ঠ মনেরও আজকাল মনোগত বিশ্বাসটা অনেকটা এইরকমই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণের ত কথাই নেই। সাধারণের মধ্যে flirtation সম্বন্ধে কিরূপ শিথিল ধারণা প্রচলিত সে সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিতা একটি ধনী উচ্চশিক্ষিতা ফরাসী বিধবা একদিন আমার সাম্‌নে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে ঠাট্টা করে বল্‌ছিলেন যে সে যখন স্কুলে পড়ত তখন থেকে সে flirtation রূপ প্রথাটির একটু বেশি পক্ষপাতী ছিল। ভাব ত আমাদের দেশে কোনও মার মুখে ছেলের সম্বন্ধে এরকম ঠাট্টা কেমন শোনায়! এদেশে কিন্তু মা ছেলেকে, ভাই বোনকে ও বাপ মেয়েকেও flirt ব'লে ঠাট্টা করতে কুণ্ঠিত হয় না। এসব ধরণ-ধারণই এদের এ সম্বন্ধে মূল ধারণাটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না কি? অর্থাৎ এরা যাদের শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে তাদেরও flirt করতে দেখ্‌লে বিশেষ ত্রস্ত বা লজ্জিত হয় না। কারণ এরা ভাবে এটা যৌবনের ধর্ম্ম—বেশীদূর না গড়ালে এতে বেদ অশুদ্ধ হয় না। আর আমরা? আমরা নৈতিক পবিত্রতা হারালে ভাবি বুঝি সব গেল। (এখানে অবশ্য আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনের outlookএর কথাই বল্‌ছি মনে রেখো, কারণ প্রতি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার জনসাধারণের সম্পত্তি বলে আমি বিশ্বাস করি না। সব বড় জিনিষই অন্ততঃ আজ অবধি মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারাই উপলব্ধ হয়ে এসেছে।) যাক্‌ সে কথা। যা বল্‌ছিলাম। আমাদের শ্রেষ্ঠ ছেলেরা বাল্যকাল থেকে সময়ে অসময়ে শুন্‌তে শুন্‌তে শেষটা নৈতিক পবিত্রতার অত্যন্ত বেশিরকম মূল্য ধার্য্য না ক'রেই পারে না। কিন্তু মূল্য ধার্য্য করা এক আর মূল্য দিতে পারা আর। কাজে কাজেই ছেলেবেলা থেকে দেশে প্রলোভন ও সুযোগের অভাবে অনেক সময়েই হয় এই যে আমরা কায়ক্লেশে দৈহিক পবিত্রতাটি মাত্র বজায় রেখে আসি। কিন্তু পরীক্ষাশুদ্ধি না হ'লে মানুষ নিজেকে চিন্‌তে পারে না। তাই বরাবর নিজেকে একরকম ভেবে এসে যখন হঠাৎ কোনও প্রলোভনের মধ্যে প'ড়ে টাল সাম্‌লাতে না পারি তখন ভাঙাহাল নৌকার মতনই দিশেহারা হ'য়ে পড়ি।"

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বল্‌ল: "অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে এরা পড়ে না?"

মোহনলাল বল্‌ল: ঐ যে বল্‌লাম সচরাচর সুস্থ শক্তিমান লোকে পড়ে না, এবং না-পড়ার কারণও খুব স্পষ্ট। অর্থাৎ, এরা পবিত্রতার আদর্শকে প্রথম হতে এত উঁচুতে তুলে ধ'রে থাকে না ব'লে এ সব পতনকে প্রথম থেকেই অনেকটা অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে ক'রে থাকে; তার জন্য নিজের জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দেয় না। উদাহরণতঃ দেখ এদের বড় বড় লেখক, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতকার প্রভৃতি কেউই প্রায় অল্পবয়সে দুর্নীতির কবল হ'তে রক্ষা পান নি, অথচ সেজন্য এখানকার লোকমত তাঁদের ভ্রমেও দোষ দেয় না। আর আমরা? আমরা সাধু মহাত্মারও যৌবনের দোষ ত্রুটির খোঁজ পাবার জন্য কি উৎসুকই না হয়ে থাকি! এবং তাদের কোনও দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তির সন্ধান পেলে তা নিয়ে কায়মনোবাক্যে কি আনন্দেই না চর্চ্চা করি! এক কথায় এদেশে ও আমাদের দেশে লোকমত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের।"

পল্লব বল্‌ল: "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে এই রকমের লোকমতই বাঞ্ছনীয়? পবিত্রতার কোনই দাম নেই?"

মোহনলাল বল্‌ল: "সে কথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে চাই না। কারণ আমি ত খানিক আগেই বল্‌লাম যে দেহে ও মনে পবিত্র হ'তে পারাটা একটা মস্ত জিনিষ যদিও মনে পবিত্র থাকতে পারার চেয়ে কঠিন কাজ সংসারে অতি কমই আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আদর্শ চিত্তশুদ্ধি যখন সব দেশেই এত একান্তভাবে বিরল তখন এ তর্ক নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটির কি দরকার? জীবনকে নির্ভয়ে দেখ্‌তে শিখ্‌লে তবেই সত্যের দর্শন মেলে, নইলে নয়। এরা জীবনকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছে—অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগে। তার ফলও এরা হাতে হাতে পেয়েছে। নইলে যদি এদের সভ্যতা সত্যসত্যই মহা অসচ্চরিত্রতার পরিপোষক ও আমাদের সভ্যতা মহা আধ্যাত্মিকতার জন্মদাতা হয় তাহ'লে আজ জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মজগতে

এদের ও আমাদের মধ্যে এত বড় একটা ব্যবধান কেমন ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌ল এটাও কি একটা ভাব্‌বার বিষয় নয়? এই সব কথা গত দুতিনবছর ধ'রে আমার মনে জমে উঠেছে। তাই আমি আজ এদের নৈতিক ধারণার স্বপক্ষে কি কি বল্‌বার আছে সে সম্বন্ধে তোমায় এতক্ষণ ধ'রে লেকচার দিলাম। কিছু মনে কোরো না পল্লব।

"আমাদের সভ্যতা বা outlookকে যে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য হতেই পারে না তা তোমার চেয়ে বেশি কেউই জানে না। তবে কি জান? আমরা কথায় কথায় য়ুরোপকে দুর্নীতির আঁস্তাকুড় ও আমাদের দেশকে আধ্যাত্মিকতার একমাত্র নিকেতন ব'লে প্রচার ক'রে থাকি। এরূপ আত্মম্ভরিতা যে বস্তুতঃ কত অসার ও হাস্যকর সেইটেই আজ আমার নিজের পদস্খলনের প্রসঙ্গে একটু বেরিয়ে পড়ল।"

মোহনলাল আশৈশব পুরুষকারবাদী ছিল। তাই আজ বার বার তার মুখে 'নিয়তি', 'পদস্খলন', 'মোহের গর্ত্ত' প্রভৃতি নিরাশার বাণী শুন্‌তে শুন্‌তে পল্লবের মনে হঠাৎ একটা সন্দেহের উদয় হ'ল। কিন্তু সে কথা সে মুখে আন্‌তে পারল না।...'না, না তা কখনও হ'তে পারে? মোহনলালের মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচক, চরিত্রবান্‌ ছেলের পক্ষে?...অসম্ভব।"

তবু সে না ব'লে থাকতে পারল না: "মোহনলাল, যে তুমি এত বোঝ, এত ভাব, এত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পটু, সেই তুমি কি না—মাপ কোরো ভাই—মিস স্মিথের মতন একজন অসারচিত্ত সিনেমা-একট্রেসকে বরণ কর্‌লে? তুমি যদি মতিস্থৈর্য্য হারিয়ে তার গুণগানে ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌তে, বা অন্যরকম আবোল তাবোল বকতে তাহ'লেও না-হয় আমি তোমার এ সঙ্কল্পকে অনেকটা বুঝতে পার্‌তাম। কারণ তখন আমার অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা থাকত যে মোহের কুয়াসার মধ্যে প'ড়ে তোমার দিগ্‌ভ্রম হ'য়েছে। কিন্তু সব বুঝে সুঝে সব দেখে শুনে কি না শেষে তুমি—"

মোহনলাল একটু করুণ হেসে বল্‌ল: "ভাই তোমাকে ত একটু আগেই বলেছি যে বোঝা এক ও প্রবৃত্তিকে রুখ্‌তে না পারা আর। তুমি কি খুব বুদ্ধিমান, সহৃদয় লোককেও মাতাল হ'য়ে বর্ব্বরের মতন ব্যবহার করতে দেখ নি? আবার তার পরেই কি তুমি দেখ নি যে নেশা কেটে গেলে অবসাদের গভীর গহ্বরের মধ্যে প'ড়ে সে কি রকম আন্তরিক অনুতপ্ত হয় ও শপথ করে যে জীবনে আর মদ ছোঁবে না? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কি সে আবার এ সব জেনেশুনেও মদ খায় না?"

পল্লব দুঃখিত হ'য়ে বল্‌ল: "তাই মোহনলাল যে তোমার মনের জোর, অধ্যবসায় প্রভৃতি আমাদের আদর্শ ছিল বল্‌লেই হয় সে তোমার মুখে এরকম হতাশ বিলাপ, দুঃখতন্ত্র ও ক্ষুব্ধ অদৃষ্টবাদের কথা শুনব কখনও ভাবি নি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন তুমি সব জেনেশুনেই তোমার অমূল্য জীবনটাকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে উঠেছ।"

মোহনলাল একটু হেসে তখনই আবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ল: "সম্পূর্ণ নষ্ট হবেই একথা মনে স্থির জেনেও কোনও গুরুতর কাজ করা অবশ্য সহজ নয়। কারণ জানত যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ব'লে একটা ভারি শাস্ত্রসম্মত প্রবচন চল্‌তি আছে। তবে আমাদের মতন প্রকৃতির লোকের পক্ষে যে ইংরেজ মেয়ে বিবাহ করার পরিণাম খুব শুভ হবার সম্ভাবনা কম একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না—বিশেষতঃ...বিশেষতঃ...মিস স্মিথের মতন...লঘুচিত্ত...বিলাসপ্রিয়...মেয়েকে বিবাহ কর্‌লে।"

মোহনলালের মুখে এরূপ বিষাদের কথা শুনে পল্লব তার হাতদুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌ল: "এতটা যখন তুমি বুঝেছ তখন আমি তোমার অমূল্য জীবনকে কিছুতেই এভাবে নষ্ট হ'তে দেব না। এদেশে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ হয়। না হয় তার জন্য কিছু জরিমানা হবে ও লোকে নিন্দা কর্‌বে। কিন্তু সেটা দুদিনের কলঙ্ক। একটা জীবন নষ্ট হওয়ার চেয়ে সেটা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। এ বিবাহ তোমাকে ভঙ্গ করতেই হবে।"

মোহনলাল তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর বিষাদের রেশ টেনে এনে বল্‌ল: "এখন আর তা হয় না পল্লব।" ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাহিরের অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মোহনলালের মুখে এরূপ একান্ত হতাশা ও বিষাদের স্বর পল্লব আজ অবধি কখনও শোনে নি। সে এ আর্ত্তস্বরে চমকে একটু উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল:

"নিশ্চয়ই হয়,মোহনলাল ও তাই হবে এ আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি।"

মোহনলাল এবার আর কোনও কথা না ব'লে দুহাতে তার মুখ ঢাকল।

পল্লবের মনে এবার হঠাৎ বিদ্যুতের মতন তার খানিক আগেকার গাঢ় সংশয়টি খেলে গেল।...

তবে কি...সত্যই...তার আশঙ্কা...না, না...মোহনলালের মতন সচ্চরিত্র, সংযমী ছেলের পক্ষে...তা যে কল্পনাতীত!...

কিন্তু সে আর থাক্‌তে পার্‌ল না, আকুল স্বরে মোহনলালকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল: "মোহনলাল...তবে কি...তবে কি...তুমি তাকে..." প্রশ্নটি সমাপ্ত করবার কথা সে খুঁজে পেল না।

মোহনলাল দুই হাতের মধ্যেই মুখ রেখে রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল: "হাঁ তাই...তাই...পল্লব। মুহূর্ত্তের উন্মাদনা আমার সমস্ত জীবনের গতি বদ্‌লে দিয়েছে। এখন মিস স্মিথকে বিবাহ করা ছাড়া আমার আত্মসম্মান বজায় রাখার আর পথ নেই।" (ক্রমশঃ)

গৃহ-চিকিৎসা

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র এম-বি

(২)

রোগে শুশ্রূষা

রোগের চিকিৎসা কার্য্যে বাড়ীর লোকেরা ডাক্তারকে রীতিমতই সাহায্য করিতে পারেন; তবে রোগের লক্ষণগুলি বাড়ীর লোকের আগে জানা থাকিলে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। পাশকরা বা পাকা নার্সের অভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিলে রোগীর রোগ নিরাময়ের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

রোগীর ঘর—রোগীর ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক লোকের জন্য ৮ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া একটি ঘর আবশ্যক। এরূপ ঘরে যে পরিমাণ বায়ু চলাচল করে, সুস্থ লোকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, রোগীর ঘর ইহা অপেক্ষা বড় হওয়া দরকার। ঘরের মেঝে পাকা, অভাবে মাটী দিয়া ভাল করিয়া নিকান হইবে। ঘরে আসবাবপত্র যত কম থাকে ততই ভাল। ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ হইলে, সমস্ত আসবাব, এমন কি দেওয়ালের ছবি পর্য্যন্ত সরান উচিত। সামনাসাম্‌নি দুইটা দরজা বা জানালা থাকিলে খুবই ভাল। রোগীকে তক্তাপোষে বা খাটে শোয়ান ভাল। ঘরের জানালা দিবারাত্রি খোলা রাখিবে; তবে বর্ষার দিনে নয়। রোগীকে গরম কাপড় ঢাকা দিয়া শীতকালেও জানালা খোলা রাখিবে। ঘরে লোকজন যত কম আসে ততই ভাল। রোগীর ঘরে কেরোসিনের আলো না জ্বালাইয়া তৈলের প্রদীপ জ্বালান ভাল। প্রদীপ একটী কাচের লণ্ঠনের ভিতর রাখিলে বাতাসে নিভিবে না। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের সুবিধা অনেক; তবে ইহার তীব্র আলোক অনেক সময় রোগীর চোখে লাগে। তখন হয় নিভাইয়া দেওয়া বা সবুজ কি নীল রঙ্গের কাপড় দিয়া আলোটা ঢাকিয়া দেওয়া ভাল।

রোগীর বিছানা—গরম হওয়া চাই, বিশেষতঃ যখন রোগীকে অনেক দিন রোগ-শয্যায় থাকিতে হয়। তবে বিছানা যেন এরূপ না হয় যে মাঝখানে ঝুলিয়া পড়ে। মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বিছানা তক্তাপোষের ন্যায় সমান এবং শক্ত যায়গায় হইলেই ভাল। অনেক সময় বিছানার নীচে তক্তার ছোট টুকরা দেওয়া হয়, ইহাকে ফ্র্যাকচার বেড (Fracture bed) বলা হয়। ভগ্ন স্থানে পাছে পুনরায় কোনরূপ আঘাত লাগে, অথবা

বিছানা বা কম্বল, লেপের টানাটানিতে রোগীর পাছে কষ্ট হয়, সে জন্য ভগ্ন স্থানের উপর একটা কাঠের বা তারের খাঁচা ঢাকা দিলে তাহার উপর দিয়া লেপ বা কম্বলের নাড়াচাড়ায় কোন কষ্ট হইবে না। ইহাকে বেড্ ক্রেডেল্ (Bed cradle) বলে। শিশুদের বেতের ঝুড়িতে দোলা বিছানা করা যায়। ইহাদের বিছানা নরম হইবে, আর যাহাতে বেশ গরমে থাকিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক সময় বালিশ বেশী নরম হইলে, মাথা নীচে নামিয়া পড়ায়, মুখ গুঁজিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অনেক রোগ আছে যাহার জন্য রোগীকে বহু দিবস বিছানায় নিশ্চল ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়। সেই সময় পীঠের চামড়া, বিশেষতঃ যে সব যায়গার হাড় উঁচু হইয়া আছে, সেই সকল স্থানে শরীরের ভারে ফাটিয়া ঘা হইয়া পড়ে। ইহাকে বেড্‌সোর বা বিছানার ঘা বলে। ইহার প্রতীকার—(১) রোগীকে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়া শোয়ান। আবশ্যক হইলে পীঠে বালিশ দিয়া রোগীকে হেলান দিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া। (২) গায়ের চামড়া একেবারে শুক্‌না রাখা অর্থাৎ ঘাম বা জল যাহাতে না বসে সে দিকে দৃষ্টি রাখা। (৩) প্রত্যহ দুইবার এবং প্রত্যেকবার ভিজিয়া যাইবার পর অল্প স্পিরীট দিয়া ঘষিয়া মুখে মাখিবার পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া। এবং (৪) পীঠের মাপের অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটা ছোট তুলার গদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া বা বাতাসের বা জলের গদি ব্যবহার করা। এই তুলার গদির সেলাই হইবে না; কেবল দুই ভাঁজ কাপড়ের মধ্যে তুলা থাকিবে। এই তুলা খুলিয়া প্রত্যহ পিঁজিয়া দিতে হইবে। যদি একান্ত বেড সোর হইয়া পড়ে, তখন পটাশ পারমাঙ্গানেটের লোসানে লিণ্ট তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে চাপ দিবে। এবং তাহার চারি পাশে পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত স্পিরিট ও পাউডার লাগাইবে। যে সব রোগে মল মূত্রাদির জন্য বার বার বিছানার চাদর না বদলাইলে চলে না, সে সব ক্ষেত্রে ড্রগীট (Draw sheet) ব্যবহার করিলে খুব সুবিধা হয়। রোগীর বিছানার চাদরের উপর প্রথমে এক টুক্‌রা অয়েলক্লথ পাতিবে। সেটা রোগীর পীঠ হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত থাকিলেই চলিবে। পরে তাহার পর একখানা টুক্‌রা বিছানার চাদর পাতিয়া তবে রোগীকে শোয়াইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে একমাত্র ড্রগীট ছাড়া রোগীর বিছানা ভিজিবার কোনই আশঙ্কা থাকিবে না। ফলে রোগীর পীঠও ভিজিতে পাইবে না, তাহাকে বার বার নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন হইবে না। রোগীকে একটু তুলিয়া ধরিলে আর একজন চট্ করিয়া ভেজা ড্রগীটখানি সরাইয়া আর একখানি পাতিয়া দিতে পারিবে।

নাড়ী দেখা—কব্জির কাছে রেডিয়াল আর্টরি থাকে। এখানে আঙ্গুল রাখিলে যে স্পন্দন অনুভব করা যায় তাহাকে পাল্‌স্ (pulse) বলেও নাড়ীর প্রতি মিনিটে কয়বার স্পন্দন হয়, তাহাই সচরাচর দেখা হয়। আবার নাড়ী আছে কি না ইহাও দেখিবার বিষয়। জ্বরে, পরিশ্রমে ও মানসিক উদ্বেগে ও উত্তেজনায় নাড়ীর গতি দ্রুত হইতে পারে।

জ্বর দেখা—গায়ে হাত দিলেই বুঝা যায় গা গরম হইয়াছে কি না। তবে গরমের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জ্বরের কাঠী বা থার্ম্মমিটার (Thermometer) ব্যবহার করিতে হয়। ইহা একটা কাচের নল বিশেষ। ইহার উপর ছোট বড় দুই রকম দাগ কাটা আছে এবং একটি তীর অঙ্কিত আছে। বড় দাগগুলার নিকট একটি করিয়া সংখ্যা আছে; যথা ৯৮, ৯৯, ১০০ ইত্যাদি। দুটি বড় দাগের মাঝখানে ৪টি ছোট দাঁড়ি আছে। বড় দাগগুলিকে ডিগ্রি বলে। এই ডিগ্রি ১০ পয়েণ্টে বা বিন্দুতে বিভক্ত। প্রত্যেক ছোট দাঁড়ি ২ পয়েণ্ট করিয়া হিসাব করিতে হয়। থার্ম্মমিটারের এক দিকে কিছু পারা আছে। উত্তাপ লাগিলেই সেই পারা নলের ভিতরের সরু ছিদ্র দিয়া উপরে উঠিতে থাকে; এবং যে দাগের কাছে গিয়া থামিয়া যায় সেই দাগ দেখিলেই বুঝা যায়, জ্বর কত ডিগ্রী এবং কত পয়েণ্ট। গায়ের সাধারণ উত্তাপ তীরের নিকট। ইহা ৯৮ এবং ৯৯এর মাঝখানে অতএব ৯৮·৪। পারা ইহার উপরে যাইলে জ্বর এবং নিম্নে থাকিলে বুঝিতে হইবে বিজ্বর অবস্থা। এই উপায়ে জ্বর ঠিক করিতে হইলে যন্ত্রটি রোগীর জিভের নীচে অথবা বগলে দিতে হয়। কতক্ষণ সময় দিতে হইবে তাহা থার্ম্মমিটারের গায়ে লেখা থাকে। বাজারে আধ হইতে ৫ মিনিটের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথমে যন্ত্রটি নাড়িয়া দেখিতে হইবে যেন পারা নীচে থাকে; অর্থাৎ ৯৬এর নীচে।

রোগীর বগলে ঘাম থাকিলে তাহা মুছাইয়া তবে থার্ম্মমিটার দিবে এবং দেখিবে যেন চাপ বেশী বা অসমান না হয় এবং সমুদায় পারার ভাগটা যেন বগলে চাপা পড়ে। মুখ হইতে বগলের উত্তাপ আধ ডিগ্রি কম; অর্থাৎ মুখে যদি ৯৯ হয় বগলে তখন ৯৮.৪ বা নর্ম্মাল (normal) বা সাধারণ তাপ। বগলে বা মুখে দিবার পর থার্ম্মমিটার ধুইয়া রাখিবে বা কার্ব্বলিক লোসানে পুঁছিয়া লইবে।

নিঃশ্বাস গণনা করা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পূর্ণবয়স্ক লোক মিনিটে ১৪—১৮ বার এবং সদ্যোজাত শিশু মিনিটে ইহার দ্বিগুণ নিঃশ্বাস ফেলে। ঘড়ি দেখিয়া প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাসের সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে পড়িতেছে, কি নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাতাসের অক্সিজেন আমাদের শরীরে গিয়া কাজ করিতেছে কি না, তাহা জানিবার সহজ উপায় আঙ্গুলের নখের দিকে লক্ষ্য রাখা। সহজ অবস্থায় ইহার রং গোলাপী। কোনও কারণে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করিতে না পাইলে নখের রং ক্রমশ পাংশুবর্ণ ধারণ করিবে।

রোগীর ঘুম—রোগীর ঘুমের কোন ঠিক নাই। একবার ঘুম আসিলে তাহাকে জাগান উচিত নহে, এমন কি ঔষধ খাওয়াইবার জন্যও নহে। রাত্রে ঘুম হয় কি না সে বিষয়ে খবর রাখা দরকার। রোগীর ঘরে দুই একজন বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া বাহিরের লোকজনের আসা বন্ধ করা উচিত এবং বেশী কথা কহাইয়া রোগীকে ক্লান্ত করা উচিত নহে। রাত্রে ঘুম না হওয়া, ভুল বকা, বিছানা হইতে উঠিয়া পড়া বা চম্‌কাইয়া উঠা ইত্যাদি, জ্বরের সময় এই সব উপসর্গ হইলে, বিশেষতঃ বেশি জ্বরে ভুল বকিলে, ঠাণ্ডা জলে রোগীর মাথা ধুইয়া দিলে বা কপালে জলপটি অথবা আবশ্যক হইলে বরফ দিলে উপশম হয়।

মল মূত্রাদি পরীক্ষা—দিনে কতবার, রং ও পরিমাণ, এই সব সাধারণ খবর রাখা আবশ্যক। মলে রক্ত, আম বা ক্রীমি আছে কি না, রক্ত মলের সহিত মিশ্রিত থাকে বা মলত্যাগের পর পড়ে, ইহা জানা দরকার। মূত্র দিনে রাতে কয়বার হয়, রাত্রে মূত্র ত্যাগের জন্য ঘুম হইতে কয়বার জাগিতে হয় ও ২৪ ঘণ্টায় মূত্রের কি পরিমাণ তাহা জানা কর্ত্তব্য।

কাশি ও কফ—কাশি কোন সময় বেশি হয়, শুইয়া থাকিলে বা পাশ ফিরিলে হয় কি না জানার প্রয়োজন। অল্প কাশিলেই কফ উঠে কিনা অথবা প্রত্যেক কাশির চেষ্টার সহিত কফ পড়ে কি না, কফে রক্ত আছে কি না এবং সে রক্তের কি রং, অর্থাৎ টক্‌টকে লাল বা কালচে, আর ফেণাযুক্ত কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। কাশির জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিতেছে কি না তাহা জানা দরকার।

রোগীর স্নান।—তিন প্রকার (ক) কেবল-মাত্র গা মুছাইয়া দেওয়া—যাহাকে ইংরাজীতে স্পঞ্জ (sponge) করা বলে।

(খ) সাধারণ স্নান।

(গ) রোগবিশেষে ঠাণ্ডা বা বরফ জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর আপাদ মস্তক জড়াইয়া দেওয়া। ইহাকে ইংরাজীতে ওয়েট প্যাক (wet pack) বলে। স্নান করাইতে গেলে বিছানায় একটা অয়েল ক্লথ পাতিয়া লইবে। ইহাতে বিছানা ভিজিতে পাইবে না।

(ক) এমন কোন রোগই নাই যাহাতে এক দিন অন্তর রোগীকে গা মুছাইয়া না দেওয়া যায়। নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবস্থা করিবে।

(১) ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে।

(২) সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন।

(৩) সমান পরিমাণে গরম ও ঠাণ্ডা জল লইবে।

(৪) মাথায় দিবার জন্য একঘটী ঠাণ্ডা জল রাখিবে।

(৫) দুইখানা তোয়ালে বা গামছা যোগাড় করিয়া রাখিবে।

এককালীন এক একটি মাত্র অঙ্গ মুছাইয়া দিবে; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকিয়া দিবে; পুনরায় আর একটি অঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিবে।

(৬) কাঁচা পাকা জলে গামছা বা তোয়ালে আধ নিঙ্গড়াইয়া একজন রোগীর গা মুছাইবে এবং অপর একজন অপর একখানা শুক্‌না গামছা বা তোয়ালে দিয়া সেই ভিজা স্থান মুছাইয়া দিবে।

(৭) যাহাতে রোগীকে বার বার নাড়াচাড়া না করিতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে পর পর মুখ, দুই হাত, বুক, পেট, দুই পা মুছাইবে। শেষে রোগীকে এক পাশ করিয়া তাহার পিঠের

মিলন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য্য—অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দিক মুছাইয়া দিবে ; আর এই সুযোগে রোগীর বিছানার চাদর বদলাইয়া লইবে। ময়লা চাদর লম্বাভাবে রোগীর পিঠ পর্য্যন্ত গুটাইবে এবং সেই স্থানে শুকনা চাদর পাতিবে ; পরে রোগীকে চিৎ করিয়া দিলে গুটান ময়লা চাদর বাহির করিয়া দিবে এবং পরিষ্কার চাদর টানিয়া ঠিক করিয়া দিবে। অন্য সময়েও এইরূপে চাদর বদলান যায়।

(৮) রোগীর মাথায় কখনও গরম জল দিবে না। ঠাণ্ডা জলে গামছা নিঙ্গড়াইয়া মুছাইয়া দিবে।

(৯) স্নানের পর রোগীকে একটি জামা পরাইয়া দিবে। জামা এইরূপ হওয়া দরকার, যেন পরাইতে খুলিতে কোন কষ্ট না হয়।

(১০) স্নানের ১৫ মিনিট পরে একটা জানলা পরে অপর জানালা ও দরজা খুলিয়া দিবে।

স্নানের বা গা মুছাইবার জল সহ্যমত গরম হইলেই চলিবে। ঠাণ্ডা জল কল, পাতকুয়া বা পুষ্করিণীর হইলেই ভাল। ডাক্তারের পরামর্শ না লইয়া বরফ জলে স্নান বা ভিজা কাপড় জড়ান অনুচিত। বহুকাল স্থায়ী জ্বর ছাড়িবার ১০ দিনের পর রোগীকে পূরা ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইবে। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে গরম জলের সহিত ঠাণ্ডা জলের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বাড়াইতে হইবে।

হাত পা টেপা বা মাসাজ্ (massage)।—সময়-বিশেষে ইহা পরম উপকারী। হাত পা টেপার নানা পদ্ধতি আছে ; যথা—(১) এফ্লিউরাজ (Eppleurage) হাতের তালুর সাহায্যে একদিকে মালিষ করা অর্থাৎ উপর হইতে নীচে অথবা নীচে হইতে উপর দিকে ধীরে ধীরে যাইবে।

(২) পেট্রিসাজ (Petrissage) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ছোট ছোট চিমটী কাটা।

(৩) তাপোত্‌মাঁ (Tapotement) ধীরে ধীরে মুষ্টী মারা।

প্রত্যেক পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য স্থানবিশেষের রক্ত চলাচলের সাহায্য করা। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা বিধেয়। যে কোন প্রকারের মাসাজের প্রয়োজন হউক না কেন, ধীরে ধীরে করিতে হইবে। হাতে সরিষার তেল (সহ্য না হইলে অলিভ্ অয়েল) লাগাইয়া লইলে ভাল হয়। উপর হইতে নীচে আসিবার সময় জোরে এবং নীচে হইতে উপরে যাইবার সময় মৃদু চাপ দিবে।

তৃষ্ণা।—রোগীর জ্বরভোগের সময় তৃষ্ণা একটী প্রধান লক্ষণ। ডাক্তারের নিষেধ না থাকিলে ইচ্ছামত রোগীকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে। জলে তৃষ্ণা না যাইলে জলে নেবুর রস মিশাইয়া খাইতে দিলে তৃষ্ণার অনেকটা উপশম হয়। যাহাদের ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অস্ত্র করা হয়, তাহারা জ্ঞান হইবার সময় বিশেষ তৃষ্ণা অনুভব করে। এই সময় কেবল বরফ চুষিতে দিবে। অভাবে ঈষৎ গরম জল অল্প অল্প খাইতে দিলে তৃষ্ণার লাঘব হয়।

রোগীকে খাওয়ান।—রোগীকে অনেক প্রকারে খাওয়ান যাইতে পারে—(ক) মুখের সাহায্যে (খ) নাকের ভিতর নল দিয়া (গ) মল দ্বার দিয়া (ডুস—douche দিবার মতন করিয়া)। কেবলমাত্র প্রথমোক্ত উপায়েই রোগীকে খাওয়াইবে। অপর দুইটি উপায়ে খাওয়ানর প্রয়োজন হইলে একমাত্র ডাক্তারই ব্যবস্থা করিবেন। অনেক সময় রোগী চিৎ হইয়া খাইতে পারে না। তখন হয় ঘাড় একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া অথবা পাশ ফিরাইয়া নলযুক্ত বাটী বা ফিডিং কাপের (Feeding cup) সাহায্যে খাওয়াইয়া দিবে। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে এক-মাত্র তরল পদার্থই, যেমন দুধ—রোগীকে খাওয়ান সম্ভব। অজ্ঞান অবস্থায় রোগী খাইতে পারে না। সে সময় খাদ্যাদি মুখে আটকাইয়া থাকে ; এরূপ ক্ষেত্রে নাসিকা অল্প টিপিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করাইলে রোগী খাদ্য গিলিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেকবার অল্প পরিমাণে ঝিনুক বা ছোট চামচের সাহায্যে অল্প অল্প করিয়া রোগীকে আহার করাইবে।

রোগীর পথ্য।—জল, বার্লীর জল, সাবু, শটি, ছানার জল, ঘোল, অণ্ডলালের জল বা এলবুমেন ওয়াটার (albumen water), দুধ, ফিকা চা, এগ্‌ফিলিপ্ (eggfillip) চিঁড়ার বা খইয়ের মণ্ড ইত্যাদিই রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) জল—ঠাণ্ডা জলই ব্যবহার করিবে ; আবশ্যক হইলে অল্প গরম জলও দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) বার্লীর জল—চায়ের চামচের এক চামচ গুঁড়া বার্লী সেই পরিমাণে ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া কাদার মত

করিবে। আধসের আন্দাজ জল ফুটাইয়া তাহাতে সেই কাদার মত বার্লী অল্প অল্প করিয়া মিশাইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। মিশানোর পর ৫ মিনিট কাল ফুটাইয়াই নামাইয়া লইবে, তাহার পর ছাঁকিয়া রুচিমত লেবুর রস ও নুন অথবা চিনি বা মিছরী দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। দানা বা পার্ল বার্লীর বেলা ১ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রোগীর পথ্য বার্লীর জল তৈয়ার হইবে।

(গ) সাবু, শটী—খোরের ন্যায় এক ঘণ্টা কাল ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

(ঘ) ছানার জল—এক পোয়া দুধ গরম করিবে। দুধ ফুটিলে তাহাতে আধখানা পাতী লেবুর রস দিবে। দেখিবে দুধ ছিঁড়িয়া ছানা এবং জল আলাদা হইয়া গিয়াছে। এই জল ছাঁকিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিবে।

(ঙ) ঘোল—ভাল চিনিপাতা দই ঘরে পাতিয়া লইবে। অভাবে বিশ্বস্ত দোকান হইতে এক ছটাক দই আনিলেও চলিবে। এক পোয়া জলে অল্প অল্প মিশাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। নাড়িবার কল থাকিলে তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব সমান ভাবে মিশিয়া গেলে ছাঁকিয়া লইয়া রোগীর রুচি অনুযায়ী চিনি অথবা নুন ও লেবু দিয়া খাইতে দিবে।

(চ) দুগ্ধ—রোগীর পেটের কোন গোল না থাকিলে অধিকাংশ রোগেরই পথ্য দুধ। দুধ জ্বাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে এবং সহজ অবস্থায় খাওয়া অভ্যাস না থাকিলে বার্লী শটী বা সাবু আধা আধা অথবা এক ভাগ দুধ দুই ভাগ বার্লী শটী বা সাবু মিশাইয়া লইবে। ছোট ছেলেদের পেটের অসুখে অনেক সময় একটু করিয়া চুণের জল মিশাইয়া দিতে হয়। এক ছটাক দুধে ছোট চামচের এক চামচ বা ৬০ ফোঁটা চুণের জল দিলেই যথেষ্ট।

(ছ) আলবুমেনের জল (albumen water)

একটি ডিমের সাদা অংশটি লইয়া একছটাক ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশাইবে। ইহা সহজে জলের সঙ্গে মিশে না বলিয়া এক বড় চামচের সাহায্যে ঘনঘন নাড়িতে হয়। যখন দুধের ন্যায় সমান ভাবে মিশিয়া যাইবে, তখন আর একটু জল দিয়া পুনরায় নাড়িতে থাকিবে। এই রকম করিয়া একপোয়া পর্য্যন্ত জল মিশাইতে হইবে। পরে উহা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে প্রত্যহ দুইটী ডিমের জল দেওয়া যাইতে পারে।

(জ) ফিকা চা—ফুটন্ত জলে প্রয়োজন মত চা দিয়া মাত্র ৫ মিনিটকাল রাখিলেই যথেষ্ট। ঠাণ্ডা চা পুনরায় গরম করিয়া খাওয়া অথবা বেশীক্ষণ ফুটান চা রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর। একবার, অথবা সহজ অবস্থায় অনেকবার খাওয়া অভ্যাস থাকিলে দুইবার এইরূপ চা দেওয়া যাইতে পারে।

(ঝ) এগ্‌ফিলিপ (Eggfillip)—একটা ডিমের হলদে অংশটি লইবে। এক ছটাক গরম দুধের সহিত তাহা মিশাইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। পুনরায় আর এক ছটাক দুধ ইহাতে মিশাইয়া নাড়িবে। এইরূপে মোট এক পোওয়া দুধ দিবে। পরে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ছোট চামচের এক চামচ ব্রাণ্ডি মিশাইবে, সুবাসিত করিবার প্রয়োজন হইলে ইহাতে জায়ফল ঘষা জল দুই ফোঁটা ফেলিয়া দিবে। রোগীকে প্রত্যহ দুইটী পর্য্যন্ত ডিম দেওয়া যাইতে পারে।

(ঞ) চিড়ার মণ্ড—ভাল চিঁড়া এক ঘণ্টাকাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। খুব নরম হইয়া গেলে একটি পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। কাথের ন্যায় যাহা বাহির হইবে তাহাকে পুনরায় সমান করিয়া মাখিয়া লইবে এবং রুচি অনুসারে মাছের ঝোল নুন ও লেবু দিয়া খাইতে দিবে।

(ট) খইয়ের মণ্ড—ধান বাছিয়া চিঁড়ার ন্যায় খই ভিজাইতে হয়। ৫।১০ মিনিটের মধ্যে খই নরম হইয়া যায়। তাহার পর চিঁড়ার মণ্ডের ন্যায় তৈয়ার করিবে এবং তদনুরূপ খাইতে দিবে।

(ঠ) শটি তৈয়ার করিবার নিয়ম বার্লীর অনুরূপ। ইহা এক প্রকার মূল। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। বাজারে তৈয়ারি জিনিষ বিক্রয় হয়। দেখিতে গুঁড়া বার্লীর ন্যায় সাদা। ইহা বার্লী বা সাবুর মত পুষ্টিকর, বলকারক এবং পরিমাণ বিশেষে শিশুদের মলরোধক। ইহা সব সময়েই দেওয়া চলে। ইহাতে দুধ মিশাইয়া রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। দুধ চিনি দিয়া শটি জ্বাল দিয়া পাত্রটি ঠাণ্ডা জলে রাখিলে শটি জমিয়া যায়। তখন বরফির মতন কাটিয়া রোগীর সুস্বাদু পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণ দেশী ও বিলাতী ওজন ও মাপ।

৬০ ফোঁটায় এক ড্রাম বা ছোট চায়ের চামচের এক চামচ
৮ চামচে এক আউন্স বা প্রায় আধ ছটাক
১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড বা প্রায় আধ সের
২ পাউণ্ডে প্রায় এক সের

কতকগুলা সাধারণ ঔষধ ও ব্যবস্থা এবং তাহার ব্যবহার

আইডিনের জল—এক ড্রাম টিংচার আইডিন আধ সের ফুটন্ত জলে মিশাইলে আইডিনের জল প্রস্তুত হইবে। ইহা ঘা ধোয়াইবার সময় ব্যবহৃত হয়।

বোরিকের জল—দুই ড্রাম বোরিক এসিড ফুটন্ত জলে অল্প অল্প করিয়া মিশাইয়া নাড়িতে থাকিবে। বেশ যখন গলিয়া মিশিয়া যাইবে, তখন সেই জল ব্যবহার করিবে। চোখ ধোয়াইবার সময় এই জল ব্যবহৃত হয়।

"বেলেস্তারা" বা ব্লিষ্টার—(Blister) যে সব ঔষধ বেদনাযুক্ত বা ফুলা স্থানের রস টানিয়া বাহির করে, তাহার নাম কাউন্টার ইরিট্যাণ্টস্ (Counter irritants)। যেখানে এই ঔষধ লাগান হয়, সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে সেখানে ফোস্কা পড়ে। ভিতরকার রসই এই ফোস্কার জল ; অতএব ইহা ইচ্ছাকৃত। রাই সরিষা (মাষ্টার্ড) গুঁড়া করিয়া ঠাণ্ডা জলে প্রলেপের মতন করিয়া গুলিয়া কাপড়ের বা কাগজের টুকরায় লাগাইয়া ১০ মিনিট-কাল দরকার মতন স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। তাহার পর উঠাইয়া লইবে এবং সেই স্থান মুছিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ফোস্কা হইলে তাহাকে ইংরাজীতে ব্লিষ্টার (Blister) বলে। হাত ধুইয়া ছুঁচ আগুনে পুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে সেই ফোস্কা গালিয়া দিবে। তাহার পর সেইখানে পাউডার ছড়াইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। ক্যান্থেরাইডিজের (Cantharides) বেলেস্তারা এইরূপেই দিতে হয়। কিন্তু বেলেডোনার বেলেস্তারার ব্যবহার অন্যরূপ। ইহা দেখিতে চিঠা গুড়ের ন্যায় এবং কাপড়ে লাগান অবস্থায় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। আবশ্যক মত মাপ লিখিয়া আনাইয়া লইতে হয়, এবং ঈষৎ গরম করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে আটকাইয়া দেওয়া নিয়ম। এইরূপ বেলেস্তারা এক বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে দেওয়া হয়। বেলেস্তারা লাগাইবার তাহার উপর তুলা দিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। স্নান করিবার সময় সেই স্থানটি ভাল করিয়া ঢাকিয়া স্নান করিতে হইবে।

পুল্‌টিস্—ঠাণ্ডা বা গরম ভেদে দুই প্রকার—

(ক) ঠাণ্ডা পুলটিস তোকমারীর দ্বারা তৈয়ার হয়। তোকমারী জলে ভিজাইলে হড়হড়ে ভাব ধারণ করে। সেইটা একটা কাপড়ে লাগাইবে, এবং সেই পটিটা ফোড়ার উপর বসাইয়া দিবে। দিনে একবার বদলাইবে। ইহা যে কোন ফোড়া ফাটাইবার সুবিধা করিয়া দেয়।

(খ) গরম তিসি অথবা মসিনার পুলটিস। কড়ায় অল্প জল দিয়া তিসি অথবা মসিনা বাঁটা ভাজিবে। একটু কাদার মতন হইলে কড়া নাবাইবে। দুই ভাঁজ করা একটা মোটা কাপড়ের এক দিকে গরম তিসি ঢালিয়া অপর ভাঁজ দিয়া ঢাকিয়া তাহা বেদনার স্থানে লাগাইবে। ইহা বেশীক্ষণ গরম থাকে না। তবে দুই ঘণ্টা অন্তর বদলাইলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। নিউমোনিয়ায় বুকের বেদনায় ইহা শুধু উপকারী নহে, পরন্তু আরামদায়ক। ইহা ফোড়ার যন্ত্রণারও বিশেষ উপশম করে।

বোরিক কম্প্রেস্—(Boric compress) ডাক্তারখানা হইতে বোরিক লিণ্ট কিনিয়া আনাইবে (লিণ্ট তুলা জমান মোটা কাপড় বিশেষ)। এই কাপড় আবশ্যক মত এক টুক্‌রা কাটিয়া উহা গামছা বা পাতলা তোয়ালের এক কোণে মুড়িয়া এক পাত্র জলে ডুবাইবে এবং এই জল আগুনে ফুটাইবে। জল ফুটিলেই গামছার খোঁট তুলিয়া দুই দিক ধরিয়া বেশ নিঙ্গড়াইবে, যেন একটুও জল না থাকে। তাহার পর গামছার কোণ হইতে গরম লিণ্ট বাহির করিয়া যে যায়গায় বেদনা সেই যায়গায় লাগাইয়া দিবে। লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা পাণ বা কলাপাতা চাপা দিবে এবং সর্ব্বশেষে তাহার উপর শুকনা তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এই পাণ ও শুকনা তুলা যেন হাতের কাছেই থাকে। ইহা ফোড়া পাকাইয়া তোলে এবং অস্ত্র করার পরও ব্যবহার করা চলে।

তারপীনের সেক—৫ সের ফুটন্ত জলে এক আউন্স তারপিন তেল ঢালিয়া দিবে। একটুকরা ফ্লানেল সেই জলে ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া সেঁক দিবে। সেঁক দিবার সময় ঘর বন্ধ রাখা দরকার। এই প্রক্রিয়ায়

পেট ব্যথা ও ফাঁপার খুব উপকার হয়। অবশ্য জল যতক্ষণ গরম থাকিবে ততক্ষণ সেঁক দেওয়া চলিবে।

গরম বোতলের সেঁক। বোতলে বা রবারের থলের ভিতর গরম জল পুরিয়া ছিপি আঁটিবে। গামছা বা পাতলা তোয়ালে দিয়া গরম জলের বোতলটা মুড়িয়া রোগীর পায়ের তলায়, বুকের কাছে পেটের উপর অথবা যে কোন বেদনার স্থানে লাগাইবে। যখন রোগীকে কেবল গরম রাখাই উদ্দেশ্য, তখন বিছানায় এইরূপ ৩।৪টা গরম জলের বোতল রাখিয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

মাথায় বরফ দেওয়া। আইস ব্যাগ বা বরফ দিবার রবারের থলের মধ্যে বরফ ছোট ছোট টুকরা করিয়া ভরিয়া বাতাস বাহির করিয়া দিয়া থলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি রবারের থলে একটি মাত্র থাকে, তবে রোগীর ঘাড়ের নীচে দেওয়াই উচিত। বলা বাহুল্য, বিছানার উপর একটা অয়েল-ক্লথ পাতিয়া রাখিলে, বরফ জল গলিয়া আর বিছানা বালিশ ভিজিতে পারিবে না। মাঝে মাঝে থলের মুখের চাকৃতি খুলিয়া টিপিয়া থলের ভিতর হইতে বাতাস ও জল বাহির করিয়া দিবে; কারণ, বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে, থলে বাতাসে ফুলিয়া থাকে বলিয়া, বরফ রোগীর ঘাড়ে বা মাথায় লাগিতে পায় না। বরফ ব্যবহার করিবার পর রোগীর মাথা মুছাইবার সময় একবার দেখিয়া লইবে যে ঘাড়ের কাছে জামা বা বিছানা বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে কি না। ভিজিয়া থাকিলে তাহা বদলান আবশ্যক। শরীরের তাপ কমাইবার জন্য বা অল্প জ্বরে ভুল বকার জন্য মাথায় বরফ দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১০৩এর উপর জ্বর উঠিলে বরফ দিবে। অনেক সময় অল্প জ্বরেও রোগী ভুল বকে। সে সময়েও ইহার প্রয়োজন হয়। হিমেটেমেসিস বা পেট হইতে বমির সহিত রক্ত উঠিলে এইরূপ একটা বরফের থলে পেটের উপর বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ক্ষতস্থান ধুইবার ব্যবস্থা। টিংচার আইডিনের জলে বোরিক তুলা ভিজাইয়া তাহার সাহায্যে ক্ষতস্থান ধুইয়া দিবে। তাহার পর ডাক্তারী যে কোন মলম পরিষ্কার কাপড়ে বা লিণ্টে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া বেশ করিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। দুর্গন্ধযুক্ত বা পচা ঘা হইলে এই আইডিনের জলে ক্ষতস্থান আধ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া (জল গরম হওয়া চাই এবং ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পুনরায় গরম জল ও আইডিন দিবে) রাখিবে। পরে মুছাইয়া শুষ্ক করিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। ইহা ঘায়ের দুর্গন্ধ নাশ করিয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভের সহায়তা করে।

কাণের ঔষধ বা ইয়ার্ ড্রপ্ (Ear drop)। গ্লিসারিন চামচে বা ঝিনুকে গরম করিয়া ৪।৫ ফোঁটা কাণে ঢালিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়। ঔষধ দিবার সময় পূর্ণবয়স্ক লোকের মাথা এক পাশে করিয়া কাণটা উপর দিকে এবং শিশুদের পিছন দিকে একটু টানিলেই ঔষধ কাণের মধ্যে অনেক দূর গড়াইয়া যাইবে। পরে কাণে একটু তুলা গুঁজিয়া দিবে।

কুলি করা বা গার্গল (Gargle) পটাশ পারমাঙ্গানেটের কিছু দানা জলে দিলে, জলের রং লাল হয়। সেই জলে কুলি করিলে ঘা-জনিত মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। এক ড্রাম পটাশ পারমাঙ্গানেট একসের জলের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এইরূপে ফট্‌কিরি বা অন্য কোনও দ্রব্যের লোসান করা যায়।

গলায় ঔষধ লাগান। চামচের সাহায্যে জিভ চাপিয়া এবং রোগীকে "আ" বলিতে বলিয়া তুলি করিয়া ঔষধ গলার ভিতর চারিপাশে লাগাইয়া দিবে।

ভেপার (vapour) **বা ভাপ্‌রা লওয়া।** ষ্টোভ্ বা উনুনে জল ফুটিতে থাকিলে তাহাতে এক ড্রাম ইউক্যালিপ্‌টাসের তৈল বা টিংচার বেন্‌জোইন্ ঢালিয়া দিবে। একটা মোটা চাদরে মাথা ঢাকিয়া বা মশারির ভিতর এবং শিশু হইলে তাহার ঢাকার ভিতর নল চালাইয়া দিয়া ভাপ্‌রা দিবে। এই ভাপ্‌রা নাক মুখ দিয়া যত যায় ততই ভাল। কেবল জলের ভাপ্‌রা লইলেও অনেক উপকার হয়। সর্দ্দি, কাসি, স্বরভঙ্গ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রথম অবস্থা। ছেলে বুড়া সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা। ভাপ্‌রা লইবার জন্য লম্বা নল দেওয়া টিনের কেত্‌লি পাওয়া যায়। অভাবে বাড়ীতে চায়ের কেত্‌লির মুখে কাগজের লম্বা নল পাকাইয়া লইলেও হয়।

গ্লিসারিন পিচ্‌কারী। আগে রোগীর পীঠের নীচে অয়েল ক্লথ পাতিবে এবং নিকটেই বেড্-

প্যান (Bed pan) অভাবে কাগজ বা পুরান কাপড় রাখিবে। পরে রোগীকে বামপাশে শোয়াইবে। আধ আউন্স অল্প গরম জলে আধ আউন্স গ্লিসারিণ মিশাইয়া লইয়া তাহা একটা দুই আউন্সের পিচ্‌কারীতে ভরিবে। পরে মলদ্বারে একটু গ্লিসারিন বা সাবান জল মাখাইয়া পিচ্‌কারীর নল প্রবেশ করাইয়া দিবে। মলদ্বারের মুখ ১ মিনিট কাল আঙুল দিয়া চাপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রোগী মলত্যাগ করিবে। অনেক সময় ডাক্তার গ্লিসারিণের সাপোজিটারি (Suppository) (অর্থাৎ গ্লিসারিণ ও মোম মিশ্রিত করিয়া জমান এবং আকারে ও মাপে প্রায় কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায়) ব্যবহার করিতে বলেন। বাহ্যে করাইতে গেলে রোগীকে বামপাশে শোয়াইয়া এই বস্তুটি মলদ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। পরে শরীরের গরমে মোম গলিলে গ্লিসারিনের কাজ আরম্ভ হয়।

ডুস্ (Douche) দেওয়া। ঔষধযুক্ত জল বা কেবলমাত্র জল দিয়া ধোয়াইবার নামকে ডুস দেওয়া বলে। ইহা কাচের বা এনামেলের একটি পাত্র, এবং তলা হইতে ৬ ফিট দীর্ঘ রবারের নল দেওয়া। নলের শেষে নানা আকারের কল দেওয়া কাঠের বা কাচের নল লাগান থাকে। এই কল ঘুরাইলে জল পড়িবে। বাহ্যে করাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইলে রোগীর নীচে অয়েল ক্লথ পাতিবে এবং বেড্ প্যান হাতের কাছে রাখিবে। রোগীকে বামপাশে কাত করাইবে এবং আন্দাজ দুই সের জলে গায়ে মাখিবার সাবান গুলিবে। ফেণাযুক্ত হইলে পাত্রে ঢালিবে এবং কল খুলিয়া দেখিয়া লইবে নল দিয়া সাবান জল পড়িতেছে কি না। পরে মলদ্বারে নল প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ২ হাত উচু হইতে ধীরে ধীরে জল ছাড়িতে থাকিবে এবং এক সের আন্দাজ জল প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে রোগীকে চিৎ করিয়া পাছার নীচে বেড্ প্যান দিয়া দিবে। এই নিয়মে কলেরা রোগে নূন জল (১ ড্রাম নূন, আধসের জল), প্রয়োজন হইলে খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় আহার, যথা, ঔষধ মিশ্রিত দুগ্ধ ইত্যাদি মলদ্বার দিয়া রোগীকে খাওয়ান যাইতে পারে। তখন নূন জল বা আহার যাহাতে অতি ধীরে এবং ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

প্রস্রাব করান।

তলপেটে গরম বোতলের সেক দিলে প্রস্রাব হয়। না হইলে ক্যাথিটার দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ক্যাথিটার প্রস্রাব করাইবার একটি যন্ত্রবিশেষ। ধাতুর বা রবারের নল বিশেষ স্ত্রী পুরুষ ভেদে ভিন্ন আকারের হয়। ডাক্তার ভিন্ন অপর কাহারও ইহার ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে রবারের ক্যাথিটারের ব্যবহার একবার দেখিলে ডাক্তার ভিন্ন অপর ব্যক্তিও ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই কথাগুলি মনে রাখিবে—

(ক) হাত পরিষ্কার থাকিবে।

(খ) ক্যাথিটার ফুটাইয়া লইবে।

(গ) অল্প অলিভ তৈলও গরম করিয়া লইবে।

(ঘ) প্রস্রাবের দ্বার বোরিক লোসান দিয়া মুছাইয়া দিবে এবং ক্যাথিটারের মুখ অলিভ অয়েলে ডুবাইয়া লইবে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে।

(ঙ) বলপ্রয়োগ করিবে না।

(চ) প্রস্রাব একটি বোতলে বা হাঁড়িতে ধরিবে।

(ছ) প্রস্রাবান্তে ক্যাথিটারের মুখ টিপিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইবে। ইহাতে বিছানা ভিজিবে না।

ঔষধ খাওয়ান।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে—

(ক) নির্দ্দিষ্ট শিশি হইতে খাওয়াইবে।

(খ) ঠিক দাগ মত দিবে।

(গ) নাড়িয়া লইবে।

(ঘ) সময় মত দিবে।

(ঙ) হাতের কাছে একটু জল, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি রাখিবে।

(চ) তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে মুখে এক টুকরা হরিতকী বা গুপারি চিবাইলে তিক্ত স্বাদ লাগে না।

(ছ) অনেক রোগী চিৎ হইয়া কিছুই গিলিতে পারে না। রোগীকে পাশ ফিরাইয়া বা ঘাড় উঁচু করিয়া ধরিলে গিলিবার অনেক সুবিধা হয়।

(জ) অজ্ঞান অবস্থায় অনেক রোগী ঔষধ খাইতে পারে না, সময় সময় মুখও খোলে না। সে সময় নাক টিপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার মতন করিলে রোগী আপনি মুখ খুলিবে এবং ঔষধ গিলিয়া ফেলিবে। বিশেষ কারণ

না থাকিলে ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত এইরূপে বারবার ঔষধ খাওয়াইবে না।

(ঝ) কোনরূপ বারণ না থাকিলে ঝাজযুক্ত ঔষধ-অল্প জল মিশাইয়া খাওয়াইবে।

(ঞ) রেড়ীর তেল একেবারেই গালে ঢালিয়া দিবে এবং রোগীকে একেবারেই গিলিয়া ফেলিতে বলিবে। (অনেকে নাক বন্ধ করিয়া রেড়ার তেল খাইয়া থাকেন।) অথবা এইরূপ ভাবে খাওয়াইবে—প্রথমে ঔষধ খাওয়াইবার ছোট গ্লাসে অল্প জল লইবে। তাহাতে পুদিনা বা আদার রস দিবে। তাহার উপর শিশি হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী রেড়ীর তেল ঢালিয়া লইবে। পুদিনা বা আদার রস জনিত গন্ধে তেলের গন্ধ ঢাকিয়া যাইবে, এবং জলের উপর তেল ভাসিলে শীঘ্র মুখে ঢালিয়া দিবার সুবিধা হইবে।

(ট) পেটেন্ট ঔষধ বা অন্য কোন ঔষধ ডাক্তারের বিনানুমতিতে খাইবে না। অনেক সময় ডাক্তারকে না জানাইয়া অনেকে পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া থাকেন। তাহাতে কুফল ফলিলে রোগী নিজেকে ও ডাক্তারকেও বিপদে ফেলেন। কারণ অনেক পেটেন্ট ঔষধের উপাদান জানা থাকে না; এবং তাহাদের বিষময় ফলের কোন প্রতীকার করা যায় না।

রোগের বীজাণুনাশক ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্যাদি।

ক্ষতস্থানে রোগের বীজাণু না আসিতে দেওয়ার নাম আসেপ্‌সিস্ (asepsis)। অস্ত্র করিবার সময় আবশ্যক দ্রব্যাদি ফুটাইয়া, পোড়াইয়া লইলে আর কোন ভয় থাকে না। বলা বাহুল্য অস্ত্র-চিকিৎসকের হাত বিশেষভাবে পরিষ্কার থাকা উচিত। কাপড় তোয়ালে জল ইত্যাদি ফুটাইয়া লওয়া যায়। গামলা ইত্যাদি যাহা লাগে, তাহাতে একটু স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই ধরাইয়া দিলে জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপে ছুরী কাঁচিও জলে ফুটাইয়া বা পোড়াইয়া লওয়া যায়। কাচের জিনিষ বা রবারের জিনিস কেবল জলে ফুটানই চলিতে পারে। অপর পক্ষে ক্ষতস্থানে যদি কোন কারণে বীজাণু দেখা দেয়, সে সময় যে পদ্ধতিতে তাহার প্রতীকার করা যায়, তাহাকে আন্টিসেপসিস্ (antisepsis) বলা হয়। এই সময় রোগের বীজাণুনাশক লোসান গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়; যথা, আইডোফরম (Iodoform), কার্ব্বলিক লোসান ইত্যাদি।

বীজাণু ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্যাদি সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে; যথা, (ক) শুক্‌না গুঁড়া ইত্যাদি।

(খ) তরল পদার্থ।

(ক) দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বা পদার্থে পাথুরে চুণ বা চুণকাম করিবার ঘুটিং চুণ ছড়াইয়া দিলে রোগের জীবাণু নষ্ট হয় ও দুর্গন্ধ যায়।

(খ) ফেনাইল (Phenyle) জলের সহিত মিশাইয়া হাত ধুইবার বা ঘর-দোর পরিষ্কার করিবার জন্য জল তৈয়ার করা যায়।

মল, মূত্র, কফ, রোগীর বিছানা আদির ব্যবস্থা।

মল—চুণ বা ফেনাইল দিয়া অবিলম্বে ফেলিয়া দিবে। তখনি তখনি ফেলিবার সুবিধা না হইলে ঢাকিয়া রাখিবে।

মূত্র—মলের ন্যায় ব্যবস্থা।

কফ—রোগীর পাশে একটি পাত্রে ফেনাইল জল দিয়া রাখিবে। রোগী কাসিয়া তাহাতেই কফ ফেলিবে।

রোগীর বিছানা—কম্বল তোষক ইত্যাদি ফেনাইল জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এবং ২।৩ দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া তবে ঘরে উঠাইবে। চাদর, বালিশের ওয়াড় জলে ফুটাইয়া লইবে। পরে ধোপার বাড়ী দিবে।

বাড়ীতে হঠাৎ কোন অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হই

এইরূপ ব্যবস্থা করিবে—

(ক) আলো ও বাতাসপূর্ণ ঘরে একটা তক্তাপোষ পাতিয়া রাখিবে এবং ৮খান ইট হাতের কাছে রাখিবে। মেঝে এবং মেঝে হইতে ৪ হাত উঁচু দেওয়াল ফেনাইল জলে ধুইয়া রাখিবে।

(খ) পিতল কাঁসার বা এলুমিনিয়মের পাত্রে কিছু জল ফুটাইয়া ভাল করিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

(গ) যদি কোন অস্ত্র বা কাপড় ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয় তবে সেই পাত্রের ভিতর অথবা স্বতন্ত্র একটা পাত্রে তাহা ফুটাইবে এবং তাহারই ভিতর মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে।

(ঘ) রোগীকে স্নান করাইয়া বা গা মুছাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

(ঙ) লোমযুক্ত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য একটা ক্ষুর ও সাবান রাখিবে।

(চ) হাত ধুইবার সাবান ও গামছা ঠিক করিয়া রাখিবে।

শেষ কথা এই—শুশ্রূষাকারীর যেমন রোগীর প্রতি গভীর কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, বি-এ

(৩)

গতবারে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। উহা মানব-সমাজের কি ভাবে, কিরূপ উপকার করিতেছে, সে সম্বন্ধেই আজ দু-একটী কথা বলিব।

পাশ্চাত্য দেশে অতি সামান্য একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই বিজ্ঞানের জন্ম হয়, তাহা পূর্ব্বেই (ভারতবর্ষ, চৈত্র) বলা হইয়াছে। এই ঘটনা—জড়বস্তুর সাহায্যে ইহলোকের ও পরলোকের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান। এই সূত্র ধরিয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। আত্মিক যদি জড় বস্তুর সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন, তবে পৃথিবীর সহিত পরলোকের আরও নিকটতর সম্বন্ধ রাখা কি সম্ভবপর নয়? ক্রমশঃ পরলোকের সংবাদ আনয়ন, আত্মা আনয়ন, আত্মিক চক্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। পরলোকগত আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ ধারণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে লাগিলেন, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে মিলন-সেতু প্রস্তুত হইল।

এই ইহকাল পরকালের কথার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস যাহা পাওয়া গেল—তাহা আত্মার অবিনশ্বরত্ব। মানুষ প্রকৃত পক্ষে মরে না, মরিতে পারে না। মৃত্যু অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে,—প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু কি সেই শক্তি, যাহা এই আপাত-প্রতীয়মান ধ্বংসের মধ্যে আপনার সত্তা বজায় রাখিতে পারে? মানুষের শারীরিক মৃত্যুর পরেও বিদেহী অবস্থায় যে বস্তু বর্ত্তমান থাকে, যে এমন বিশাল শক্তিশালী, সেই বস্তু মানুষের শরীরের মধ্যে থাকিয়া কোন্ ক্রিয়া সম্পাদন করে? বিদেহী অবস্থায় আত্মা যে শক্তির অধিকারী হয়, দেহে থাকিয়া কি সে তাহা লাভ করিতে পারে না? এই সকল অনুসন্ধানের ফলে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকগণের স্বর্গীয়-অতৃপ্তি (Devine discontentment) তাঁহাদিগকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। 'আরও অগ্রসর হইতে হইবে'—ইহাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। সেই

মন্ত্রের সাধনায় তাঁহারা যে সত্য লাভ করিলেন, তাহা শোক-তাপ-দগ্ধ মানব-চিত্তে অমৃত সেচন করিল।

আমাদের দেশের জ্ঞানিগণ যোগ-পন্থায় যাহা লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানই তাঁহারা সাধারণের সহজসাধ্য উপায়ে বাহির করিতে লাগিলেন। যাহা জন-কয়েক শক্তি-শালী লোকের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত, জনসাধারণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইল।

অবশ্য আমাদের দেশের যোগিগণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় যেরূপ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-দেশজাত এই নব-অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এখনও তাহা হইতে দূরে আছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্থার মিলনে, জনসাধারণের উপযোগী, উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার সহজসাধ্য উপায় আবিষ্কৃত হইবে, আমরা এ আশা করিতে পারি।

ইতোমধ্যে মেস্‌মেরিজম, হিপ্‌নটিজম, প্রভৃতি বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্দ্বারা মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে সুপ্ত বহু শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। (Spiritualism বা আত্মিক-বিজ্ঞানের সহিত এই গুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকিলেও সমস্তই Occult Science বা 'গুপ্ত-বিদ্যা' বলিয়া এক পর্য্যায়ে আসন পাইল। ক্রমশঃ দেখা গেল, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের (Psychical Scienceএর) সহিত উহাদেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিচয় পূর্ণভাবে এক প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটী শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকা দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের দানের চেয়ে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দান কোন অংশে ছোট তো নয়ই, বরং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শোক-তাপ-দগ্ধ মানব হৃদয়ে যে শান্তি দিতে পারে তাহার তুলনা নাই। আমাদের দেশে আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে পরম্পরাক্রমে যে বিশ্বাস ও ধারণা চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই নব-বিজ্ঞানের আলোচনায় পাওয়া যাইবে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান লব্ধ শক্তিগুলি মূলতঃ আত্মার শক্তি হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে উহাদিগকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শক্তির অন্য শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ কোন বিভাগ হিসাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। মোটামুটী ভাবে কয়েকটী শক্তির পরিচয় দিব।

ইচ্ছা-শক্তি (Will Force)

প্রথমেই আমরা ইচ্ছাশক্তির (Will Power, Will Force) কথা বলিব। কারণ অন্যান্য অনেক শক্তি লাভের মূলে এই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। মনকে একাগ্র-ভাবে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিলে সফলতা লাভ অসম্ভব। আবার মনের এই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়।

মনের সুপ্ত-চৈতন্য অংশ (subliminal consciousness) মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার-ঘর। সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিতে পারিলে মানুষের দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, তাহার কিছুই নষ্ট হয় না। এই সমস্তই 'ধারণা' (Impression) অথবা 'ভাব'রূপে মনের সুপ্ত চৈতন্য অংশে সঞ্চিত হয়। বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ বহুকাল-বিস্মৃত ঘটনাও আমাদের মনে জাগরূক হয়। তাহারা কোথায় ছিল? মানুষ আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া যখন ইচ্ছামাত্র তাহার পূর্ব্বজীবনের বিস্মৃত ঘটনাকে মনে জাগাইয়া তুলিতে পারে তখনই তাহার এই দিকের মানসিক সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়।

কিন্তু ইহা ইচ্ছা-শক্তির একটা দিক মাত্র। মনের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মন শরীরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। আমাদের অন্তরস্থ ইচ্ছা বহির্জগতে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। এই ইচ্ছাশক্তি যেরূপ মানুষের নিজের উপর, ঠিক সেইরূপ অন্য লোকের উপর ও প্রকৃতির উপরেও ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিজের উপর ইচ্ছাশক্তির চালনায় মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতি বা চরম অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতে পারে। 'Man is his own maker' (মানুষ নিজেই নিজকে তৈয়ার করে)—এই বাক্যটী বহু পরিমাণে সত্য। শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বলা যায়—'যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি জগৎকে জয় করিয়াছেন।' এই ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত চালনায় মানুষ আপনার ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারে, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে, নিজের রোগ আরোগ্য করিতে পারে। অধ্যাত্ম-

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনার সময়ও ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধে বলিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে,—মানুষের মন ও শরীর একত্র সম্বদ্ধ আছে; সুতরাং মানুষের মনের শক্তিতে তাহার শরীর যেন চালিত হইল। কিন্তু এক জনের ইচ্ছাশক্তিতে অন্য লোকের মন ও শরীর চালিত হয় কিরূপে?

যে কারণে এক মন অন্য মনকে জানিতে পারে (telepathy, thought-reading আলোচনার সময় বিশেষভাবে বলা যাইবে), যে কারণে মানুষ ইচ্ছাশক্তির বলে তাহার নিজের শরীরকে পরিচালিত করিতে পারে, ঠিক সেই কারণেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। সমস্ত বিশ্ব সেই এক অনন্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জগতের মূলে আছেন সেই এক পরম চৈতন্য-সত্ত্বা। বিশ্বের সমস্তই 'সূত্রে মণি গণাইব' একত্র বিধৃত আছে। সকলের ভিতরেই একটা সমত্বের যোগ আছে। তাই একমন অন্য মনকে জানিতে পারে, এক মন অন্য মনকে পরিচালিত করিতে পারে। কারণ প্রত্যেক মনই সেই বৃহত্তর মনঃশক্তির তরঙ্গ মাত্র। বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি চালনা করার অর্থ—সেই বৃহৎ মনঃসমুদ্রের মধ্যে আঘাত করায় যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেই তরঙ্গকে বিশেষ একটা দিকে (যেমন নির্দ্দিষ্ট কোন মানুষের, Subjectএর, দিকে) পরিচালিত করা। সেই ইচ্ছা-তরঙ্গ সাবজেক্টের (Subjectএর কি বাংলা প্রতিশব্দ হইতে পারে?) মনের মধ্যে প্রেরকের অভিপ্রায়ানুরূপ ইচ্ছা উদ্রিক্ত করে। সুতরাং সাব্‌জেক্ট (Subject) নিজের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতেছে ভাবিয়া প্রেরকের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। কিন্তু যখন Subjectএর ইচ্ছাশক্তি, প্রেরকের ইচ্ছাশক্তির চেয়ে প্রবল থাকে, তখন প্রেরিত ইচ্ছাশক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

সমত্বহেতু এক মন যেন অন্য মনকে জানিতে পারে বা এক মন অন্য মনের উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু জড়জগৎ সম্বন্ধে, প্রকৃতির রাজ্য সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম প্রযোজ্য? অধ্যাত্মবাদীদের মতে জগতে প্রকৃত পক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই—সমস্তই সেই চৈতন্যময় পরম সত্তার বিকাশ মাত্র। সুতরাং যাহাকে আমরা ব্যবহারিক ভাবে জড় বলি, মূলতঃ তাহা চৈতন্যসত্তায় পূর্ণ। তাই, চৈতন্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাই, জড় প্রকৃতিও মানুষের ইচ্ছাশক্তির নিকট মাথা নত করে। জড়জগৎ, ধাতু পর্য্যন্ত যে উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তাহা ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তির বিকাশে ও উপযুক্ত পরিচালনায় মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছু থাকে না। মানুষ অনন্তের সন্তান, অমৃতের অধিকারী। উপযুক্ত সাধনা বলে, ও সাধনলব্ধ শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে, মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। মানুষ মূলতঃ চৈতন্যস্বরূপ। চারিদিকের বেড়াজাল ও বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে সে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ সীমার মাঝে অসীম। সুতরাং পূর্ণ মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছুই থাকে না। ভারতবর্ষে এমন সব মহাত্মাদের সংবাদ পাওয়া যায়, যাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে অতিমানুষ বলিয়া মনে করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা আমাদেরই একজন, শক্তিবিকাশের পার্থক্য হেতু আমাদের মধ্যে এই পার্থক্য জন্মিয়াছে। আমরাও অতি-মানুষ বা পূর্ণ-মানুষ হইতে পারি।

কিন্তু এখানে একটী কথা বলার প্রয়োজন। অনেকেই নানা ভাবে নানা কার্য্যে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন; কিন্তু সকলেই তো সফলকাম হয়েন না, কাহার-কাহারও জীবন কেবল মাত্র ব্যর্থতায় পূর্ণ। ইহার কারণ কি?

এই ব্যর্থতা বা সফলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটী জিনিস আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, শক্তি বিকাশের তারতম্য; দ্বিতীয়তঃ, শক্তি পরিচালনার ধারা। সকলেই নিজের ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত পরিমাণে বিকাশ করিতে পারেন না। মানুষের মধ্যেই যে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। সুতরাং কি উপায়ে শক্তিলাভ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। শক্তি লাভের জন্য সাধনা না করিয়া, তাহার ফল লাভ করা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, শক্তি লাভ করিয়াও শক্তি চালনার প্রকৃষ্ট উপায় না জানিলে সফলতা লাভ সম্ভবপর নয়। বিশ্ব একটী বিশেষ নীতিতে পরিচালিত। এই নীতির পশ্চাতে ভগবানের শক্তি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার অর্থ—সেই বিশ্বব্যাপী মূল শক্তি-সমুদ্রে আঘাত করা; এবং সেই আঘাতের ফলে যে শক্তি-তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট একদিকে পরিচালনা করা। সেই বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুগামী যে ইচ্ছাশক্তি, তাহা অনুকূল শক্তির সাহায্যে সফলতা লাভ করে; পক্ষান্তরে, প্রতিকূল শক্তির সঙ্ঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয় না,—ইহাই তাহার একটা বড় কারণ। অবশ্য তাহা ছাড়াও ইচ্ছাকারীর যোগ্যতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণ আছে। কোন কোন সময় অতি হেয় ইচ্ছার সফলতা দেখিতে পাই, কিন্তু পূর্ব্বাপর সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে ইচ্ছার ফল, ইচ্ছাকারীর পর্য্যন্ত ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে।

ইচ্ছাশক্তি সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রয়োগ করা হয়; ইচ্ছাকারীর জ্ঞাতসারে, ও অজ্ঞাতসারে। জ্ঞাতসারে যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহা উপরে বলা হইল। আপাত-দৃষ্টিতে অনেকের কোনরূপ ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহাদের বাসনা কামনা অপূর্ণ প্রায়ই থাকে না। এই শ্রেণীর লোকের প্রধান কথা—ঈশ্বর যা করেন তাই হবে। পথে ঘাটে আমরা কর্ম্মবিমুখ অলস ব্যক্তির মুখে যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাই—ইহা সেই অদৃষ্টবাদ নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা কর্ম্মবিমুখ নহেন। তাঁহারা কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু গীতার উপদেশ অনুযায়ী ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-পথে চলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না সত্য, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের অবলম্বিত কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি সেই বিশ্বশক্তির সহিত মিলিত হইতে থাকে। তাঁহাদের মন ভগবদভিমুখী হওয়ায় তাঁহাদের বাসনা কামনাও ঊর্দ্ধমুখী হয়। তাই প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ না করিলেও তাঁহাদের বাসনা প্রায় আপনা-আপনিই পূর্ণ হইয়া যায়।

ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনার সময়ও এই ইচ্ছাশক্তির উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে। অন্যান্য সকল শক্তিলাভের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ইচ্ছাশক্তি নিহিত আছে। তাই প্রথমেই এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইল। এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মানুষের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইচ্ছাকারী নিজের নানাবিধ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সহজসাধ্য হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে নিজের বা অপরের রোগ আরোগ্য করা যায়। এ বিষয় Psychopathy (বিনা ঔষধে চিকিৎসা বিদ্যা) সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিশেষভাবে বলা হইবে। ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে কুচরিত্রের সংশোধন করা যায়—কত মানুষকে অধঃপতনের অধস্তন স্তর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জনসমাজের অগ্রণী করা যায়। যাহারা সমাজের ব্যাধিস্বরূপ, তাহারাই আবার দেবতাদের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইতে পারে। নানাবিধ কুঅভ্যাস ইহার সাহায্যে দূর করা যায়, এবং সন্তানের চরিত্রকে ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক নানাবিধ মঙ্গল বিধানে সুসংযত ইচ্ছাশক্তি মহদুপকার সাধন করে।

যাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের নানাবিধ মঙ্গলের জন্য তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রকৃতিও মানবের শক্তির নিকট মাথা নত করে। জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণ জগতের কল্যাণ কামনায় নানাবিধ মঙ্গলজনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন—তাহার দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ নয়। আমাদের ইতিহাসে বর্ণিত জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে থাকিয়া কর্ম্ম করেন;—তাঁহাদিগের সেই কর্ম্ম ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ মাত্র। আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রোক্ত 'কামবসায়িতা' সিদ্ধি এই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ মূলতঃ অনন্তের সন্তান, অসীম শক্তির অধিকারী। উপযুক্ত সাধনায় সে তাহার শক্তিকে অসীম পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারে—পূর্ণ হইতে পারে। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষ সাধনবলে আপনার শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত মিলিত করিতে পারিলে, সে ইচ্ছামাত্র সেই শক্তি-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপাদন করিতে পারে। সমস্ত বিশ্বে এক শক্তিই অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই ইচ্ছাশক্তি

সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হয়। সাধনবলে মানুষ এই দেশ কালের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে—আপনার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তাই আমাদের দর্শনসমূহে মুক্তাত্মাদের অসীম শক্তি লাভের উল্লেখ দেখা যায়—যাহার নিকট অষ্টসিদ্ধিও নগণ্য। এই মুক্ত সিদ্ধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ এক যায়গায় বলিয়াছিলেন—"ইচ্ছা করিলে আমি চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারি!"

কোন জাতির বা সমাজের সমবেত শক্তির ক্রিয়াও অসাধারণ। যখন কোন জাতি বা সমাজ বিশিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত্তন কামনা করে, অথচ নানা কারণে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারে না, তখন জাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ শক্তিশালী কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি জাতির সেই ইচ্ছাকে সফল করিতে সমর্থ হয়েন। জগতের বিভিন্ন দেশে মহাপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে এইরূপ একটা চাঞ্চল্য ও অপূর্ণ ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। 'অদ্বৈতের হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়' বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহারও মূলে সমাজের এই ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। সমাজে বা দেশে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে মানুষ তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লয় কেন? মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব, ও ব্যক্তিগত শক্তির জন্যও লোকে তাঁহাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু তাঁহার মধ্যে নিজেদের ইচ্ছার স্বরূপ দেখিতে পায় বলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করে, নিজের প্রতিরূপ ভাবে। মানুষের সুপ্তচৈতন্য অংশে যে ইচ্ছা তাহার নিজের অজ্ঞাত-সারে ক্রিয়া করিতেছিল, মহাপুরুষের মধ্যে তাহাই প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করে। শক্তি অবিনাশী। জাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তি বলেই সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। জাতির ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

মনের একাগ্রতার উপর এই শক্তির তারতম্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সমস্ত জিনিসকেই বিভাগ করিলে কমিয়া যায়। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা হয় না। মনের সমগ্র শক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহার ফল ফলিবেই। কিন্তু একাগ্রতা লাভের জন্য সাধনা চাই। আমাদিগের পুরাণাদিতে বর্ণিত 'অভিশাপ' বা 'বর' সম্বন্ধে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে বহু পরিমাণে অতিরঞ্জন থাকিলেও একেবারে গাঁজাখুরী গল্প নয়। ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে আজকালও 'অভিশাপ' বা 'বর' প্রদান অসম্ভব নয়। আর, তাহা কেবল জাতি বিশেষের এক-চেটিয়া অধিকারও নয়। উপযুক্ত সাধনের প্রভাবে সকলেই এই শক্তি লাভ করিতে পারেন।

একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাউক। দুর্ব্বাসা মুনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে,—দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অন্যের মনের বিকার উৎপন্ন করা আজকাল আর গাঁজাখুরী গল্প নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। আজকালও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অন্যের মনে এরূপ বিস্মৃতি উৎপাদন করা যায় এবং করা হইতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিলে অনেক ধূলিরাশিই স্বর্ণরেণুতে পরিণত হইবে। আমরা এ বিষয়ে মাত্র দু'-একটী ইঙ্গিত করিব, বাকীটুকু পাঠক-পাঠিকারা নিজে পূরণ করিয়া লইবেন। প্রাচীনের ব্যাখ্যা দেওয়াও আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আর তাহা সম্ভবপরও নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কিরূপে প্রাচীনের চর্চ্চা করা সম্ভবপর, তাহার একটু আভাষ দেওয়া গেল মাত্র।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। আগুণ যেমন মানুষের খুব উপকারী, তেমনি উহার তুল্য অনিষ্টকারী সর্ব্ববিধ্বংসীও আর কেহ নাই। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ইহার সাহায্যে মানুষের যেমন বহুবিধ মঙ্গল সাধন করা যায়, তেমনি অনিষ্টও করা যায়। শক্তি অগ্নি-ধর্ম্মী। সুতরাং ইহার প্রয়োগে সাবধান হইতে হয়। ইহা যে কেবল পরকে পোড়ায় তাহা নয়, শক্তি-প্রয়োগকারীও ইহার হাত হইতে নিস্তার পান না। তাহারও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

তার পর, অপব্যবহারে শক্তি অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়। অমঙ্গল সাধনে শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা বিশ্বমঙ্গল-নীতির সহিত সঙ্ঘর্ষে পরাজিত হয়, না হয় তো দুর্ব্বল হইয়া যায় তাই পুরাণাদিতেও উল্লেখ দেখিতে পাই যে, অভিশাপ

দেওয়ার ফলে তপঃশক্তি নষ্ট হয়। বর্ত্তমান-সময়েও যাঁহারা অমঙ্গলের পথে শক্তি চালনা করেন, তাঁহাদের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন সময়ে শক্তি প্রয়োগকারীর অনিষ্ট সাধন করে—ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। সংযত মন ও উন্নত উদার হৃদয় ব্যতীত এই শক্তিকে ধারণ করা যায় না। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহারা সাবধানে তাহা করিবেন। নতুবা, শক্তিক্ষয় অথবা নিজের অনিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ মনকে সংযত ও একাগ্র করা চাই। নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কোন দিকে যাহাতে মন না যায়, যাহাতে কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। প্রথমতঃ নির্জ্জনতার প্রয়োজন। সাধনায় অগ্রসর হইলে তত সাবধানতার দরকার নাই। প্রথমে নিজের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা ভাল। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোনও দোষ-ত্রুটী আছে। আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বারা সেই ত্রুটী বাহির করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা চাই। একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। ক্রমশঃ যখন নিজের উপর ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে, তখন বহির্জগতে শক্তি প্রয়োগ করা যায়। নিজের উপর শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে একটী সহজসাধ্য সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকের প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গে না। রাত্রে শুইবার সময় দৃঢ়ভাবে একাগ্রতার সহিত মনে মনে সঙ্কল্প করিবেন—"আমাকে কল্য প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম হইতে উঠিতেই হইবে।" অথবা নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"ক, তোমাকে এই সময় ঘুম থেকে উঠিতেই হইবে।" এই দুই প্রকার Suggestion (ইঙ্গিত) এর মধ্যে প্রথমোক্তটীই ভাল। কারণ তাহার দ্বারা আত্ম-শক্তি জাগরণের পক্ষে সুবিধা হয়। দুই তিন দিনের মধ্যেই এই শক্তির ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ করিবেন; কিন্তু এক সঙ্গে একাধিক বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ করিবেন না। অনেকের থিয়েটার বা ঘোড়দৌড় রোগ আছে। তাঁহারা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছেন জানিয়াও অনেকে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না।

অনেকেই হয় ত প্রশ্ন করিবেন—আমি ইচ্ছা করি বলিয়াই ত রেসে (Race) যাই, ইচ্ছা না করিলে যাইব না। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু আসল বিষয়—এই ইচ্ছাটাকে কিরূপে পরিচালিত করা যায়। ঐখানেই গোল। অনেকেই ভাবেন—'ইচ্ছা করিলেই হয়'—কিন্তু আত্ম-অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আদতে সেই ইচ্ছাশক্তিটাই তাহাদের নাই। তাহারা যাহাকে নিজের ইচ্ছা বলিতেছেন—সেটা নেশার ইচ্ছা, নিজের নয়। এই দারুণ আত্ম-প্রতারণা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে নিজের সত্যিকার ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে।

যাহা হউক, এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আর একটী জিনিস দরকার—সেটা 'ইঙ্গিত' (suggestion)। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সময় ইঙ্গিত সম্বন্ধে বলিতে হইবে, তাই এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম। পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা মঙ্গল উদ্দেশ্য ও সংযত মন লইয়া যেন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন। নতুবা শক্তির অপ-ব্যবহারে জগতের অনিষ্ট তো হইবেই—সেই শক্তির আগুণে নিজেও পুড়িয়া মরিবেন। আবার সংযত মন, প্রশান্ত হৃদয় লইয়া সাধনায় অগ্রসর না হইলে, সফলতা লাভও সম্ভবপর নয়। মিথ্যা পরিশ্রমে নিজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভ হইবে না। আমরা যাহা করিতে চাই না কেন, জগতের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে, নতুবা দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

তার পর, আমাদের চিন্তা-শক্তিকে বিশেষ ভাবে নিয়মিত করার প্রয়োজন। কোন শক্তিরই ধ্বংস হয় না। আজ আমি পরিহাসচ্ছলে যাহা চিন্তা করিতেছি, যাহা কামনা করিতেছি তাহার শক্তিও নষ্ট হয় না। তবে তাহা আমাদের মনের সুপ্তচৈতন্য অংশে কিরূপ ভাবে সঞ্চিত হইতেছে আমরা তাহার খবর রাখি না। ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চিত কামনা সামান্য একটু অনুকূল বাতাসের সাহায্যে হঠাৎ একদিন দাবদাহ উপস্থিত করে, পূর্ব্ব জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। তাই আমরা মানুষের

জীবনে অনেক সময় একটা আকস্মিক ওলট পালট দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিছুই আকস্মিক নয়। পূর্ব্ব জাতিগত চিন্তাশক্তির প্রভাবে মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে—ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা প্রযোজ্য। তাই অতি সাবধানে আমাদের চিন্তা, কর্ম্ম, ইচ্ছাকে পরিচালিত করা দরকার।

আমরা অনেক সময় আমরা এলোমেলো ভাবে অথবা উল্টাপাল্টা রকমের ইচ্ছা করি বলিয়া কোনটাই সফল হয় না। সংযতভাবে, একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক চিন্তার বা ইচ্ছার একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই। নতুবা এলোমেলো ভাবে ইচ্ছা করিয়া সফলতা লাভ সম্ভবপর নয়।

আমাদের প্রবন্ধের তুলনায় ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। কারণ অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক শাখার সহিত এই ইচ্ছাশক্তির যোগ আছে। তবুও যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে মোটামুটী কয়েকটী বিষয় মাত্র উত্থাপিত করিয়াছি।

পক্ষী-তীর্থ

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন পক্ষী-তীর্থ তাহাদের অন্যতম। চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে—"পক্ষ তীর্থ যাই কৈল শিব-

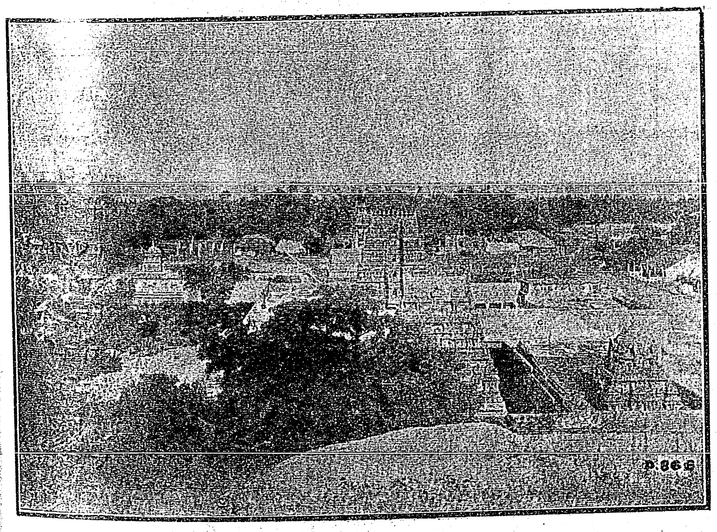

মহাবলিপুরমের দৃশ্য (রায়া গোপুরম্ হইতে—চিঙ্গলপুট)

দরশন।" দ্রাবিড় দেশে, এই তীর্থ "তিরু কল্‌ড়ি কুণ্ড্রম্" * (The Sacred kite Kill) নামে পরিচিত। এই স্থান মাদ্রাজ হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। এই তীর্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, অজ্ঞাত দেশ হইতে দুইটি পক্ষী প্রত্যহ এখানে আসিয়া পূজা গ্রহণ করিয়া যায়। অনেক দিন যাবৎ আমার স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য কৌতূহল ছিল। অবশেষে যখন মান্দ্রাজপ্রবাসী একজন বন্ধু সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত করা গেল।

৭ই আগষ্ট প্রাতে ৭টায় এগ্‌মোর ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়া ১০॥ টায় চিঙ্গলপুট জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। মান্দ্রাজ হইতে এই ষ্টেশন ৩৫ মাইল। এই জংসন হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন মান্দ্রাজ-সাউথ-মাহারাট্টা-রেলওয়ের আর্কোনাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ কাঞ্চী (Conjeeveram) যাইতে হইলে, এই ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী ধরিতে হয়।

চিঙ্গলপুট রেল লাইনের নিকটেই হ্রদের ন্যায় একটি

---

* বাঙ্গালা অক্ষরে নামটি ঠিক উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিতে পারিলাম না। "ড় ল য়োর ভেদ":—কিন্তু এখানে "ল" এবং "ড়" সংযুক্ত।—"তিরু"=শ্রী, "কুণ্ড্রম্"= পাহাড়।

বিস্তৃত জলাশয়—দৈর্ঘ্যে ২ মাইল, প্রস্থে ১ মাইল। রেল ষ্টেশন হইতে পক্ষী তীর্থ ৯ মাইল দূরে। যাত্রিদের জন্য, মোটর সার্ভিস আছে। ট্রেণ পৌছিবার ১০ মিনিট মধ্যেই মোটর-বস্-এ আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে রওনা হইলাম। দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং পথের ধারে ধারে তেঁতুল গাছের সারি। আধ ঘণ্টা পরে, সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখরদেশে গিরিদুর্গের ন্যায় একটি মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। অল্পকালের মধ্যেই মোটর-বাস্ পাহাড়ের পাদমূলে পৌছিল। ইহাই তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্। নগরীর মধ্যস্থলে প্রাচীর-বেষ্টিত গোপুরম্-শোভিত বৃহৎ শিব-মন্দির; উহার চারিধারে নগরীস্থ মন্দিরটি যথোচিত খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। নতুবা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ দ্রাবিড় দেশের অনেক বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

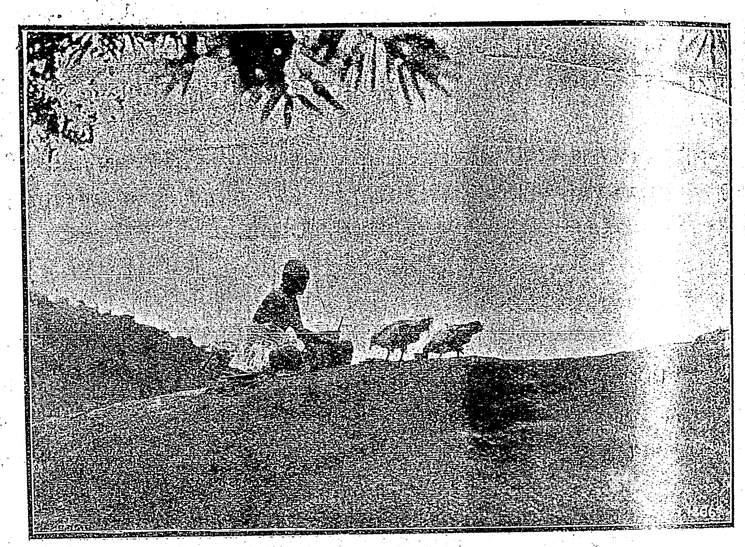

দেবগিরীশ্বর পাহাড়ে পুরোহিত পক্ষীদিগকে আহার দিতেছেন (তিরুকলড়িকুণ্ড্রম্—চঙ্গলপট)

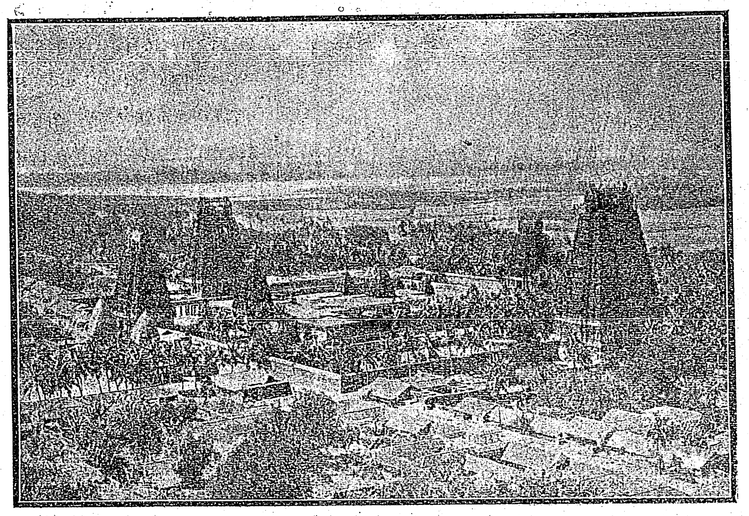

তিরুকলড়িকুণ্ড্রম্

তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্ সহরের লোকসংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু তীর্থ দর্শন উপলক্ষে সময়ে সময়ে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তাহাদের বাসের জন্য সহরে অনেকগুলি যাত্রি-নিবাস আছে। তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রমের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, সেই জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যেও অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। সহরের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ সরোবর আছে—নাম "শঙ্খ-তীর্থ।" পাণ্ডাগণ বলেন, রাজপথ কিন্তু গিরিশীর্ষে অবস্থিত। "বেদ-গিরীশ্বর" শিব-পক্ষীতীর্থ নামে পরিচিত। ঐ তীর্থের মাহাত্ম্যে মন্দিরই প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই সরোবর হইতে একটি করিয়া শঙ্খ নির্গত হয়। সেই জন্য বার বৎসর পরে একবার শঙ্খতীর্থে

স্নান করিবার যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ সময় তিরু-কল্‌ড়ি কুণ্ড্রম অসংখ্য যাত্রীর সমাগমে কোলাহলপূর্ণ নগরে পরিণত হয়। সরোবরের মধ্যস্থলে জলটুঙ্গির ন্যায় একটি মন্দির—নাম "নীরালি-মণ্ডপ।" স্নান করিবার জন্য একাধিক সুন্দর পাথরে-বাঁধা ঘাট আছে। এই সরোবরের তীরে একজন মহাজনের গৃহে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শঙ্খতীর্থের নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া আমরা পক্ষীতীর্থ দর্শন জন্য শৈলশিখরে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পক্ষিযুগল এই তীর্থে আবির্ভূত হইয়া পূজা গ্রহণানন্তর তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। সুতরাং ঠিক সময়ে গিরিশৃঙ্গে উপস্থিত হইতে না পারিলে সে দিন আর পক্ষিদেবতার দর্শন লাভ ঘটিবে না!

পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া প্রায় অর্দ্ধপথ উঠিয়াছি এমন সময় সহসা গিরিশৃঙ্গে বাদ্য-ধ্বনি ও জয়-কোলাহল শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে পক্ষিযুগল দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ চরণ ক্রমশঃই অবশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিশ্রামের আর তিলমাত্র অবসর ছিল না। ক্লান্তদেহে আমরা তীর্থ-স্থানে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র অঙ্গনের ন্যায় সমতল স্থানে একটি চত্বর—উহাই পক্ষিদেবতার পূজা-মণ্ডপ। অনেক ভক্ত সেখানে সমবেত। একজন পুরোহিত বসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও আমরা ঠিক সময়ে পৌছিতে পারি নাই। পক্ষিযুগলের "ভোগ" হইয়া গিয়াছে। পুরোহিতের হস্ত হইতে ভোগ গ্রহণ করিয়া পক্ষিদ্বয় শিখরের প্রান্তে পাথরের উপর বসিয়া আছে। পাখী দুইটি সম্ভবতঃ যুবজাতীয়—রঙ সাদা ঐরূপ পাখী আমাদের বাঙ্গলা দেশে দেখি নাই। দুই তিন মিনিট পরে পাখী উড়িয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। এখান হইতে ৮।৯ মাইল পূর্ব্বে বঙ্গসাগর। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি এবং উপকূলে মহাবলিপুরমের আলোকস্তম্ভ—(Light house) চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

পুরোহিত (অথবা পাণ্ডা) তখন আমাদের নিকট পক্ষিতীর্থের লোকপরম্পরাগত ইতিহাস বিবৃত করিলেন। এই পর্ব্বতের নাম বেদাচল, ইহার চারিটি শৃঙ্গ চারি বেদের প্রতিরূপ। এই যে দুইটি পক্ষি-দেবতা ইহাঁরা সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান আছেন। সত্যযুগে ইহাঁরা ছিলেন দুইজন

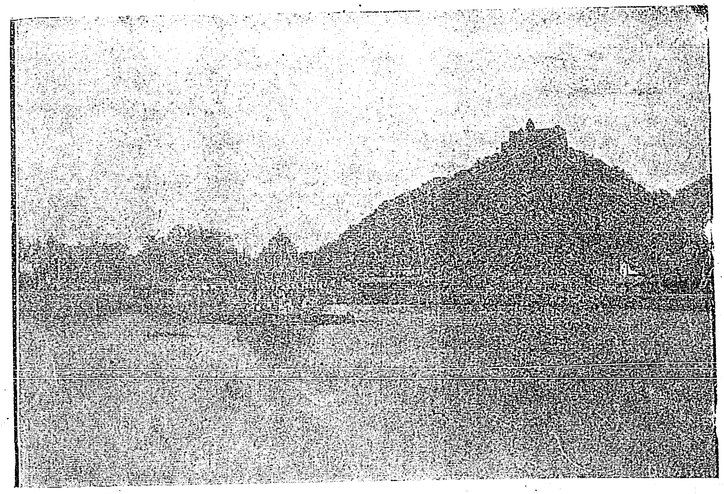

বেদগিরীশ্বর মন্দির, পাহাড় ও সরোবর

ঋষি; ত্রেতায়—জটায়ু ও সম্পাতি, দ্বাপরে চণ্ড ও প্রচণ্ড, এবং কলিতে পূষা ও বিধাতা। ইহাঁরা প্রত্যহ আকাশ পথে কাশী হইতে রামেশ্বরম্ যাতায়াত করেন। মধ্যাহ্নে পূর্ব্ব-সাগরে স্নানান্তে বেদাচল-শৃঙ্গে নামিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়া যান। কাশী ও রামেশ্বর তীর্থে পক্ষিযুগল কাহারও নয়নগোচর না হইলেও, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে তাঁহাদের পক্ষিতীর্থে অবতরণ করিয়া ভোগ-গ্রহণের কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

বাস্তবিক, পক্ষিতীর্থের পক্ষি-সমাগম ব্যাপারটি রহস্যাবৃত। চৈতন্যদেব ১৫১০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ

করেন—তাহার পূর্ব্বেই পক্ষিতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। একজন প্রাচীন ওলন্দাজ ভ্রমণকারীর গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে এই তীর্থে দুইটি পাখীকে ভোজন করিতে দেখিয়াছিলেন। শত শত বৎসর যাবৎ এক জাতীয় দুইটি পাখী নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এই গিরি শৃঙ্গে আসিতেছে। আহার্য্যের লোভেও দুইটির বেশী পাখী আসে না কেন, এবং কালক্রমে একটি পাখীর আয়ুঃ শেষ হইলে অমনি ঐ জাতীয় আর একটি পাখী আসিয়া কেমনে তাহার স্থান অধিকার করে, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও নিকট পাই নাই। যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ইহা পাণ্ডাদিগেরই একটা কারসাজি।

পক্ষি-দর্শন শেষ করিয়া পর্ব্বত-শীর্ষে 'বেদগিরীশ্বর' শিবের মন্দির দেখিলাম। শিব-মন্দির সংলগ্ন দেবীর মন্দির। দেবীর নাম "শাকাম্মা।" পর্ব্বতের চূড়া হইতে বহু নিম্নে তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্ সহরের মন্দির, রাজপথ, সরোবর, বৃক্ষ-শ্রেণী খুব সুন্দর দেখায়। আমরা একদিকের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিয়াছিলাম, অন্যদিকের পথ ধরিয়া নিম্নে সমতলভূমিতে অবতরণ করিলাম।

কৈবর্ত্ত-দিদি

শ্রীরমলা বসু

গ্রামের যখনই যার যা দরকার হোত, "কৈবর্ত্ত দিদি"র তখনি ডাক পড়ত। কারুর ঘরে ধান ভানতে, কারুর ঘরে ডাল বাচতে, কারুর বা গম ভাঙ্গতে, কোথাও বা ক্ষারে সেদ্ধ করে কাপড় কাচতে, বড়ি দিতে, আমসত্ত্ব দিতে, পুজোয় আচ্ছায়, বিয়েতে পার্ব্বণীতে—প্রতি দিন কারু না কারুর ঘরে ডাক তার ছিলই ছিল।

হাসি-মুখে সব কাজই সে করে যেত। তার বদলে যে যা খুসী হয়ে দিত, তাই নিয়েই সে খুসী হয়ে চলে যেত। তা ছাড়া, দুবেলা দুমুটো ভাত, আর বছরে দু একখান কাপড়, কি এক-আধ আঁজলা ধান, চাল, কি দুটো কলা-মুলোও তার প্রায় জুটে যেত। নিজের জন্যে আর কিছু তার দরকারও হোত না। বছরের তিনশো চৌষট্টি দিন তার এমনি ভাবেই কেটে যেত; কিন্তু একটী দিন বাদ—সে দিন বোধ হয় সমস্ত রাজ্যের লোভ কিম্বা হাজার পেয়াদার ভয়েও তাকে তার গ্রামের সীমানার নির্জ্জন নদী-তীরের ক্ষুদ্র কুটীরটুকু থেকে কেউ বার করে আনতে পারত না।

নাম ছিল তার রাসমণি। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সেই নামেই তাকে ডেকে থাকলেও, অল্প-বয়স্কের কাছে সে "কৈবর্ত্ত দিদি" বলেই সুপরিচিত। লোকের বিপদ-আপদে, সুখ-দুঃখে, রোগ-শয্যায় সে অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রসন্ন বদনে, ডাক পড়লেই ছুটে আসত,—লোকের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে দিয়ে। কিন্তু বছরের সেই একটী দিন সে একেবারে নিজের সত্তায় ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে, এমন একটা বিপুল রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করত যে, কারুর সাধ্য ছিল না সে দিন তার সে সুনিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। গ্রামের লোক শেষে, বছরের আর পাঁচটা অবশ্যম্ভাবী তিথি-নক্ষত্রের বিশেষ দিনের মত সেই দিনটাকে "কৈবর্ত্ত দিদির দিন" বলে মেনে নিয়েছিল। তারা জানত, হাজার প্রলোভন, হাজার অনুনয় বিনয়েও সেদিন তাকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

শুধু দূর হতে তার ক্ষুদ্র কুটীরের রুদ্ধ দ্বারটুকু দেখা যেত। কি জানি কি অজানিত সম্ভ্রমে ও ভয়ে সে দিক পানে লোক-চলাচলও যেন সেদিন স্তম্ভিত হয়ে যেত।

বলা বাহুল্য, সংসারে তার রক্তের সম্পর্ক হিসাবে কেউই ছিল না; আর সম্পত্তির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানা বইও আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যেমন ভাবে তার বছরের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটে যেত, তাতে আত্মীয়-স্বজনের অভাব বা খাবার-পরবার অভাবে তার কিছুই এসে যেত না। এমন ভাবে যে সবার মধ্যে কায়মনে

আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, তার সংসারে পর বলে কিছু থাকতে পারে না,—বিশেষ দুবেলা দুমুঠো অন্ন ও এক কোণে একটা ছেঁড়া মাদুরে শয়নেই যার সব অভাব মিটে যায়। এ রকম করে কত বছর কেটে গিয়ে এখন রাসমণির চোখের দৃষ্টি অনেক হ্রাস হয়ে এসেছে, শরীরে সে শক্তিও আর নেই।

* * * *

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে,—রায়-গিন্নীর উঠানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে। পশ্চিমের দাওয়ায় বসে একটা কাঠের উননে মাটীর খোলা চাপিয়ে রাসমণি খোলায় খই খোলা খই ভেজে চলেছে। একটা ছালার উপর তা রাশ করে ঢালা রয়েছে। আর এক পাশে মেজবৌ বসে একটা বড় কড়ায় গরম ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে কতকগুলি মুড়ী নিয়ে একটা কাঠের হাতা দিয়ে নাড়ছে, এমনি ভা একটু ঘন হয়ে এলে, নাড়ু ক'রে করে হাঁড়ীর মধ্যে পুরে রাখা হবে। অন্য দিকে একটু সরে এসে প্রকাণ্ড বঁটী পেতে, রায়-গিন্নী বসে গেছেন রাত্তিরের রান্নার আনাজ কুটতে। বড় বৌ এই মাত্র কাপড় কেচে এসে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে প্রদীপ দেখিয়ে, তুলসীতলায় প্রণাম করে এসেছে। তার পর রান্নাঘরে ঢুকে চালের কুন্‌কী হাতে বার হয়ে এসে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, "মা, রাতের জন্য কত চাল নেব—ঠাকুর তো রুটী খাবেন?" "হ্যাঁ, এই যেমন নেও মা—না ভুলে গেছি—রাসমণির চাল আজ নিও না। আচ্ছা দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে, যদি দুটো খেয়েই যায়। রাসি, আজ তুই বাড়ী যাবি না কি লো?" "হ্যাঁ মা তাই যাব—এই খইকটা হয়ে গেলেই উঠে পড়ব মা।" "তা নয় যাবি যাবি, দুটী রাঁধা ভাত খেয়েই যা না?"

"না মা, এই খোলাটা ভাজা হলেই উঠে পড়ি। আমার ভিটেখান তো কোশভর হবে মা, তাই সকাল সকালই যাব।" "তা তোর সে তেপান্তরের মাঠ—এ রেতের বেলা না গেলেই কি নয় রে। আমার ঘরে বড়ীকটাও বাড়ন্তি, ডালকটাও পচে যেতে চল্ল—কাল দিনটেও ভাল ছিল, তা তোকেও ত কাল মরলেও পাওয়া যাবে না।"

ততক্ষণে শেষ খোলাটা নামিয়ে রেখে জলন্ত উনানের কাঠকটা টেনে এনে ঠুকে ঠুকে নেবাতে নেবাতে রাসমণি বল্লে "না মা, কাল তো আর হবে না। না হয় পরশু ভোরের বেলাই একটা ডুব দিয়ে এসে, যা বল মা, তাই করতে লেগে যাব।"

"হ্যাঁ মা, তা তো জানি। কি সে "বস্তু" তা তুইই জানিস মা, জানতেও দিলিনে কাউকেও।"

অঞ্চলের এক কোণে রায়গিন্নী প্রদত্ত খানিকটা খই মুড়ী ও গুড়ের নাড়ু বেঁধে নিয়ে অন্ধকার গ্রাম্য পথ দিয়ে নির্জ্জন নদী তীরের উঁচু ঢালু জমীটুকুর উপর তার সেই ছোট্ট ভিটেটুকুর পানে সে যতই অগ্রসর হয়ে আসতে লাগল, ততই যেন সমস্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন তার এক নতুন রাজ্যে ডুবে যেতে লাগল। প্রতি বছর এই চব্বিশটা ঘণ্টা সে এমনি করেই এ রাজ্যের মধ্যে বাস করে এসেছে। সে কি উন্মুখ আশায় সমস্ত সত্ত্বা ভরিয়ে দিয়ে—ওঃ সে কত কত বছর হতে চল্ল!!

তখন সে প্রথম নূতন যৌবনে পা দিয়েছে; সমস্ত দেহ-মন তার,—তার সে পরিপূর্ণ জোয়ারে কাণায় কাণায় ভরে এসেছিল—যৌবনের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে।

তার এই শিথিল কালো অঙ্গ, কালো হলেও নিটোল সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল; জীবন একটা সুখের নেশায় কেটে যাচ্ছিল, হলেই বা তাদের দুঃখের সংসার। এই ভিটে-মাটীর প্রত্যেক ইট-কাঠটুকুও যে তার কাছে মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজও বুঝি তাই আছে! কারণ, বছরের বেশীর ভাগ এ ঘরে তার রাত না কাটলেও, আশ্চর্য্য যত্নের ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এর ভেতর-বার রক্ষিত। যদি কেউ প্রবেশের অধিকার পেত, তো এই ক্ষুদ্র সামান্য কুটীরের ভেতরে তার গুছান পারিপাট্য দেখলে অবাক হয়ে যেত।

আর যে ছিল তার এই মধুরতার আধার, সে ছিল তার প্রাণ—সে ছিল যেন তার দিনের আলো—নয়নের মণি। গ্রামের বুড়োদের মধ্যে আজও অস্পষ্ট ভাবে কারুর কারুর "মিহির দাস"কে মনে পড়ে; কিন্তু গ্রামের তরুণেরা কেউই তখন প্রায় এ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়নি। কুটীর-খানার সঙ্গে ছোট একটুকরো জমীও তখন তাদের ছিল। সেই খানেই তরকারীর ফসল করে কোন রকমে তাদের

দুজনকার দিন-গুজরান হোত। কিন্তু তবুও কি সুখের দিন ছিল সেগুলি!

সেই সারাদিন তার সঙ্গে সঙ্গে আবাদের সাহায্য করা—তার পর পরিষ্কার করে দেব-মন্দিরের মত তার কুটীরটুকু লেপে মুছে, ঘরের পাশে বেল ফুল, জুঁই ফুল, তুলসী-তলার ঝাড় বেঁধে—সেই তার জন্যে যত্ন করে দুবেলা দুটী রেঁধে দিয়ে—সেই বাজারে বিক্রী করবার আনাজ থেকে দুটো ভাল জিনিষ লুকিয়ে রেখে তার জন্য ভাল করে রান্না করে—সেই ধরা পড়ে বকুনি! সেই ক্ষার দিয়ে তার আট-হাতী ছোট ধুতিখান পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে—সেই শত-তালি গায়ের মুটীয়া চাদরখানা তালি দিয়ে দিয়ে—সেই সন্ধ্যেবেলা কাজের শেষে ছোট্ট দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুর পেতে, ছোট হুঁকোটায় জলভরে, কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে তামাক সেজে দেওয়া, তখন তার সেই ঠাট্টা "আমার কালা রাঙ্গা বিবি" ব'লে—কল্কের আভায় মুখ তার যখন রাঙ্গা হয়ে উ'ঠত। সারাদিনের খাটুনির পর রাত্তিরে শুয়ে পড়ে পড়েও যার মুখখানার প্রতি চেয়ে থাকতে থাকতে যেন আঁখির আশ মিটত না!

তার পর এলো সেই অকালের দিন। মাঠে মাঠে ধান শুকিয়ে যেতে লাগল, গরু-বাছুর না খেতে পেয়ে মরতে লাগল; মানুষের মধ্যেও জলাভাবে হাহাকার উঠতে লাগল। বরুণ দেবতা কি জানি কি অবসাদে তাঁর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগমনে বিলম্বই করে চলতে লাগলেন। সূর্য্যদেবও বরুণের অবহেলায়, তাঁর মেয়াদের অধিক কর্ম্ম করতে হওয়ার দরুণ, সে কোপ, নিরীহ ধরার উপরই বর্ষণ করে যেতে লাগলেন। গ্রামের পাশের ছোট নদীর দেহ যেন ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত কিশোরীর লাবণ্য-বিশুষ্ক শীর্ণ-জীর্ণ মুখশ্রীর দশায় পরিণত হোল। পানীয় জলেরই টানাটানি,—ক্ষেত আবাদের জল মানুষ কোথায় পাবে?

তার পর এক দিন পৃথিবীর শেষ শ্যামলতার চিহ্নটুকুও প্রায় মুছে যায় বুঝি—এমন মনে হতে লাগল। তখন হঠাৎ অবসাদ-শয্যা থেকে উঠে বরুণদেবের করুণার উদয় হোল। অজস্র বর্ষণে মাঠ ঘাট নদ নালা তিনি কাণায় কাণায় পূর্ণ করে দিতে লাগলেন। ছোট নদীর বুকও আবার আশায় আনন্দে চঞ্চল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে কূলে কূলে ফুলে উঠতে লাগল। পুকুর নালা ভরে গিয়ে পানীয় জলের অভাব মিটল।

যাদের ঘরে সঞ্চিত সম্বল ছিল, তাদের প্রাণ আবার নূতন আবাদের দিকে তাকিয়ে আশায় ভরে গেল; কিন্তু রাসমণি ও মিহির দাসের মত ছোট একটুকরো মাটী চাষ করে "দিন আনি দিন খাই" করে যাদের দিন-গুজরান হোত, তাদের ঘরে বরুণ দেবের এ অসময়ের করুণায় কোন হাহাকারই মেটাতে পারল না। অনেকেই ঘটী বাটী বেচে দিন-গুজরান করে কিম্বা মহাজনের ঋণের দায়ে গিয়ে ঠেকল। রাসমণিরাও শেষ তাদের সুখের সম্বল, আহারের গ্রাস, জমীটুকু বেচে ঋণ শোধ করল।

এমন সময় উজ্জ্বল নদীর বুক বেয়ে কে এক বাবু কোন্ এক সুদূর প্রবাস থেকে নৌকো করে জল-বিহারচ্ছলে গ্রামে এসে দেখা দিল। রাসমণি তখন এটা ওটা এবাড়ী সেবাড়ী করে দু' এক পয়সা রোজগার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর মুখ অন্ধকার করে মিহির ঘরের কোণে বসে আছে। তার মুখে একটুখানি হাসি ফোটাবার জন্য রাসমণির সে কত প্রয়াস! সে বুঝতেই পারে না, নিটোল স্বাস্থ্য ও যৌবনের শক্তি থাকতেও দুজনা পরের কাছে থাকতে পেলে, এমন কি দুঃখ সংসারে আসতে পারে—যার জন্যে একেবারে অমন করে হতাশ ভাবে অবসাদের গহ্বরে ডুবে যেতে হবে! কিন্তু কিছুতেই সে মিহিরকে বোঝাতে পারত না।

এক দিন দত্তবাড়ীর আঙ্গিনা লেপে আঁচলের খুঁটে দুটো পয়সা ও গামছায় কিছু খুদ-কুঁড়ো ও দুটো পাকা বেগুন বেঁধে সে ঘরে ফিরে আসছিল, এমন সময় দেখল, নদী-পার থেকে শিস্ দিতে দিতে মিহির আসছে। প্রথমটা তো তার বিশ্বাসই হোল না, যে, মিহিরই ঘরের কোণ থেকে বার হয়ে এমন করে শিস্ দিতে দিতে আসছে। একই সঙ্গে প্রায় দুজনে ভিতরের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছল। তার পর মিহিরের হতাশ অবসন্ন মুখের পরিবর্ত্তে আশা-উজ্জ্বল চোখ দুটীর দিকে তাকিয়ে প্রাণ তার যেমন আনন্দে ভরে যেতে লাগল, তেমনি তখনি তার কারণ যা শুনতে পেলে, তাতে প্রথমে মনে হোল, তার বুকের কলিজাটা হঠাৎ বুঝি বন্ধ হয়েই যাবে।

তার পর দিন কয়েক কত কান্নাকাটী, অনুনয়-বিনয়ের

পালা চল; কিন্তু মিহিরের মন তখন অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যদেবীর সন্ধানের দিকে একেবারে এমন ঝুঁকে পড়েছে যে, তাকে থামিয়ে রাখা অসাধ্য। নৌকার সেই বাবুটী না কি কোন দূর দেশের বড় সহরের এক কলের বাবু। মিহিরের মত জোয়ান লোকেরই তাঁর খুব দরকার। আর সে দেশে এক স্বাস্থ্য ও শক্তি নিয়ে যে যায়, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে উঠতে তার বেশী দিন লাগে না।

তার সে একটা বছর বই তো নয়? যে দিনটা সে বিদেশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সন্ধানে যাবে, সেই দিনটার তিথি দেখেই ঠিক সে তার বরমাল্য হাতে করে রাসমণির কাছে ফিরে আসবে—তার পর সঙ্গে আনবে কত কি! তারই অফুরন্ত সুখস্পর্শ-কুসুমের কাহিনীতে মাঝের দুটো দিন কেটে গেল।

তার পর এক দিন বাবুর দেওয়া দশটা টাকা ও হাট থেকে কেনা একটা নীলাম্বরী ডুরে ও এক জোড়া গিল্টী-করা খাড়ু রাসমণির আড়ষ্ট হাত দুখানার মধ্যে গুঁজে দিয়ে এক রৌদ্রোজ্জ্বল সোণালী প্রভাতে কোন এক অজানা দূর দেশের পথে সে মিলিয়ে গেল। যাবার সময় কাপড়ের খুঁট দিয়ে রাসমণির ডাগর চোখের অতি-কষ্টে-রোধ-করা অশ্রুজল মোছাতে মোছাতে বলে গেল, "কাঁদিসনে মণি, একটা বছর বই তো নয়—এই দিনেই ঠিক আমি ফিরে আসব। আমার জন্যে নীলাম্বরী ডুরেখানা পরে চুল বেঁধে, খয়েরের টিপ পরে সেজে গুজে তৈয়ের হয়ে থাকিস! আর দেখিস, ঘরে দোরে গোবরছড়া দিয়ে, দুয়োর খুলে রেখে মুখ হাত পা ধোবার জল রাখিস! রান্নাও তৈয়ের রাখিস—গরম গরম! দেরী হয় না যেন সারাপথ ক্লান্ত হয়ে এসে খেতে দেতে! সব ঠিক রাখিস, বুঝলি—ভুলিস নে যেন!"

নৌকার অস্পষ্ট ছায়াটুকু যখন একেবারে দিগন্তের কোণে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল, তখন রাসমণি তার সেই উঁচু ঢিবি থেকে নেমে এসে মিহিরহীন ঘরের দাওয়ায় লুটিয়ে পড়ল, দুদিনের অশ্রুর বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে। তার পর কবে যে সে চোখ মুছে, বুক বেঁধে, বছরের পর বছর সেই একটী তিথির প্রতীক্ষায় চব্বিশ ঘণ্টা তার আবাহনের নীরব পূজার ডালি নিয়ে, বসে বসে কাটিয়ে, শেষে ব্যর্থ অর্ঘ্য নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, পরের দিন আবার শান্ত ভাবে জগতের কর্ম্মচক্রের মধ্যে নিজেকে জুড়ে দিতে শিখেছে, সেদিনের কথা বছরের অন্যান্য দিন ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্চে বটে, কিন্তু এই একটী সাঁঝে আবার তা প্রত্যেক বছরেই ঠিক তেম্নি সতেজ ও নবীন হয়ে ফুটে উঠে। আর সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার পঁচিশ বছরের যুবক মিহির তার বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ ও কুঞ্চিত কেশরাশি নিয়ে এই বৃদ্ধার মন ভুবন-মোহন রূপের স্রোতে ডুবিয়ে দেয়।

... ...

কুটীরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে, কুলুঙ্গি থেকে একটা মাটীর প্রদীপ নিয়ে জেলে, প্রথমেই সে তুলসীতলায় একটা প্রণাম ঠুকে এলো। তার পর ঘরের কোণ থেকে একটা বড় ঘড়া বার করে নদী-পার থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে সমস্ত ঘর দুয়ার উঠান আঙ্গিনা সেই রাতে ব'সেই নিকোতে লাগল। তার পর ঘরের যা দু একটা আসবাব ছিল, সমস্তগুলি ঝেড়ে পুঁছে ঝক্ ঝক্ করে রাখল। যা কিছু বাসনপত্র ছিল, সেগুলিও বার করে বসে বসে মাজতে লাগল।

রায়-গিন্নীদের বাড়ীতে সারাদিন তাকে সেদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়েছিল; কিন্তু তবুও সারারাত জেগে অক্লান্ত ভাবে সে তার কুটীরখানির সংস্কার আরম্ভ করে দিল। ভোরের দিকে অল্প একটু বিশ্রাম করেই লোকজনের ভিড়ের আগেই ভোরের হাটে কিছু মাছ, তরকারী, দুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এলো—অন্যান্য জিনিষ আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। তার পর তার ছোট রান্নাঘরটীতে পাতা দুটো উনুন জেলে পরিপাটি ভাবে নানা আয়োজনের সঙ্গে রেঁধে রেখে দিল। তার পর নদী থেকে স্নান করে এসে সে তার নির্জ্জন ঘরটীর মাঝে আত্মপ্রসাধনে মগ্ন হয়ে গেল।

একটা ছোট কাঠের বাক্স থেকে একখানি নীলাম্বরী সাড়ী বার করে পরিপাটি করে পরল, হাতে দু'গাছা খাড়ুও উঠাল। তার পর সেই বিরল শ্বেত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে সিঁদুরের রেখা মস্ত করে টেনে এনে দিল। লোলচর্ম্ম কুঞ্চিত কপোলের মধ্যে খয়েরের টিপ দিতেও ভুলল না। একটা ছোট পেটরা টেনে তার মধ্যে থেকে আল্‌তা ও কাজল বার করে যথাক্রমে পায়ে ও চোখে পরাল।

তার পর বেলফল গাছ থেকে সংগৃহীত ফুলকটা নিয়ে অতি কষ্টে আন্দাজে আন্দাজে মালা গাঁথলে বসল। কাণ তার সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে রইল, বাহিরের পদশব্দের আশায়!

দাওয়ার এক কোণে একটা পরিষ্কার মাদুর পাতা। তার একপাশে সাজা হুঁকোয় করে জল ভরা। একটা ছোট পানের ডিবেতে সাজা পান। রেকাবীতে নানারকম ফল ও মিষ্টি সাজান। রান্নাঘরের সামনে একটা পীঁড়ি পাতা, গোবরছড়া দেওয়া পরিষ্কার করা, পরিষ্কার গেলাসে জল ও পাত পাড়া। উঠানে ঘড়াভরা জল ও ঝক্-ঝকে সোনার মত গাড়ু ও পরিষ্কার লাল গামছা। শোবার ঘরটীতে তক্তপোষে পরিষ্কার চাদর ও বালিশ পাতা। একটা দড়ীর আলনায় এক জোড়া ধুতি চাদর।

চারিদিকেই অতিথির সাদর অভ্যর্থনার ডালা সাজিয়ে দয়িতের আগমন আশায় উৎফুল্ল হয়ে বছরের পর বছর এই দিনটা তার এমনি ভাবেই ব্যাকুল আগ্রহে কেটে যেত। সারা রাতও তার দীপোজ্জ্বল ঘরটীর মধ্যে আকুল প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হোত। যদি বা পথে আসতে আসতে মিহিরের দেরী হয়ে গিয়ে থাকে—ক্লান্ত চোখ যদি বা নিজের তার কখন ঘুমের আবেশে ভরে আসে, এই ভয়ে দুয়ারের অর্গলও সে রাতে আর বন্ধ করত না—পাছে শ্রান্ত পথিকের এক মুহূর্ত্তও ঘরে ঢুকতে দেরী হয়ে যায়!

এই বিপুল আয়োজনের একটুকুও সে নিজে মুখে স্পর্শ করত না। দেবতার নৈবেদ্যের মত পরদিন তা নদীজলে ভাসিয়ে দিয়ে আসত; কিম্বা পথে কোন ভিখারীকে পেলে দান করে ফেলত। এমনি করেই পঁচিশ বছর তার এসেছে ও বিফল প্রতীক্ষার ডালি নিয়ে ফিরে গেছে।

* * * *

সন্ধ্যার গাঢ় কালিমা ঘনিয়ে এসেছে। লোকালয় এড়িয়ে এড়িয়ে পথিক ক্লান্ত ভাবে পথ বেয়ে চলেছে। আজ কত দিন যে সে এমনি ভাবেই পথে পথে চলেছে তার ঠিকানা নেই। দিনের বেলায় কোন ঝোপে-ঝাপে আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে নিশাচরের মত রাত্তিরের অন্ধকারে পেটের জ্বালায় বার হয়ে এধার ওধার খাবার সন্ধান করে বেড়ায়। কখন বা গৃহস্থের ক্ষেত থেকে মূলোটা-আশটা চুরি করে কোন রকমে ক্ষুধার শান্তি করে। লোকালয় হতে তাড়িত বন্য পশুর মত অবস্থা হয়েছে তার। এমনি করে দিনের পর দিন আইনের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে সে বেড়াচ্ছে।

বিচার-স্থান হতে অনেক দূরে এসে পড়লেও তবু দোষী মন তার মানুষের সমাজে ভয়ে মুখ দেখাতে সাহস পাচ্ছে না। বলিষ্ঠ দেহখানি তার পরিপুষ্ট আকার এখনও না হারালেও, চোখ দুটী অল্পাহারে ও দুশ্চিন্তায় কোটরে ঢুকে তার মধ্যে থেকে ক্ষুধিত বন্য পশুর মত যেন জ্বলছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ চুল চোখের উপর এসে পড়ছে।

নির্জ্জন নদীতটে লোকালয় হতে দূরে একখানা কুটীরে আলোর সন্ধান পেয়ে ক্ষুধিত ক্লান্ত দেহখানা যেন সে তার অজ্ঞাতসারেই সে দিকে অগ্রসর হয়ে চল্লো। তার পর কখন যে পা দুটো তার উন্মুক্ত গৃহদ্বার দিয়ে একেবারে ভেতরে একখান ঘরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হোল, তা সে জানতেও পারল না।

তার পর হঠাৎ দেখল এক পাগলিনী মূর্ত্তি না কি মালা হাতে অগ্রসর হয়ে তার লোলচর্ম্ম দুখানা হাত দিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরলে। পাগলিনী ছাড়া সে মূর্ত্তিকে আর কিছুই বলা যায় না,—বৃদ্ধার দেহে এমন নিপুণ করে তরুণীর সাজ-সজ্জা ও স্বপ্নাবেশ-মণ্ডিত চোখের দৃষ্টিতে তাকে এ ছাড়া আর কিছু কেউ ভাবতেও পারত না। যুবকের চমক ভেঙ্গে প্রথমেই ইচ্ছা হোল আত্মরক্ষার্থে এর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার; কিন্তু তারি সঙ্গে বৃদ্ধার অপূর্ব্ব ব্যবহারে তার কৌতূহলও হোল যথেষ্ট; আর ততক্ষণে পালিয়ে যাবার সুযোগও সে হারালে।

"এসো, এসো—এতদিন পরে বুঝি তোমার আসবার অবসর হোল? আমি যে কত তিথি ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি! এসো, এসো—বড় ক্লান্ত হয়ে গেছ, তাই বুঝি আর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না?···থাক্—এখন আর কিছু বলতে হবে না।···চল, ঐখানে পা ধোবার জল রেখেছি...। থাক—হাত সরিয়ে দিচ্ছ কেন? পা দুটী আমিই ধুইয়ে দি এসো...ধুইয়ে কি দিই নি কখনো? কত ধুলো জমে আছে পায়...কত দূর থেকে আসতে হয়েছে বুঝি...তাই এতো দেরী হোল! এবার এদিকে এসো, একটু জল খেয়ে নেবে—তার পর সব খাবার গরম করে রেখেছি, খাবে এসো।...আহা! পথে আসতে কিছু বুঝি মুখে দেবার জুটেনি, এত ক্ষিধেও পেয়েছিল তাই!

যাট্—চোখ দেব না। আমারি আন্দাজের ভুল হয় গেছে। আহা! আরো চারটী যদি বেশী করে রেঁধে রাখতাম।··· পিঠে? হ্যাঁ আরো কটা আছে বই কি। এখনি এনে দিচ্ছি; মাথা খাও...উঠে পড়ো না যেন।...জল গড়িয়ে আনব? বেশ—এখনি আনছি।...কথা বলতে ইচ্ছে করছে না? বড় ক্লান্ত আছ বুঝি? হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি। একটু দাবে চল মাদুরের উপর, আমি তামাক সেজে আনি।···বসবে না? শোবে? আচ্ছা বেশ, আমিও তোমার পাতে দুটো প্রসাদ করে এই এলাম বলে—ঘুমিয়ে পড় না কিন্তু। কত কথা বলবার আছে। এই দুটো মালা গেঁথে রেখেছি, দেখেছ? একটা তুমি আমায় পরিয়ে দেবে, কেমন? আজ "ফের" করে আমাদের বাসর-রাত হবে।···এ কি, ও কি, ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে যে? আমি আসব কি করে?···আমি, আমি যে তোমার মণি, মণিয়া—চিনতে পাচ্ছ না—ও কি? আচ্ছা থাক্—আজ বড় ক্লান্ত আছ বুঝতে পারছি—আচ্ছা, আমি আজ এই সামনের দাওয়াটাতে শুয়ে থাকব।···"

শয়ন-কুঠুরীর ভেতর থেকে ভাল করে খিল টেনে দিয়ে যুবক মনে মনে বলে উঠল "উঃ, বুড়ীর পাল্লা থেকে আচ্ছা বাঁচন বাঁচলাম। নিশ্চয় একটা পাগলী হবে, নইলে এমন বেশ আর "ফোগলা" দাঁতের ভেতর থেকে এমন সব উচ্ছ্বাসের কথা! আমায় কি ঠাউরেছে বুড়ী কে জানে! কিন্তু ভাগ্যে শুধু একটা পাগলী—তাও কিছু মারাত্মক রকমের নয়,—অনেক দিন পরে খেয়ে নেওয়া গেল খুব এক চোট। আজ আমার বরাত ছিল ভাল। আর হিঃ-হিঃ—জল আনবার ছুতো ক'রে বুড়ীকে পাঠিয়ে এই পিঠে কটাও চাদরের খুঁটে বেঁধে নিয়েছি, আর এক দিনের খোরাক চলবে এখন। তার পর এই মালা দুটো দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেই হয়েছিল আর কি! আচ্ছা ফন্দি করে পার পেয়েছি। এখন বুড়ীর নাকের ডাক শুনতে পেলেই এ পাগলা গারদ থেকে দে চম্পট।

* * * *

পরদিন মধ্যাহ্নেও যখন গ্রাম মধ্যে কারুর ঘরেই কর্ম্মনিরতা "কৈবর্ত্ত-দিদিকে" দেখতে পাওয়া গেল না, আর জলের ধারে জেলেরাও বল্লে—সকালে উঠে খাবার হাতে নদীর দিকেও কেউ তাকে আসতে দেখেনি,—তখন গ্রামের লোকের মনে নানা রকম সন্দেহ হতে লাগল। এ রকম ধারা তো তারা কোন দিনও হতে দেখেনি। তখন কয়েকজনে মিলে তার নির্জ্জন ধ্যান-কুটীরের দিকে সাহস করে অগ্রসর হতে লাগল। সামনে এসে দেখল, দুয়ারটা খোলা পড়ে আছে। ভেতরে গিয়ে প্রথম দেখে মনে হোল, উৎসবান্তে ঘর-দুয়ারের চেহারা যে রকম হয়, সেই রকম। চারিদিকে সাজান গোছান; কিন্তু তা যেন কেউ ব্যবহার ও ভোগ করে গেছে, এমন ধারা।

উঠানের এক পাশে এক ঢাল এঁটো বাসন ও খাবারের উচ্ছিষ্ট, কিন্তু খেলে কে? এমন ধারা হতে তো কোন দিন শুনতে পাওয়া যায় নি! যদিও সেদিনকার মত কৈবর্ত্ত-দিদি নিজেকে এক সুনিবিড় রহস্যজালে সুদৃঢ় করে বেঁধে রাখত, তবু গাঁয়ের লোকের জানতে বাকী থাকত না যে, সে দিন তার ঘরে এক পর্ব্বের ভোজ রাঁধা হোত, আর সে ভোজ যে কেউ ভোগ করত না ও পরদিনে হয় নদীর জলে কিম্বা কোন রাস্তার ভিখারীর ভাগ্যে তা জুটত, তাও কারুর অবিদিত ছিল না।

তার পর তারা দেখতে পেলে, ভেজানো শোবার কুঠুরীর বিছানা-পত্তর ওলট-পালট করা, আর তারই এ পাশে বাহিরের পানে দরজা ঘেঁষে চৌকাঠের কাছে মাথা রেখে তাদেরই কৈবর্ত্ত-দিদি এক অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে—হাতে তার দুগাছা শুকনো বেল ফুলের মালা। দেহ স্পন্দহীন, তুষারের মত কঠিন ও শীতল।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে বিফল প্রতীক্ষায় কাল্পনিক তৃপ্তিতে ক্লান্ত হয়ে প্রাণ তার বুঝি কোন অজানা লোকে দয়িতের অভিসারে নিজেই আজ দেহ-ছাড়া হয়ে পড়েছে!

ব্রিটিশ আফ্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৪)

নাইগার নদী-তীরবর্ত্তী দীর্ঘ অপরিসর ভূখণ্ডে আর একদল কৃষ্ণকায় জাতি বাস করে। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সমস্তই প্রায় যোরুবা দেশবাসীদের অনুরূপ। তারা বহুকাল হাউশাদের প্রভুত্বাধীনে ছিল; পরে ফুলানীরা এসে তাদের দেশ জয় করে নিয়ে তাদের উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

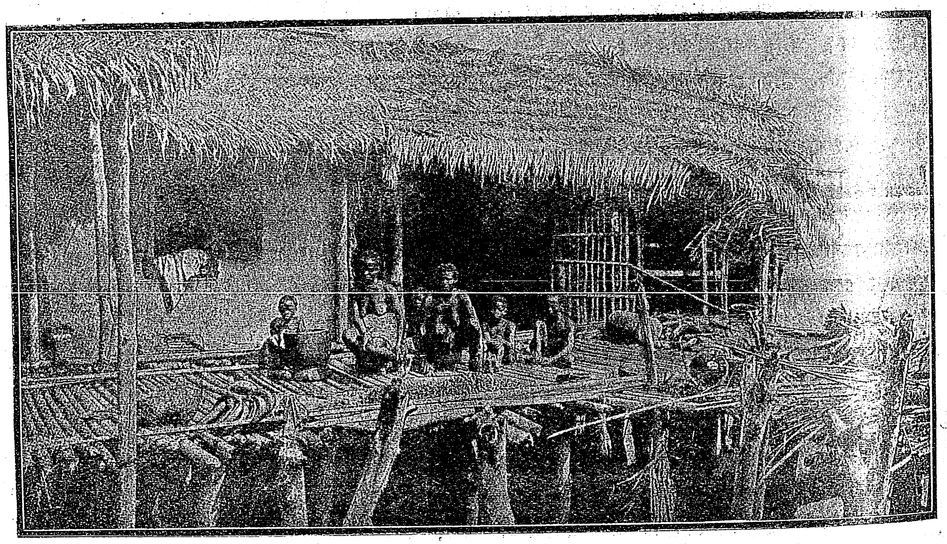

মাচার উপর ঘর

('সুবর্ণ-তীরা'বাসীরা দোতলার সমান উঁচু মাচার উপর গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে। কারণ সমুদ্রতীরস্থ জলাভূমি বাসের অযোগ্য। তা ছাড়া এটা শত্রুর আক্রমণ থেকে গৃহ রক্ষা করবারও একটা উপায়।)

নদীর পরপারে যে বিশাল ভূখণ্ড, সেইখানে আফ্রিকার অতীত ও বর্ত্তমানের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। সেইখানে ঘোর কৃষ্ণকায় হাউশা ও নাতিকৃষ্ণবর্ণ ফুলানী এই দুই রহস্যময় শক্তিশালী কাফ্রী জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য নিয়ে পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ হয়ে গেছে! আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে এই হাউশারাই হচ্ছে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি। এদের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার যে একটা সুদূর ভিত্তি আছে, সেটা, তাদের কারুকার্য্য ও শিল্পকলার মধ্যে, 'কানো' প্রভৃতি প্রাচীর-বেষ্টিত সুপ্রতিষ্ঠিত নগরীর মধ্যে, এবং তাদের চার বছরের পুরাতন ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে, যা ভূমধ্যসাগর থেকে নাইগার ও নীলনদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত।

এরাই এক দিন তূলার চাষ করে' সেই তূলা থেকে নানা বর্ণের সূতা প্রস্তুত করে' বিচিত্র বর্ণের পোষাক

বয়ন করেছিল। এরাই এক দিন বিশ্ববিখ্যাত মরোক্কো চামড়ার সৃষ্টি করেছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর সমস্ত কাফ্রী-দেরই এরা পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছে। এরা

বিলাতী সাজে

(সুবর্ণ-তীরাধিবাসিনীরা অনেকেই আজকাল য়ুরোপীয় মহিলাদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে।)

নিম্ন শ্রেণীর নিগ্রোদের শিক্ষিত ক'রে নিয়ে নিজেদের জাতে তুলে নেয়। এদের দৈহিক শক্তি আশ্চর্য্য রকম বেশী। একমণ দেড়মণ ভারি বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে এরা সারাদিন অনায়াসে পথ চলতে পারে!

পুরাকালে হাউশারাই ছিল অফ্রিকার সবচেয়ে বীর

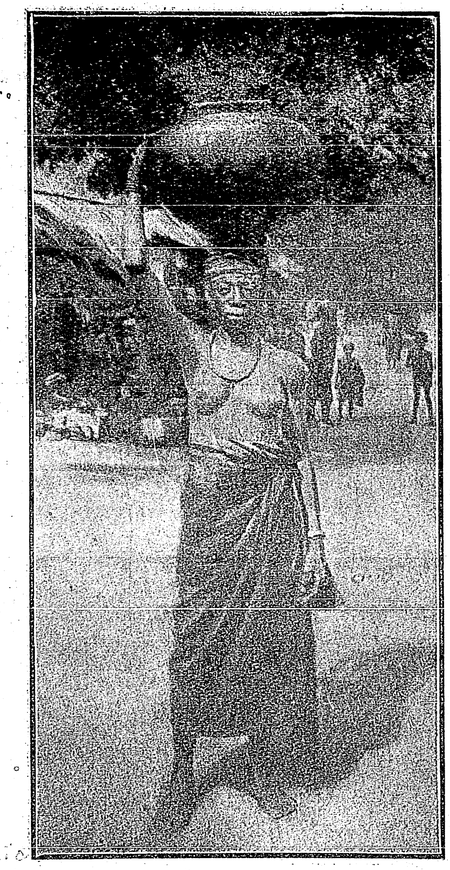

জল্‌কে চলে

(এরা কাঁখে কলসী নেয় না, মাথার উপর রেখে পথ চলে।)

যোদ্ধা। তারাই আবার ক্রীতদাস সংগ্রহ করবার প্রধান উদ্যোগী ছিল। এক দিকে তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ করেছে, অন্যদিকে খাঁটি নিগ্রোদের পদানত করে নিজেদের চাষবাসের কাজে দাসের মতো খাটিয়ে নিয়েছে। সেকালে

নকাই-ক্ষেতে । (আশান্তি কৃষকবালা । ক্ষেতে নকাই সংগ্রহ করছে)

ভোজ্য-প্রস্তুতকারিণীদ্বয় ।

বেকীভাই সর্দ্দারের দরবার

(প্রকাণ্ড রাজছত্রতলে উচ্চ বেদীর উপর স্বর্ণ-অলঙ্কার ও সুবর্ণ-অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আমিরী চালে বেকীভাই সর্দ্দার উপবিষ্ট । তার আশে পাশে বন্ধু, সহযোগী, অনুচর, ভৃত্য ও বাদক দল সমবেত ।)

কাফ্রি তাঁতি তাঁত বুনছে

সকল দিক দিয়েই এরা এত প্রবল ও প্রধান হ'য়ে উঠেছিল যে, এদের ভাষা তখন সমগ্র আফ্রিকার চলিত ভাষা হয়ে উঠেছিল।

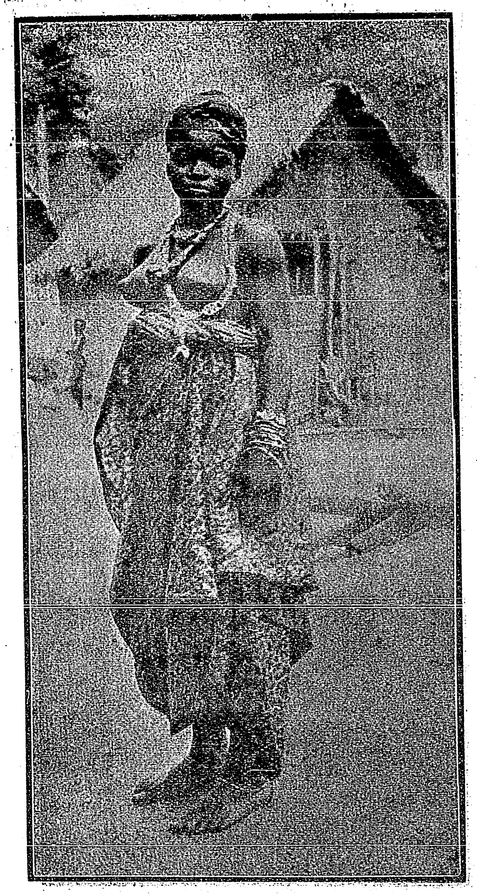

কাফ্রি ক'নে

(চুমদার রেশমী সাড়ী অলঙ্কার ও শিরভূষণ পরে' বিবাহের বধূ বেশে সুসজ্জিতা কাফ্রী তরুণী।)

আজ আর এদের সে প্রতাপ নেই। এদের লোক সংখ্যা এখন এত কমে গেছে যে, 'কানো' আর 'শোকোতোর' কিয়দংশ ছাড়া আর কোথাও এদের তেমন জনপূর্ণ বসতি দেখতে পাওয়া যায় না।

হাউশাদের অবনতির দিনে ফুলানীরা তাদের অসংখ্য গরুর পাল নিয়ে এদের জমীর উপর প্রথমে চরাতে আসতো। গরু চরার জন্য জমী সারবান হ'তো বলে হাউশারা এদের বাধা দিত না; কিন্তু এক দিন এই ফুলানীদের একজন মুসলমান সর্দার ওশমান হাউশাদের সঙ্গে যুদ্ধ

মাপন-রাজ

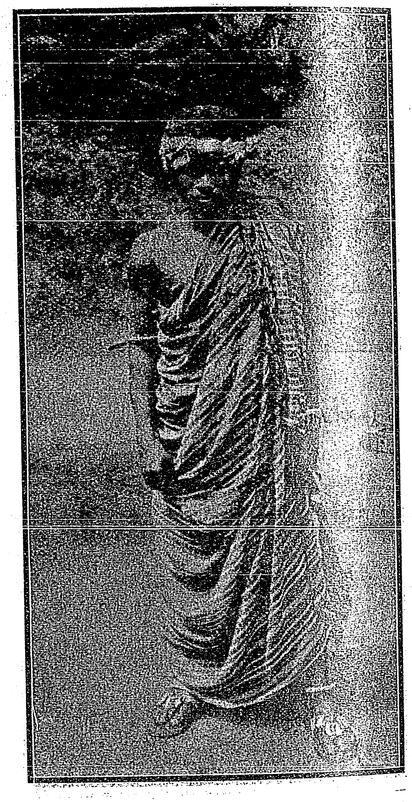

(মস্তকে কেশবন্ধনী, চরণে পাদুকা ও দৃঢ় বলিষ্ঠ পেশী সন্নিবেশিত সুগঠিত অঙ্গে বিচিত্র উত্তরীয় জড়িয়ে মাপন-রাজ দাঁড়িয়ে আছেন যেন এক প্রাচীন রোমক সম্রাট।)

ঘোষণা ক'রে তাদের পরাস্ত করে শোকোতোয় নিজের রাজধানী স্থাপন ক'রে হাউশাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

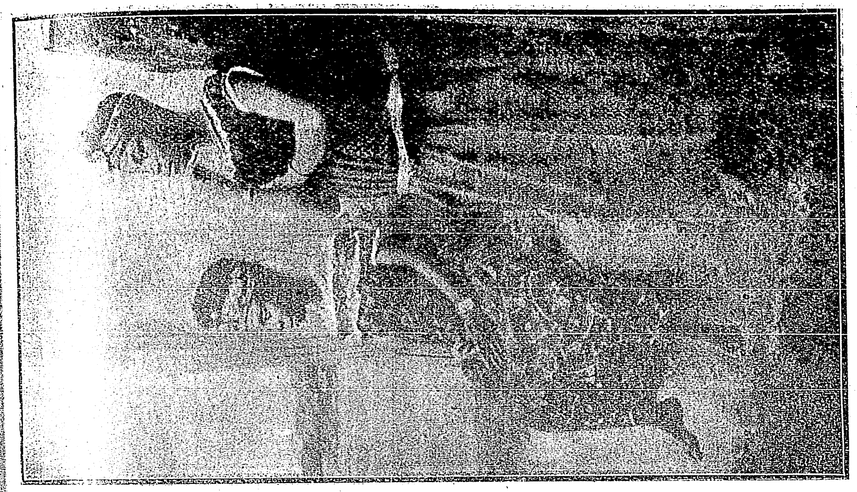

শিরোভূষণ (য়ুরোপীয় মহিলাদের পোষাক পরলেও এরা কিন্তু 'হ্যাটের' পক্ষপাতী নয়। 'হ্যাটে'র পরিবর্ত্তে এরা পাগড়ীর মতো একরকম টুপী পরতে ভালবাসে।)

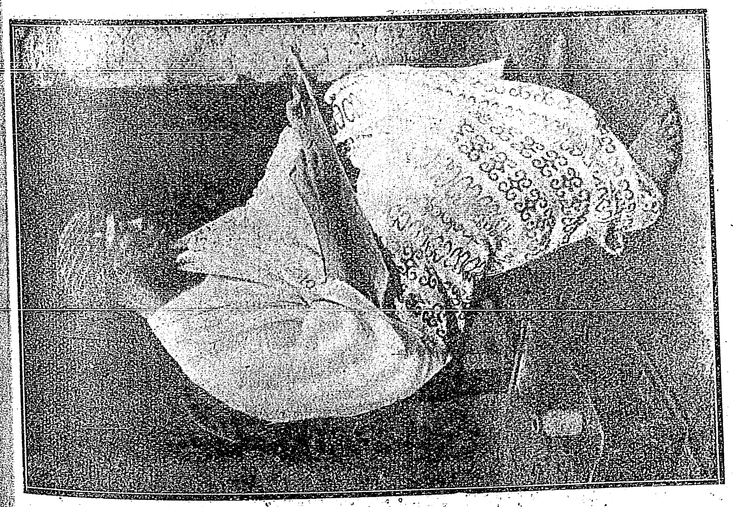

গুরুমশাই !

(মুসলমান কাফ্রীদের মধ্যে পাঠশালা আছে। বৃদ্ধ গুরুমশাই বা কাফ্রি মৌলভী সাহেব সেখানে নিগ্রো ছেলেদের লেখাপড়া শেখান।)

ফুলানীদের শাসন-পদ্ধতি ভাল হ'লেও শাসকরা অনেকেই ভাল ছিল না। কাজে কাজেই তাদের অত্যাচারে হাউশারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং সেখানে ইংরাজের পদার্পণকে তারা সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়ে তাদেরই সাহায্যে আবার ফুলানীদের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে নিয়েছে।

সুবর্ণ-তীরবাসিনী তরুণী।
(ক্ষেত থেকে ফেরবার পথে মাথার মকাইয়ের বোঝাটা একটু নামিয়ে রেখে ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রছে।)

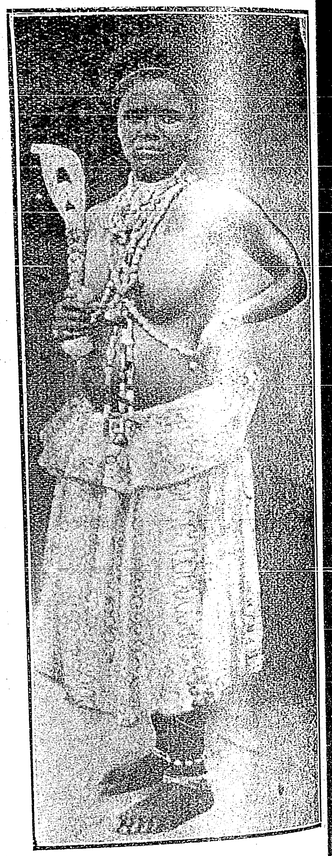

আখ্‌ড়ার গুরুমা!
(ইনি মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে পারদর্শিনী। একটী প্রতীক্ উপাসক সম্প্রদায়ের ইনিই গুরুমা বা গোঁসাই ঠাকুরণ।)

বাউলটীর পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও যে সব বর্ব্বর আদিম নিগ্রোরা বাস ক'রে, তারা তাদের প্রাচীন রাক্ষস-প্রবৃত্তি ভুলতে পারেনি। এখনও নরমাংস ভোজনের লোভে তারা আত্মীয়দের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না!

বেণুনদী-তীরেও যে সব আদিম কৃষ্ণকায় জাতি বাস ক'রে, তাদের মধ্যে মুন্‌সী, বাস্কামা, মামাংঙ্গে প্রভৃতি জাতিরা ভয়ানক হিংস্র, রক্তলোলুপ ও যুদ্ধপ্রিয় দুর্দ্দান্ত জাত। এরা

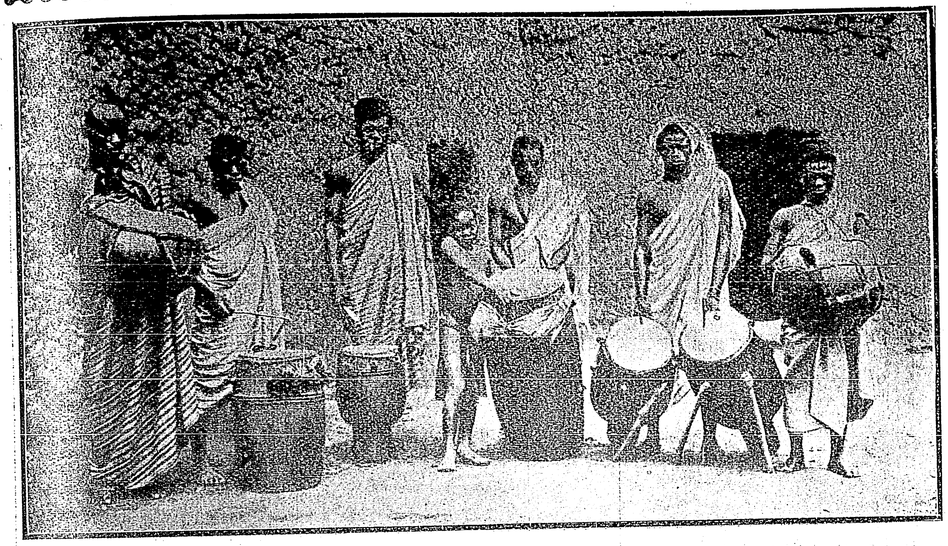

বুট্ কুরাজের দামামাদল। (সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ঢাক ঢোল ও দামামার সাঙ্কেতিক বোল বা ভাষা আছে, যা সাধারণের পরিচিত। প্রত্যেক কাফ্রী সর্দ্দারের নিয়োজিত বাদকদলের পৃথক পৃথক নিজস্ব বোল আছে।)

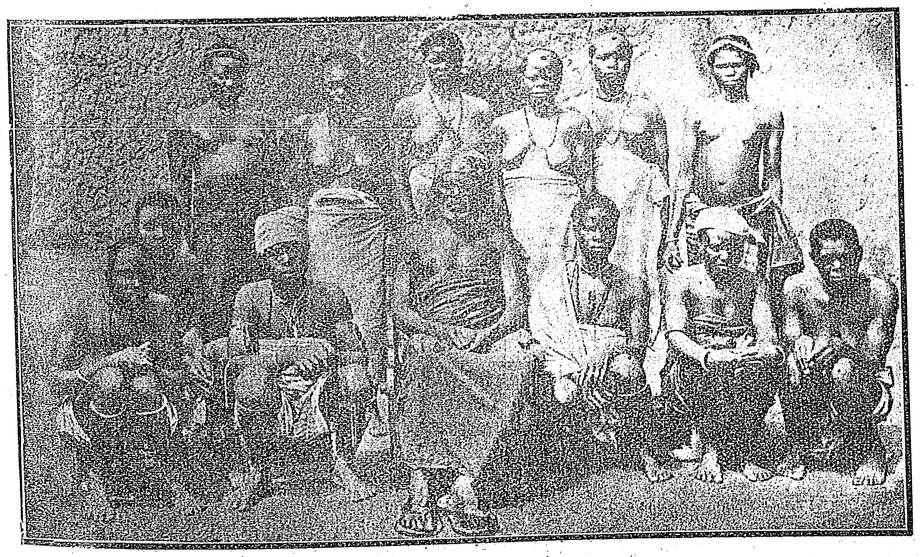

বণ্টুকু সর্দ্দার ও তাঁর দ্বাদশ পত্নী। (সুবর্ণ-তীরবাসিনীরা সতীনের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে জানে বলে সেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে অশান্তি দেখা যায় না।)

মধ্যে এখনও কোনও সমাজবন্ধন স্থাপিত হয়নি, এমন কি এরা এখনও জাতি হিসাবেও দলবদ্ধ হয়ে বাস ক'রতে শেখেনি!

নাইগেরীয়ার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে বোর্ণূদের রাজত্ব। দাস-ব্যবসায়ই ছিল তাদের জাতীয় পেশা। চাঁদ হ্রদ-তীরবর্ত্তী তাদের প্রবল পরাক্রান্ত সহর 'কুকা' থেকে তারা প্রতি বৎসর অসংখ্য উটের গাড়ী পূর্ণ করে দেশ-বিদেশে 'দাস' চালান দিতো। তাদের বাসগৃহ আজকাল

কীওাম্পুর বারিবাহিনী
(এই আশান্তি তরুণীর দেহ সৌষ্ঠব যে কোনও ভাস্করের তক্ষণাদর্শ।)

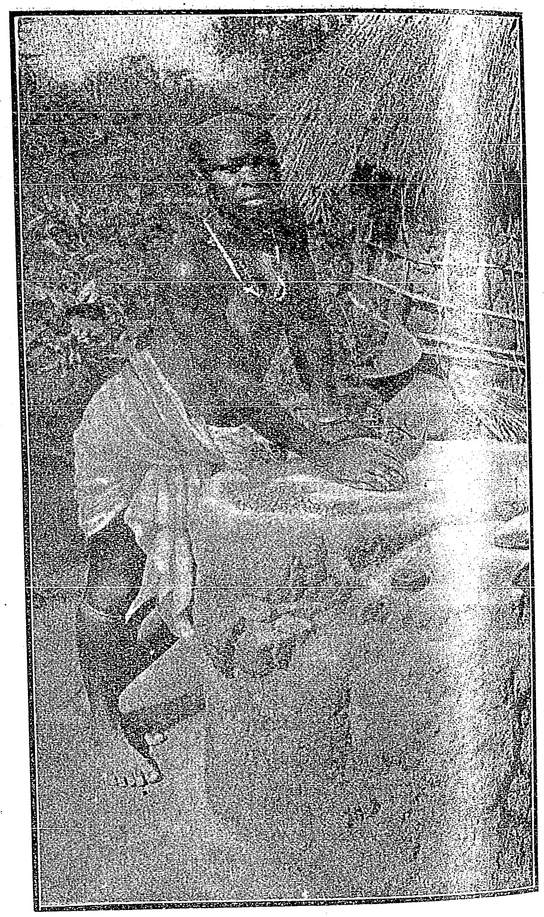

গামান নিগ্রো বালা
(ভুট্টার দানা শিলে বেঁটে গুঁড়িয়ে নিচ্ছে।)

বোর্ণূয়া ঠিক খাঁটি নিগ্রো নয়, নিগ্রো ও লাইবীয়ান্ কাফ্রী-দের সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি বলে এদের মুখ সব চওড়া এবং নাকগুলি চ্যাপ্টা! প্রায় হাজার বছর ধ'রে অধিকাংশই খড়কুটোয় তৈরি। তাদের প্রাচীন রাজধানী বিসীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও রাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদ-প্রাচীরের পাকা ইটের গাঁথুনি দেখতে পাওয়া যায়।

বোর্ণূর 'কাণুরা' মেয়েরা নিগ্রোদের মধ্যে সব চেয়ে কুৎসিত দেখ্‌তে; কিন্তু আচারে ব্যবহারে সভ্যতায় ভব্যতায় এই 'কাণুরা' জাতটাই সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত। তারা কৃষিকার্য্যে উত্তম পারদর্শী; শিল্প ও কারুকার্য্যেও বেশ সুদক্ষ। এদের সামাজিক ও শাসন-ব্যবস্থায় একটা সুবিধি আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারে সমাজ বা শাসনকর্ত্তারা অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারী।

বোর্ণূর বীর যোদ্ধাদের পরিচ্ছদ অতি চমৎকার! এরা দস্তুরমতো বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করে! তুয়ারেগ্, তেবা, কানেম্বু ও সুবা আরবদের বিচিত্র পোষাকও উল্লেখযোগ্য।

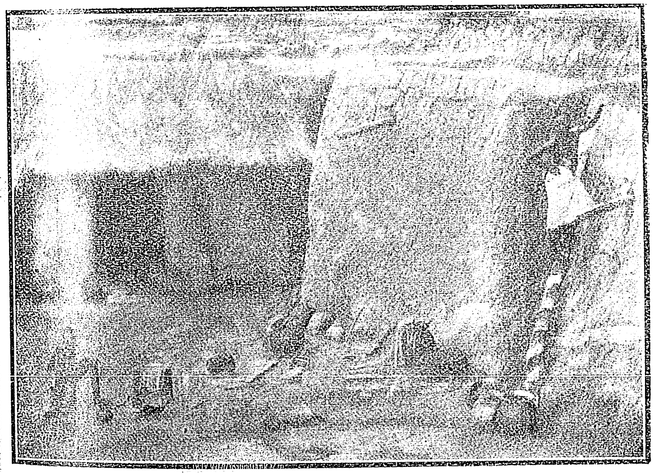

ফাণ্ডিদের ছাদের সিঁড়ি
(একটা মোটা খোঁটায় খাঁজ কেটে-কেটে এরা ছাদে ওঠ্‌বার সিঁড়ি তৈয়ার করে রাখে। শত্রুরা আক্রমণ করলে এরা ছাদে উঠে প'ড়ে সিঁড়িটা উপরে তুলে নেয় এবং ছাদের উপর থেকে শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর মারে।)

মাত্র বিশ বৎসর পূর্ব্বে নিগ্রোরা রাব্‌টার অধীনে বোর্ণূ আক্রমণ ক'রে, সুলতানকে পরাস্ত ক'রে বোর্ণূর রাজবাটী বিধ্বস্ত ক'রে তাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু বোর্ণূরা তাদের প্রতিবেশী হাউশাদের মতো শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে ক্রমে ক্রমে তাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় অর্জ্জন করছে!

ইংরাজদের পদার্পণের পর সেখানে মোটরগাড়ী, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায় উত্তর নাইগেরীয়ার প্রাচীন ভূমি আজ আবার নব সম্পদে ও নবজীবনে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে।

ফুলানী আমীররাই হ'চ্ছে দেশের শাসনকর্ত্তা; তবে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের আদেশ উপদেশ ও পরামর্শ মতোই তাদের চলতে হয়। রাজস্ব যা আদায় হয়, সে টাকা ইংরাজদের কতক ভাগ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ তারা ভোগ করে। তবে ইংরাজদের সতর্ক দৃষ্টির উপর থাকায় তারা প্রজাদের উপর আর পূর্ব্বের মতো অযথা উৎপীড়ন করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে পারে না। যুদ্ধের সময় এরা ইংরাজদের প্রায় বাইশ তেইশ লক্ষ টাকা দান করেছে।

দক্ষিণ নাইগেরীয়াতেও যোরুবাস, বেনা ও এগবাদের মধ্যে ঠিক এইরূপ শাসন-পদ্ধতিই প্রচলিত হ'য়েছে। দক্ষিণ নাইগেরীয়ার প্রধান সহর টোগো থেকে প্রাচীন সহর কোনো পর্য্যন্ত এবং হার্কোট বন্দর থেকে উদী কয়লার খনি অবধি প্রায় হাজার মাইল রেলপথ বিস্তৃত হ'য়েছে; এবং উদী থেকে কাদুনা পর্য্যন্ত আরও পাঁচশত মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হচ্ছে। দক্ষিণ নাইগেরীয়া তুলার চাষের জন্য বিখ্যাত। ভবিষ্যতে এখানে তুলার চাষ যে আরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, এটা খুবই আশা করা যায়।

নাইগেরীয়ার পরই আফ্রিকার 'গোল্ড কোষ্ট্' বা 'সুবর্ণ-বেলা' উপনিবেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপনিবেশের অধীনেই আবার আশান্তি উপনিবেশ উত্তর-রাজ্য (North territories) এবং ব্রিটিশ 'টোগো ভূমি' (Togo Land) সন্নিবেশিত। এ সকল প্রদেশের অধিকাংশেই বর্ব্বর, মূর্ত্তি-উপাসক নিগ্রোদের বাস। এরা প্রবল জ্বরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে এসে আজকাল সহরে

বসবাস করছে। তা বলে যে জঙ্গলগুলি একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়েছে তা নয়। এখনও জঙ্গলেও বহু নিগ্রো থাকে। সমুদ্রতীরে প্রায় সাড়ে তিনশত মাইল-ব্যাপী বালুকাময় ভূখণ্ডে অন্যূন পঞ্চাশ রকম বিভিন্নজাতীয় নিগ্রো বাস করে। এদের মধ্যে তিনচার রকম ভাষা প্রচলিত। কাফ্রিভাষার মধ্যে 'ইয়ু' ও 'চিঙ্গ' এই দুটি ভাষা নিম্ন শ্রেণীর নিগ্রেরো খুব বেশী ব্যবহার করে। উত্তর আফ্রিকায় হাউশাদের ভাষাই প্রধান এবং দক্ষিণে ফাণ্ডিদের ভাষা প্রচলিত।

কোকোর চাষটাই নিগ্রোদের প্রধান কৃষি-ব্যবসায়। মুসলমান মৌলভী ও খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও আফ্রিকার বর্ব্বর নিগ্রোরা অধিকাংশই তাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেনি। তাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের বেশী মুসলমান পাওয়া যায় না এবং খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা সাতজন মাত্র। বাকী সবাই সেই মূর্ত্তি ও পুতুল পূজা এবং ভূতপ্রেতের উপাসনা করে।

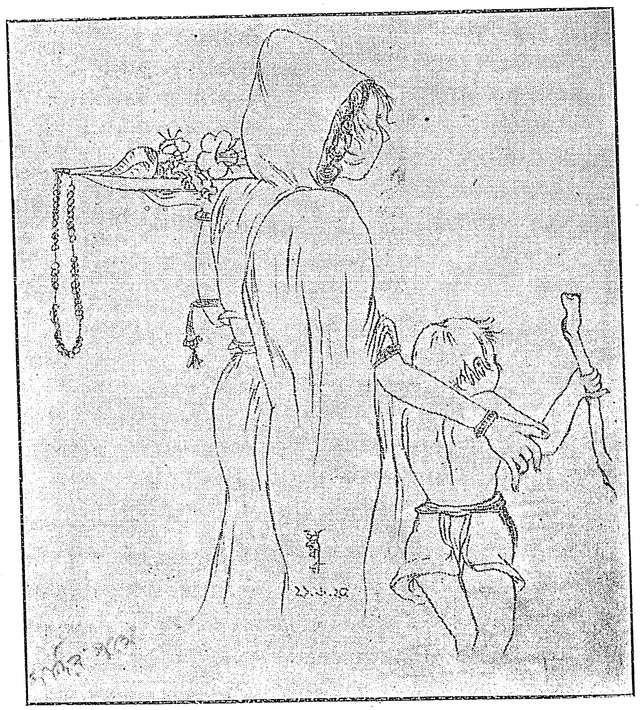

মন্দির-পথে

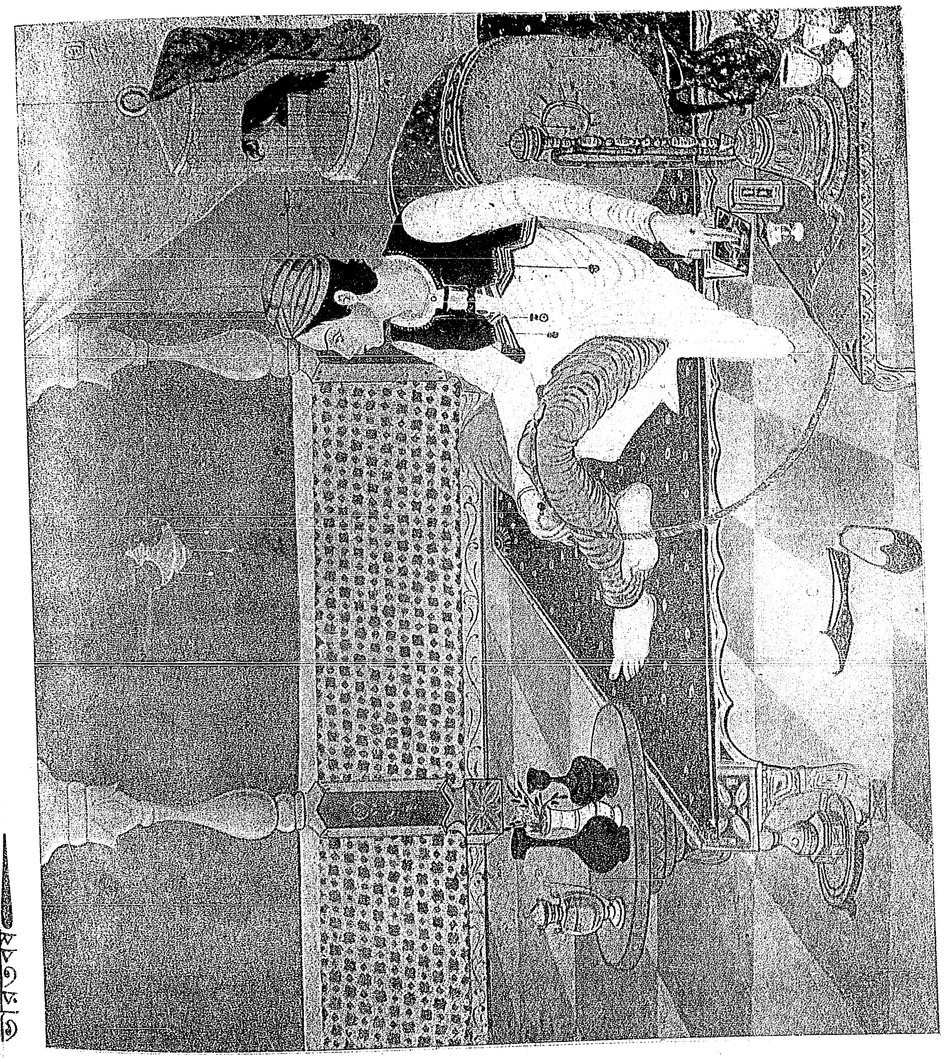

দিবাস্বপ্ন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বাস্তব উপন্যাস

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল-এম্-এস্

"উপন্যাস" বলিলে, কল্পিত কথাকেই বুঝায়। মানুষ মাত্রেই কল্পনাপ্রিয়। এই জন্য আজকাল উপন্যাসে বারো আনা কলেবর না পূর্ণ করিলে, কোনও বাঙ্গালা মাসিক পত্র বিকায় না। আমি উপন্যাস-লেখকও নহি, এবং কল্পিত কথারও অবতারণা করিতে বসি নাই। তবে, শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির—এই দুর্লভ নরদেহের মধ্যে, উপন্যাসের অপেক্ষাও বহুগুণ চিত্তাকর্ষক এমন ব্যাপার কতকগুলি আছে, যদ্বিষয় পাঠ করিলে বিস্ময়ে ও পুলকে মন ভরিয়া উঠে। আজ আমি তাহাদিগের মধ্যে একটি বিষয়ের কথা বলিব—জানি না, সেরূপ মনোমুগ্ধকর ভাবে বলিতে পারিব কি না। বাস্তব নরদেহে, উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক বিষয়ের কথা বলিব বলিয়াই এই প্রবন্ধের শিরোদেশে, "কাঁঠালের আমসত্ত্ব," "সোণার পাথর বাটী," "একাদশীর দিনে জন্মাষ্টমী" প্রভৃতির ন্যায় ভাষায় "বাস্তবে উপন্যাস" রূপ অদ্ভুত নামকরণ করিয়াছি।

আমার বক্তব্য বিষয়টির বাঙ্গালা নামকরণ এখনো হয় নাই। ইংরাজীতে ইহাকে

ক্লড্ বার্ণার্ড বলেন—ইণ্টার্ণাল্ সিক্রিসান্

হাঁলিং বলেন—হর্ম্মোন

সেফার বলেন—অটাফয়েড { উত্তেজকগুলিকে—হর্ম্মোন / অবসাদকগুলিকে—চ্যালোন

এই শ্রুতিকঠোর নামগুলি শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না—যেহেতু প্রত্যেক প্রতিশব্দই অতি সুন্দর ভাবে বিষয়টির পরিচায়ক। এই কারণে, আমরা যথাসম্ভব ঐ কথাগুলির ভাবার্থও দিব। আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিব—তাহা পূর্ব্বে কোনও দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে ছিল না বিধায়ে, এই বিষয়ের ঠিক্ নাম দেওয়া সম্ভবপর নয়। "এণ্ডোক্রাইন" শব্দটি "অন্তঃসলিলা"র ভাব-জ্ঞাপক। "হর্ম্মোন" শব্দটি কর্ম্মে প্রবৃত্তিদান করা অর্থ-জ্ঞাপক। "চ্যালোন" শব্দটি অবসাদজ্ঞাপক এবং "অটাফয়েড্" কথাটি, আত্ম-চিকিৎসা অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, যে বিষয়টির কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা অন্তঃসলিলা হইয়া দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং দৈহিক কোনও কোনও ব্যাধির সম্ভাবনা ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারও করে। যে জিনিসটির বিষয়ে আমরা জানিতে চাহিতেছি, সেই জিনিসই মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয় এবং দৈহিক কোনও দুষ্ট অংশকে দমনে রাখিয়া আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

এমন "মানুষের হিতকারিণী" জিনিসটি কি? সেটি ইংরাজীতে "ইণ্টার্ণাল সিক্রিসান্" অর্থাৎ অদৃশ্য অথবা আভ্যন্তরিক রস। "আভ্যন্তরিক রস" কথাটি দুর্ব্বোধ শব্দ। ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমরা সকলেই জানি যে, চক্ষে কিছু পড়িলে, চক্ষে জল সঞ্চারিত হয়; নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রসস্রাব (সর্দ্দি) ঘটে; মুখ-রোচক জিনিস দেখিলে, শুঁকিলে, ভাবিলে বা তাহার কথা শুনিলে, মুখে লালা ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ, সাধারণ অবস্থায়, নাক, চক্ষু, মুখ—কোথাও অনবরত রস স্রুত হয় না;—অথচ, আবশ্যক হইলে, তথায় রস নিঃসৃত হয়। এই রস আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই।

আর এক দিকের কথা ধরা যাউক। আমরা কিছু খাইলে, সেই খাদ্য পাকাশয়িক রস (গ্যাষ্ট্রিক-যূষ), ক্লোম রস (প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যূষ) ও আমাশয়িক রস (সাক্কাস্ এণ্টারিকাস্) প্রভৃতির রসে পরিপাক্ক হইয়া যায়। এই সকল রস আমরা চক্ষে নিত্য দেখিতে না পাইলেও, কোনও জীবন্ত প্রাণীকে ক্লোরোফরম নামক সংজ্ঞাপহারক ঔষধের বলে অজ্ঞান করিয়া, পেট চিরিলে, দেখিতে পাই। কাজেই কি নাক মুখের রস, কি পরিপাক-রস—এ সকল রসই ইচ্ছা করিলে আমরা দেখিতে পাই। এই জন্য এই জাতীয় প্রত্যক্ষ রসকে সুধু "রস" বা "সিক্রিসান্" বলা হয়।

এইখানে এই "রসে"র একটু ইতিবৃত্ত জানান আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চক্ষু নাসিকা পাকস্থলী প্রভৃতি

কোথাও তৎ তৎ স্থানের রস তৈয়ারী মজুদ থাকে না—আবশ্যক মত উহারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। যেমন একই মাটিতে নীম ও আমগাছ জন্মিয়া তিক্ত ও মিষ্টগুণ-প্রধান স্ব স্ব রসযুক্ত ফলোৎপাদন করে; তেমনি চক্ষুই বল, আর পাকাশয়ই বল,—দৈহিক সকল যন্ত্রই রক্ত হইতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া, তাহা হইতেই স্ব স্ব রস প্রস্তুত করে। যেখানে রস প্রস্তুত হয়—অর্থাৎ রসের ভিয়েন-ঘরকে—গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি বলে। গলায় বীচি হইলে যে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিকে হাতে টিপিয়া অনুভব করা যায়, তাহাকে নাসিকা-রস-বাহী গ্রন্থি বা লিম্-ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড বলে। রস-স্রাবী যন্ত্রগুলিকে "সিক্রিটিং" বা রসস্রাবী গ্রন্থি কহে। এই প্রবন্ধে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি বলিলে, উক্ত "সিক্রিটিং" বা রস-স্রাবী গ্রন্থিকেই লক্ষ্য করা হইবে। এই হিসাবে লিভার বা যকৃতকেও গ্ল্যাণ্ড বলা হয়। যাহা হউক, সিক্রিটিং গ্রন্থি-গুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে এই কথাই ক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথমতঃ, তাহাদের রস দেখা বা দেখান যায়; দ্বিতীয়তঃ, স্থানিক প্রয়োজন মত সেই স্থানের রস নিঃসৃত হইয়া সেই স্থানেরই উপকার সাধন করে; এবং তৃতীয়তঃ, স্থানিক রসের অভাবে যতটা স্থানিক ক্ষতি হয়, ততটা দেহের সাধারণ ভাবে ক্ষতি হয় না।

এইবারে ইন্টার্ণাল সিক্রিসান্ বা অদৃশ্য আভ্যন্তরিক রসের কথা বলিব। প্রথমেই গোলযোগ উপস্থিত হয়—যাহা দেখা বা দেখান যায় না, তদ্বিষয়ে কেমন করিয়া বিশ্বাস বা প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা নিত্যই নিদ্রা যাই; কিন্তু নিদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞ; যদি কাহাকেও উপর্য্যুপরি দুই তিন রাত্রি নিদ্রা যাইতে না দেওয়া হয়, তবে সেই ব্যক্তি নিদ্রার উপকারিতা বুঝিতে পারে। লবণ খাওয়া ভাল কি মন্দ, এ কথার উত্তর শোথগ্রস্ত ব্যক্তি যত শীঘ্র ভাল করিয়া বুঝিবে, অপরে তাহা বুঝিবে না। তেমনি, এ দেহের মধ্যে, কোন একটি বা একাধিক অদৃশ্য রস সঞ্চারিত হয় কি না, তাহার প্রমাণ সহজেই করা যায়। দৃষ্টান্ত লউন:—(১) যদি কোনও ব্যক্তি আজীবন বীর্য্য বা শুক্র কোনও ক্রমে ক্ষয় না করে,—তবে তাহার দেহের লাবণ্য ও কান্তি এবং মনের বল, মেধা প্রভৃতি খুব বাড়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাহার চেহারা, দৈহিক ও মানসিক অপকর্ষতা অতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। (২) যদি কোনও বিবাহিত রমণীর অল্পবিস্তর গোঁফ ও দাড়ি উদ্ভূত হয়, তবে দেখা যায়, সে রমণী নিঃসন্তান। (৩) যে ঘোটকেরা অতি উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদিগের অণ্ডকোষ ছেদন করিলে, তাহারা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। (৪) যে কুক্কুটের অণ্ডকোষ ছিন্ন করা হয় (ইংরাজীতে ইহাদিগকে "কেপন্" বলে), তাহাদিগের মাংস অতীব নরম ও সুস্বাদু হয়। (৫) সম্প্রতি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন যে বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্ত ও জরাগ্রস্ত মনুষ্যের ত্বকের নিম্নে বানরের অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে সেই জরাগ্রস্ত ব্যক্তি যৌবন ফিরিয়া পায়। (৬) পাঁঠার মেটুলি ভোজনে, "রাতকাণা" ব্যারাম সারে। (৭) কোনও কোনও লোক অতি গরীব হইলেও, বিপুল-কায় হয়। (৮) কেহ কেহ অসম্ভব ঢেঙা হয়। (৯) কোনও কোনও ছেলে হাঁ-করা হয় এবং তাহাদিগকে হাজার শিখাইলেও তাহারা কিছুই শিখিতে পারে না। (১০) গর্ভের সঞ্চার হইলেই স্তনে "দুধ নামে" এবং প্রসবান্তে শিশুকে ভাল করিয়া স্তন দিলে, প্রসূতির জরায়ুর সংকোচন শীঘ্র ও সুন্দর রূপে সংসাধিত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রসূতির "গা শুকাইয়া যায়।" আশা করি, এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক পাঠিকারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, দেহের মধ্যে এমন কিছু অদৃশ্য রসের আধিক্য বা অভাব ঘটে, যাহার ফলে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঘটিয়া থাকে।

যদি কাহারো তদ্বিষয়ে সন্দেহ ঘটে, পরে সে সন্দেহ নিরশন হইবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিবে। এইবার প্রশ্ন হইতেছে—যদিই বা দেহের মধ্যে অদৃশ্য রস সঞ্চার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? জনসাধারণের তদ্বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি ধনী, তাহাকে অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তেমনি, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান্—অর্থাৎ, যাহার দেহের সকল প্রকার রস-সঞ্চারের যথাযথ সামাঞ্জস্য আছে—তাহার ইণ্টার্ণাল সিক্রিসান্ বা অদৃশ্য রসের জন্য মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই ডিস্‌পেপসিয়া, ডায়াবিটিস্, সূতিকা প্রভৃতি বহুল দেশে এই বিষয়ের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

এইবারে, বিষয়টি ক্রমশঃ একটু জটিল হইয়া পড়িবে—

উপায় নাই। ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকা মহাশয়দিগের শ্রম সার্থক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। যাহাতে বিষয়টি তাদৃশ জটিল না হয়, এই জন্য প্রথমে দুই একটি রোগের বর্ণনা করিব। পাঠক মহাশয়েরা রোগের নাম করিতেছি শুনিয়া এইখানেই পড়া বন্ধ করিবেন না—বরং একটু বেশী মনোযোগের সহিত এই অংশগুলি পড়িবেন।

প্রথমে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগের কথা ধরা যাউক। আজ কাল ঘরে ঘরে যুবকদিগের ও অল্পবয়স্কা রমণীদিগের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। "অম্লরোগ", "অজীর্ণ", "গরহজম", "বদ্‌হজম" প্রভৃতি নানা নামে ইহা এখন এদেশে সুপরিচিত। এ ব্যারামে হয় কি?—পরিপাক করিবার জন্য আমাদের পেটের মধ্যে যে কয়েকটি রস সঞ্চারিত হয়, সেগুলির মধ্যে একটির বা একাধিকটির অভাবে এ ব্যারাম হয়। পরিপাক করিবার জন্য, মুখে লালা, পাকাশয়ে গ্যাষ্ট্রিক যূষ, পরে পিত্তরস, ক্লোমযন্ত্রের রস (প্যান্‌ক্রিয়াসের রস) এবং আমাশয়ের "সাক্কাস্ এণ্টারিকাস্" নামক রস—এতগুলি রসের প্রয়োজন হয়। শ্রীভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা,—এই নরদেহে প্রথম পরিপাক-রসের কার্য্যের উপরে তৎপরবর্ত্তী রসের কার্য্য নির্ভর করে; আবার দ্বিতীয় রসের কার্য্যের উপরে তৃতীয়টি নির্ভর করে। এইরূপ কতকটা যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে রসগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। কাজেই, যে ব্যক্তি প্রথম রসের বেলায় অবহেলা করে—অর্থাৎ, যথার্থ ভাবে ও যথেষ্ট রূপে চর্ব্বণ কার্য্য সম্পন্ন করে না, তাহার মুখের লালা-স্রাবের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়। লালাস্রাব অসম্পূর্ণ হইলেই, পাকাশয়ের রসের তারতম্য ঘটে,—এবং এই ভাবে বরাবর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই যে একটি রস ঠিক্ পরবর্ত্তী রসের উত্তেজক রূপে কাজ করে, ইহাকেই ইংরাজীতে হর্ম্মোন্ বলে। অর্থাৎ মুখের লালা, পাকাশয়িক রসের হর্ম্মোন বা উত্তেজক। অবশ্য লালা, পাকাশয়িক রস, ক্লোমরস, পিত্ত ও সাক্কাস্ এণ্টারিকাস্—পরিপাক কার্য্যের সহায়ক এই পাঁচটি রসই দেখা ও দেখান যায়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি অদৃশ্য সূত্র আছে, যাহার ফলে, একটি রস তৎপরবর্ত্তী রসের উত্তেজক রূপে কায করে। সেইটি অদৃশ্য রস।

তাহার পরে, ডায়াবিটিজ নামক ব্যারামের কথা ধরা যাউক। এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশে, এই ব্যারামে, বলিতে গেলে একরকম যৌবনেই, বহু মনীষী সুসন্তান ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। এই ব্যারাম শিক্ষিত বাঙ্গালী, তথা লেখকশ্রেণীর যম স্বরূপ। চলিত কথায় ইহাকে "প্রস্রাবের ব্যারাম" ও কবিরাজী ভাষায় ইহাকে "মধুমেহ" বলে। তাতই খাও আর সুধু মাংসই খাও, যাহার শরীরে এই ব্যারাম-রূপ ঘুণ ধরিয়াছে, তাহার প্রস্রাবে শর্করা বাহির হইবেই—সে আজীবন জীবন্ত খেজুর গাছ হইয়া থাকিবে। এ ব্যারাম কেন হয়, তাহা পরম রহস্যজালে এতদিন আবৃত ছিল। আমাদের উদরের মধ্যে প্যানক্রিয়াস্ বা ক্লোমযন্ত্র নামে একটি যন্ত্র আছে। প্যানক্রিয়াটিক যূষ বা ক্লোমরস নামক তাহার একটি রস আছে—ইহাকে দেখা ও দেখান যায়—ইহা বহুকাল পরিচিত। কিন্তু প্যান্‌ক্রিয়াসের মধ্যে "ল্যাঙ্গারহ্যান্স" দ্বীপ নামক স্থানের এক প্রকার অদৃশ্য রস আছে, যাহার প্রাচুর্য্যে ডায়াবিটিস্ থাকে না এবং তাহার অভাব হইলে, ডায়াবিটিজ্ অবশ্যম্ভাবী। এই সত্যটি আগে জানা যায় নাই। আপনারা অনেকেই "ইন্‌সুলীন্" নামক ঔষধের নাম শুনিয়াছেন। এই ঔষধটি ডায়াবিটিজ-গ্রস্তদিগের পক্ষে ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। যখন ডায়াবিটিজে রোগী জর্জ্জরিত, তখন "আইল্যাণ্ড অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সে"র এই উগ্রবীর্য্য রস অধস্ত্বাচিক প্রয়োগে মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এখন বুঝিলেন, অদৃশ্য রস কত কায করে?

গর্ভাবস্থায় যখন অতিমাত্রায় বমন হইয়া, গর্ভিণীর জীবন-সংশয় করিয়া তোলে, তখন কোনও ঔষধেই তাহাকে রোধ করা যায় না। তখন স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষ বা ওভারিতে "কর্পাস্ ল্যুটিয়াম" নামক যে এক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সেবন করাইলে, ঐ বমন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়! বমনকারিণী রমণীর স্বকীয় ওভারি বা ডিম্বকোষস্থ কর্পাস্ ল্যুটিয়াম নামক পদার্থের অদৃশ্য রসের অভাবেই ঐরূপ ভীষণ বমি হইতে থাকে; অতএব, ঐ জিনিসটি সেবন মাত্রেই বমন বন্ধ হইয়া যায়।

এই ভাবে দৃষ্টান্ত ধরিয়া বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এই কারণে, কয়েকটি ব্যারামের নাম, ও সেই সেই ব্যারাম দেহস্থ কোন্ কোন্

যন্ত্রের অদৃশ্য রসের অভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিলাম।—

(১) হাঁপানির ব্যারাম—অনেক স্থলে পরোক্ষে অ্যাড্রেনাল্ নামক গ্রন্থির অদৃশ্য রসের অভাবে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য অনেক স্থলে, যখন রোগীর খুব হাঁপানির টান ধরে, তখন ৫ হইতে ১০ ফোঁটা "অ্যাড্রেনালীন্ হাইড্রোক্লোরাইড্ দ্রব" নামক ঔষধ ফুঁড়িয়া চামড়ার তলায় দিলে, তৎক্ষণাৎ হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া যায়।

(২) মুদ্রাদোষ।—যাহাদিগের বাতব্যাধি বা মেদাধিক্য আছে অথচ মুদ্রাদোষ খুব বেশী, তাহাদিগকে থাইরয়েড্ ও পিটুইটারী সেবন করাইলে উহা আরাম হয়।

(৩) কষ্টরজঃ।—থাইরয়েড্ গ্রন্থি ও কর্পাস ল্যুটিয়াম পদার্থ সেবনে উপকার হয়।

(৪) "শেষে-মোতা"।—থাইরয়েড্ গ্রন্থি সেবনে আরোগ্য হয়।

(৫) খর্ব্বাকৃতি (বাল্যবয়সে)। পিটুইটারী গ্রন্থির সম্যক্ রসের অভাবে সাধারণতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে। অতি শৈশবে উক্ত গ্রন্থিখণ্ড ও আবশ্যক মত থাইরয়েড্ গ্রন্থিখণ্ড সেবনে খর্ব্বত্ব কমিয়া যায়।

(৬) জন্মজড়ত্ব।—যে জননী উপর্য্যুপরি জন্মজড় সন্তান প্রসব করেন, তাঁহাকে গর্ভকালীন থাইরয়েড্ গ্রন্থি-খণ্ড সেবন করাইলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

(৭) "শ্বেতী" (ধবল)।—থাইরয়েড্-খণ্ড ভোজনে সারে।

(৮) স্থূলত্ব (অতিকায়)।—থাইরয়েড্ (এবং আবশ্যক মত অ্যাড্রেনাল বা পিটুইটারী খণ্ড) সেবনে কমিয়া যায়।

এই ভাবের দৃষ্টান্ত আর দিব না।

যাঁহারা উপরের কয়েক ছত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পূর্ব্বে থাইরয়েড্ ও অ্যাড্রেনাল্ গ্রন্থিদ্বয়ের নাম বারম্বার করা হইয়াছে; তাহার কারণ, খুব স্থূল হিসাবে এইটা ঠিক যে—

বাল্যকালে—থাইমাস্ নামক গ্রন্থিই প্রধানতঃ কায করে;
যৌবনে ও প্রৌঢ়ে—গোনাড্দলভুক্ত " "
বার্দ্ধক্যে—অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি " "

অর্থাৎ বাল্যে, থাইমাস্ গ্রন্থির কার্য্য ফলে অস্থি পুষ্টি, মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ এবং তৎকারণবশতঃ চাঞ্চল্য প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। যৌবনে "গোনাড্" দলভুক্ত গ্রন্থিগুলিরই প্রাধান্য দেখা যায়। "গোনাড্" বলিলে, পুরুষের অণ্ডকোষস্থ লেডিগ্-কোষগুলিকে এবং রমণীর ডিম্বাশয়ের কর্পাস্ ল্যুটিয়াম এবং "ফুল" বা প্ল্যাসেণ্টার একপ্রকার অদৃশ্য রস এই গুলিকে প্রত্যক্ষে, এবং তৎসঙ্গে উহাদের কার্য্যের সহায়ক অ্যাড্রেনালীন, পিটুইটারী ও থাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলিকে পরোক্ষে বুঝায়। এই গোনাড্গুলির কর্ম্মকুশলতার ফলে, স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম্ম ও মাতৃত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয় এবং পুরুষদিগের পৌরুষ-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে জরা ও দৌর্ব্বল্য আসিয়া জুটে। তখন অ্যাড্রেনালীন গ্রন্থির রসই শরীরে বলাধান করিয়া বাঁচাইয়া রাখে। আশা করি, এতক্ষণে পাঠক-পাঠিকা মহাশয়েরা—উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে,—এক কথায়, সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে অদৃশ্য রসস্রাবী গ্রন্থিগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকাদিগের ধৈর্য্য থাকিলে, আরও একটু-আধটু কথা বলিতে চাহি। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালায় "উদর ও অন্যান্য অবয়ব" গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এই মানব-দেহের প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক অপর পরমাণুর সুখ-দুঃখের সঙ্গে গাঁথা। অর্থাৎ এ দেহের মধ্যে "একালষেঁড়ে" ভাব নাই—প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অপর অংশের সুস্থাসুস্থতার জন্য দায়ী। এই ভাবটি এই অদৃশ্য রসস্রাবী গ্রন্থিগণের পক্ষেও সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্ত লউন :—

পিটুইটারী নামক গ্রন্থির স্বধর্ম্ম—শারীরিক অস্থির গঠন ও বৃদ্ধি এবং পুং-জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা ও মস্তিষ্কের উন্নতি বিধান করা। প্যারা-থাইরয়েড্ খণ্ডও বাল্যে অস্থি সংগঠনে সহায়তা করে। থাইরয়েড্ ও ক্লোম-যন্ত্র (প্যানক্রিয়াস্) পরস্পরের কার্য্য হ্রাস করে। আড্রেনাল্ ও প্যানক্রিয়াস পরস্পর কার্য্যের লঘুতা সম্পাদন করে। থাইমাস ও গোনাড্ দলভুক্তেরা পরস্পর

বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। পিটুইটারী গোনাড্ দলভুক্তদিগকে উত্তেজিত করে; কিন্তু গোনাড্ দলের রস পিটুইটারীর কার্য্যের অবসাদক। ইত্যাদি।

আর দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া, একটি গ্রন্থি ধরিয়া বিষয়টিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কয়েকদিন ধরিয়া সংবাদপত্রে প্রায়ই "মঙ্কি গ্ল্যাণ্ড" (অর্থাৎ বানরের অদৃশ্য রস সঞ্চারী গ্রন্থি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট করানর ফলের কথা) শুনা যাইত—এখন আর তাহা শুনা যায় না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্ক লিড্‌ষ্টোন এবং ১৯১৯ সালে এস্ ভোরোনফ্ কয়েকটি ছাগ ও মেষের উপরে এই পরীক্ষা করেন। বয়স হইয়াছে এবং জরা আসিয়াছে—এইরূপ অবস্থাগ্রস্ত পুং ছাগ ও পুং মেষের চর্ম্মের নিম্নে স্বজাতীয় (অর্থাৎ ছাগের বেলায় ছাগের ও মেষের বেলায় মেষের) ও যুবক জন্তুর অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করাইয়া সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছাগ ও মেষগুলি কয়েক মাসের জন্য যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয়-শক্তি, এবং দেহের ও মনের স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে যেমন দেহের কান্তি, পুষ্টি ও ক্ষমতা লাভ হয় তৎসদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে, ডাঃ ভোরোনফ সিদ্ধান্ত করেন যে—বার্দ্ধক্য, দৌর্ব্বল্য (যে বয়সের হউক), ধ্বজভঙ্গ—এই অবস্থায় ঐ রূপ অণ্ডকোষ মনুষ্যত্বকের নিম্নে সেলাই করিলেও তদনুরূপ সুফলের সম্ভাবনা—অর্থাৎ ঐ ঐ দুরবস্থ লোকদিগের দেহের ও মনের বল সঞ্চার এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটিবার কথা। অণ্ডকোষটি স্বগোষ্ঠীর দেহ হইতে লওয়া চাই; বানরই মানুষের স্বগোষ্ঠী; এইজন্য বানরের অণ্ডকোষই লওয়া হইত। এই অণ্ডকোষটি ত্বকের নীচে, অথবা উদরাভ্যন্তরে (পেরিটোনিয়াম-গহ্বরে), অথবা অণ্ডকোষ থলিতে সেলাই করিয়া দিতে হয়। নরদেহে সুস্থ ও যুবক বানরের অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করানর ফলে, ঐ অণ্ডকোষ কর্ত্তৃক নরের অ্যাড্রেনালের কার্য্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে—যেহেতু, অ্যাড্রেনাল ও গোনাড্গ্রন্থিগুলি (যাহাদের মধ্যে মুষ্ক একটি প্রধান গ্রন্থি) পরস্পরের কার্য্যের সহায়ক। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির রসস্রাবের ফলে, দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি আসে। কাজেই বৃদ্ধ যৌবন ফিরিয়া পায়। অ্যাড্রেনালের কার্য্যাধিক্য বশতঃ কেশের অবস্থা ভাল হয় এবং মাংসপেশী সমূহে বলাধান করে। আবার, এই বাহিরের অণ্ডকোষের রসের উত্তেজনায় মানুষটির স্বকীয় অণ্ডকোষ কিছুদিনের জন্য পূর্ব্বকার্য্যকরী ক্ষমতাটিকে ফিরিয়া পায়।

কিন্তু "নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈল দানম্?" যাহার শরীরে কিছু নাই—অর্থাৎ বয়স বা ব্যাধির ফলে যাহার দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহে ঐরূপ গ্রন্থি বসানর ফলে, দুদিনের জন্য সকলই ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই দিক হইতে কুফল ফলিতে আরম্ভ করে। প্রথম কুফল এই :—যাহার দেহ বয়স বা ব্যাধির ফলে একরকম ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে, সেখানে দুইদিন অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফল—সত্বর মৃত্যু। এইটি আমার ধারণা। দ্বিতীয় কুফল—দেহের মধ্যে আগন্তুক মুষ্কটির উপরে তাহার থাইরয়েডের দৃষ্টি পড়ে। থাইরয়েড্ শারীরিক কার্য্যবৃদ্ধি করে—কাযেই, শীঘ্র শীঘ্র ঐ আগন্তুক মুষ্কটিরও ক্ষয় সাধন করে—কাযেই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই উহার লীলাখেলা ফুরাইয়া যায়। এই জন্য, উক্ত মঙ্কিগ্ল্যাণ্ড চিকিৎসা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াও "ধোপে টিকিল না।"

পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় থাকিলেও আরো দু' একটি দৃষ্টান্ত দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। প্রথমে দুইটি রোগীর বিবরণ দিব—অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন :—প্রথমটি রমণী। ইনি ছয়টি সন্তানের জননী। শেষ সন্তান প্রসবের দুই তিন বৎসর পরে দেখা গেল যে, তাঁহার মুখ, হাত, পা, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেহ ফুলিয়া গেল—এত ফুলিল যে, চলৎশক্তি ত রহিত হইলই, পরন্তু ভাল করিয়া চোখ খুলিবারও সামর্থ্য রহিল না। মাথার চুল আপনা-আপনিই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, বুদ্ধির হ্রাস ঘটিতে লাগিল, রাতদিন ঘুম পায়—প্রস্রাব ও দাস্ত সুস্থবৎ হইত, জ্বর ছিল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ অনেকেই ব্রাইট্স্ ডিজিস্ নামক সাংঘাতিক মূত্রগ্রন্থির (কিড্নীর) পীড়া বলিয়া ঠিক্ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যারামটির যথার্থ নাম—মিক্সিডীমা। গলায় থাইরয়েড্ নামক যে গ্রন্থি আছে তাহার ক্ষয় হইলে—অর্থাৎ দেহে থাইরয়েড্ গ্রন্থির আভ্যন্তরিক রস স্রাবের ন্যূনতা বা অভাব ঘটিলে উপর্য্যুক্ত লক্ষণগুলি ঘটে। এই রোগিনীকে থাইরয়েড্ গ্রন্থি-খণ্ড খাওয়াইবার ফলে—

অর্থাৎ তাঁহার স্বদেহস্থ থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস না থাকায় তৎস্থানে বাহির হইতে উক্ত রসযুক্ত থাইরয়েড্ গ্রন্থি তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশিবার ফলে—তিনি সত্বর সুস্থ হইয়াছেন এবং এখনো নিয়মমত উক্ত গ্রন্থি খাইতেছেন। খাওয়ার ফলে মাথায় আবার চুল উঠিয়াছে, স্থূলত্ব চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধির জড়তা আর নাই। তবে আর তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইহাও থাইরয়েড রসের ফল। দ্বিতীয় রোগীটি যুবক।—হঠাৎ মানুষ ভয় পাইলে যেমন হয়, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়াই ইঁহার সেইরূপ অবস্থা চলিতেছে। চোখ দুটি যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত বড় হইয়াছে, রাতদিন বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, যখন তখন গা ছম্-ছম্ (ভয়) করে। গায়ে কাঁটা দেয়, হাত পা থর থর কাঁপে। দেহের মধ্যে থাইরয়েডের রসাধিক্য হইলে এই ব্যারামটি হয়। লক্ষ্য করিবেন—থাইরয়েড্ গ্রন্থির অদৃশ্য রসের—

অভাব ঘটিলে—বোকার মত চেহারা হয়। (মিক্সিডীমা)

আধিক্য হইলে—ভয় পাইবার মত চেহারা হয়।

(এক্স্-অফ্থ্যালমিক্ গয়টার্)

শেষের লোকটির দেহের মধ্যে অতিমাত্রায় থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস-সঞ্চার ঘটে। খুব সম্ভব, এই যুবকটি অতি-মাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। যাহা হউক, রক্তের ভিতর যেটুকু বাড়্তি থাইরয়েড্ রস আছে, তাহাকে ত বাহির করিয়া লইবার উপায় নাই;—কাজেই, যাহাতে থাইরয়েড্ রস একেবারে নাই, এমন খাদ্য (দুগ্ধ) দিয়া, বাড়্তি টুকুর "পাষাণ ভাঙা" ছাড়া, চিকিৎসার অন্য উপায় নাই। এইজন্য, ছাগীর থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে অস্ত্রো-পচার দ্বারা নষ্ট করিয়া, সেই ছাগীর দুধ সেবনে ঐ ব্যারামের উপশম ঘটান গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, থাইরয়েড্ হীন হইয়া কোন ছাগীই বেশী দিন বাঁচে না।

আষাঢ়ে গল্পের মত এই সকল বৈজ্ঞানিক কত তথ্য আছে—আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। যদি পাঠক-পাঠিকাদিগের বিরক্তি বোধ না হয়, তবে বারান্তরে অপর একটি "উপন্যাসের" আভাষ দিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জয়দেব

(কবি-জীবন)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে; যে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভাষায় ও ছন্দে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও, কাব্য সেই রস-ভাবেরই দ্যোতনা মাত্র। মানুষের অন্তরে যিনি কবি-রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন,—কাব্য সেই অন্তর-দেবতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা-বিলাস। সুতরাং কবিকে সত্য করিয়া জানিবার পক্ষে তাঁহার কাব্য পরিচয়ই যথেষ্ট। রসের বিষয় এবং আশ্রয়, ভাবোদ্দীপনের জন্য পরিকল্পিত দেশ, কাল ও ঘটনাবলীর সংস্থান এবং সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দে গ্রথিত বাগার্থ পরম্পরার বিন্যাস-ভঙ্গী ইত্যাদি বহুবিধ বিচারে নানা দিক দিয়া কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু পাঠকের কৌতূহলের সীমা নাই। পাঠক কেবল কাব্য আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন না, অথবা পারেন না। তিনি চাহেন, অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটাকে জানিতে; অন্তর-দেবতা যাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, বাহিরে—সাংসারিক জীবনে ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, তাহার সমস্ত খুঁটীনাটী খবর না জানিতে পারিলে পাঠকের যেন সোয়াস্তি হয় না। এ কৌতূহল ভাল কি মন্দ সে কথা বলিতেছি না, ইহা কবির কাব্যখানিকে বুঝিবার পক্ষে কোনরূপ সহায়তা করে কি না সে কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য—সংসারে ইহাই স্বাভাবিক।

অবশ্য ইহা আরও স্বাভাবিক যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন সংসারে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাঁহার বাস্তব জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। কবিদিগের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়াও মনে হয় না। সুতরাং কাব্য ও জীবন মিলাইতে গেলে

প্রায়শঃ ঠকিতেই হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, আবার সারা কাব্যখানি জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ হেন কবি-জীবন সংসারে সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও, আমার মনে হয় বাঙ্গালায় তাহা দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকের জীবন এই ভাবের সুন্দরতর উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি জয়দেবের জীবন ইহার একটী সুন্দরতম দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কোনও ইতিহাস নাই, তথাপি আজও পর্য্যন্ত প্রচলিত কয়েকটী প্রবাদে কবি-জীবনের চিত্র গ্রথিত রহিয়াছে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসী তাঁহার জীবন ও কাব্যকে একরূপ অভিন্ন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ভারতের এক অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় কবির শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য-খানিকে যেমন প্রেম-ধর্ম্মের সূত্র-গ্রন্থ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কবির জীবনকেও তেমনি সেই সূত্রেরই এক মধুরোজ্জ্বল ভাষ্য স্বরূপ পূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দুঃখের বিষয়, কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির কোনো উপাদান নাই। চক্রদত্ত প্রণীত 'সংস্কৃত ভক্তমাল', নাভাজী কৃত 'হিন্দী ভক্তমাল' এবং রীয়ভূমের কবি বনমালী দাসের "জয়দেবের চরিত্র" গ্রন্থে কবি জয়দেবের জীবন-কাহিনী বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে "জীবনী" বলিতে যাহা বুঝায়, ইহার কোনখানিতেই তাহা পাওয়া যাইবে না। "জয়দেব চরিত্র" গ্রন্থখানি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন, উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবনচরিত না হইলেও উপদেশ-পূর্ণ, ধর্ম্ম গ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।' কিন্তু এ কালের পাঠক এই সমস্ত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইবেন কি না সন্দেহের বিষয়। তথাপি আমরা জয়দেব-চরিত্র হইতে দুইটী প্রবাদ এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

১ম প্রবাদ—"দক্ষিণ দেশীয় এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বহু দিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে, আমাদের পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্যা জন্মিলে আপনার সেবিকা-রূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে কন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুরীধামে আসিয়া উপনীত হন। নীলাচলনাথ তাঁহাদিগকে স্বপ্নাদেশ দেন 'তোমরা কেন্দুবিল্বে গিয়া আমার অংশস্বরূপ দ্বিজ জয়দেবকে কন্যা সম্প্রদান কর।

"তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যেমত আমাকে জান তেমতি গণিবে॥"

সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও ঋণী হইবে।' ব্রাহ্মণ-দম্পতি কেন্দুবিল্বে আসিয়া পদ্মাবতীকে জয়দেবের হস্তে সমর্পণ করেন। এইরূপেই জয়দেব-পদ্মার মিলন সংঘটিত হয়।

২য় প্রবাদ—কবির নিত্যকার্য্য ছিল—

রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া॥
পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলা সার॥

× × × ×
× × × ×

প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তার পর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে॥

(জয়দেব চরিত্র)

স্নানান্তে দেবসেবা ও ভোগ সমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন, পুনরায় শ্রীগীতগোবিন্দ লিখিত হয়। এইরূপে স্মরগরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া কবির লেখনী থামিয়া গেল—

কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিন্তে॥

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাস্নানে গেলেন। এদিকে ভক্ত-বৎসল ভগবান স্বয়ং জয়দেবরূপে আসিয়া কবির অভিপ্রেত "দেহি পদ পল্লব মুদারং" লিখিয়া কবিতার পাদপূরণ করিয়া দিলেন। পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য ভগবান কবির অনুষ্ঠিত দেবসেবাদি নিত্য-নিয়মিত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ভোজনান্তে শয়ন গৃহে গিয়া শয্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী প্রভুর পাদ সম্বাহনান্তে রন্ধনাগারে আসিয়া প্রসাদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি (স্নানের পর) গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি নাই। ক্রমে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

তখন—

"একচিত্তে গ্রন্থপাত খুলিল ঠাকুর।
অর্দ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পুর॥
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদপল্লবমুদার॥
পাদ পূর্ণ দেখি মনে হৈল প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আসয়॥

× × × ×
× × × ×

শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।
মনোহর সুগন্ধেতে নাসিকা মাতিল॥

শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যা মাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥"
(জয়দেব চরিত্র)

—কবি শেষে পদ্মাবতীর ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণে কৃতার্থ হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আরো কয়েকটী আছে, "বাহুল্য বোধে বর্জ্জিত হইল।

১ম প্রবাদে করিকে শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। নাভাজী তাঁহার হিন্দী ভক্তমালে বর্ণনা করিতেছেন—

"এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবন সুখদ আর পরম পবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে।
শ্রীমান জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে॥
শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়া॥
উভয় প্রণয় রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিল স্ত্রীরত্ন সাদরে॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণন করিলা করিয়া মোহিত॥"
(শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত অনুবাদ)

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে; সুতরাং উদ্ধৃত কবিতা কয়েক ছত্র পূর্ব্বোক্ত প্রবাদেরই সমর্থন করিতেছে। এইবার দেখা যাউক, শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি কোন্ ভাবের প্রতীক? প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখ বাক্য—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥"

শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্যের স্মৃতিই জাগরিত হয়। শ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিয়া মনে পড়ে—"সূর্য্য গ্রহণের সময় দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যেন কুরুক্ষেত্রতীর্থে আগমন করিয়াছেন,—সঙ্গে পরাক্রান্ত যদুবীরগণ, রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, এবং অগণিত করী-তুরগ-পদাতি-পরিবেষ্টিত স্যন্দনসমূহ! আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ মৎস্য কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথবৃন্দ—তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী! সুবিস্তীর্ণ সমন্ত-পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছে—হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোপীযূথপরিবৃতা শ্রীমতী বৃকভানু রাজনন্দিনী, প্রাণ কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতী কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়—ব্রজের সেই নয়নানন্দ! "ইহঁ হাতী ঘোড়া রথ মনুষ্য গহন"—এখানে তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের শত-স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার কাল জল,—আর তারই তীরে সেই পুষ্পিত নিকুঞ্জবন, নীপ-তরুতল। রাখালগণের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল—উন্মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির সেই আনন্দ-কানন,—দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যাম শষ্পক্ষেত্র—গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল ব্রজভূমির সেই নিরালা নিকেতনের কক্ষ-কুট্টিম। সেই কৃষ্ণ, সেই দেখা, সেই মিলন! কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই? মিলনে সে আনন্দ কই? দেখা হইল বটে, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! মাধুর্য্যের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃত-প্রবাহ,—প্রকৃতির আনন্দ নির্ঝর গিরিবক্ষ বাহিয়া, বনপথ ধরিয়া ক্রীড়াশীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়? তাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।"

ভগবদুপাসনার দুইটি দিক আছে, একটী ঐশ্বর্য্যের দিক, অপরটী মাধুর্য্যের দিক। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়, জয়দেব গোস্বামী প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের উপাসক ছিলেন এবং এই ভাব হইতে সাধনার ক্রম-বিকাশে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে ত এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রসের ক্রম-পরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং সে রস-পরিপুষ্টি যে কবি-হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ—রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে "দশাবতার স্তোত্রে" এবং "শ্রিত কমলা কুচ মণ্ডল" সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের কেবল ঐশ্বর্য্য স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন—"দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"। টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন, এই দশটী অবতার দশটী রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব্ব অবতারের অবতারি শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদি রসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস বা আদি রস সকল রসের শ্রেষ্ঠ,—শ্রীকৃষ্ণ মধুররসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার বীভৎসরসের, কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের শ্রীরাম করুণ রসের, বলরাম হাস্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কল্কি বীর রসের অধিষ্ঠাতা।

"শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল" সঙ্গীতটীতে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদাবন্তে শ্রীর নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের, এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায়—

জনক সুতাকৃত ভূষণ জিত দূষণ সমরশমিত দশকণ্ঠ।
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর শ্রীমুখচন্দ্র চকোর॥

কবি বলিতেছেন—

"হে জানকী কৃতভূষণ, দূষণবিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে। হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দার ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া আপনি সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলে। আবার রমার মুখচন্দ্রে সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া চকোরের মত সেই মুখামৃত পান করিতেছ; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এখন অভিনব জলধর রূপে প্রতীয়মান হইতেছ।" শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটী দিক প্রদর্শন করিলেন। সীতা-রামের প্রণয় দাম্পত্য প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রণয়-কাহিনী পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম আরো গুরু, আরো গাঢ়, আরো মধুর,—তাহার তুলনা হয় না। টীকাকার বলিতেছেন—এই সঙ্গীতে "ধীর ললিত", "ধীর শান্ত", "ধীরোদ্ধত", এবং "ধীরোদাত্ত"—নায়কের এই চারি প্রকার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধীর-ললিত নায়কই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে শ্রীপতি রূপে তিনিই উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন, এই সৌন্দর্য্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপী প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুযষ্টির দ্বারা ব্রজ-রমণীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ প্রসাদে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী তদীয় হৃদয়বাসিনী হইয়াও, এবং সুরবালাগণ কমল গন্ধ ও কমল কান্তি ধারণ করিয়াও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।" সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে—কবি এই দুইটী সঙ্গীতে ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন,—এইবার ধীরে মাধুর্য্যের পথে অগ্রসর হইবেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন,—তাঁহাতে নায়কের অপর কয়েকটী গুণও বর্ত্তমান আছে, তিনি সকল নায়কের শিরোভূষণ এবং শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী নায়িকাকুল-শিরোমণি।

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। কবি "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ করাইবেন, এই সঙ্কোচে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহের অবকাশই থাকিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—কারণ জীবন ও কাব্য তাঁহার ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতে-ছিলেন, সাধনালব্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার গভীরতর আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন এক দিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব আপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়া, মানব ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতি রূপেই ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্ত-প্রেমের প্রকৃত আস্বাদ দান করিয়াছিল। তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চিররসময় পরম প্রেম-স্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীর পতি-প্রেম এতই প্রগাঢ়, এমনই নিষ্ঠাপূর্ণ যে—ভগবান তাঁহাকে জয়দেব রূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কবি-জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁহার দেশবাসী জানিত, বুঝিত বলিয়াই, কবি তাহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও দেশবাসীর উত্তর-পুরুষ কবিকে সেইরূপেই পূজা করিতেছে।

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিলে পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না,—নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে, কেবল একটী আপন-ভোলা দাম্পত্য জীবনের মধুময় চিত্র! সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে, সে চিত্র কবি-জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণ-বিন্যাসে কবি কল্প লোকের কান্ত আলোকে সদাসমুজ্জ্বল। কবি-বিরচিত এই গোবিন্দ সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয়তীরবর্ত্তী একটী নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দিখতে পাই, প্রেম-মাতোয়ারা কবি-দম্পতী—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে দম্পতী-জীবন প্রণয়-লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে; আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি—কোথায় অজয়! এ যে কালিন্দী! পদ্মার নয়ন-কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে! কেন্দুবিল্ব কোথায়? এ-ত বৃন্দাবন! জয়দেব সরস্বতীর মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী এ তো নয়, এ যে সেই ভুবনমোহন শ্রবণ-মনোরসায়ন মুরলী-নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি,—দেখি, কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায়; মনে হয় মেঘে অম্বর মেদুর হইয়া আসিয়াছে। এক স্নিগ্ধ কৃষ্ণতায় ধীরে ধীরে তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান ভূমিকে ছাইয়া ফেলিতেছে,—শুনিতে পাই, সেই গন্ধে-ভরা অন্ধকারকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কে যেন গাইতেছে—

"* * নন্দনিদেশতশ্চলিতয়ো প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
শ্রীরাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলেরহঃকেলয়ঃ"

রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি

নর্ম্মান বিজয়ঃ—নৃপতি এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে কে অধিরোহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এড্‌গার দি এথেলিং প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার বয়স অল্প ছিল এবং তিনি দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আবার, এডোয়ার্ড মৃত্যুকালে হেরল্ডকে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল কারণে হেরল্ডই এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, নর্ম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম—নৃপতি হেরল্ডের মাতুলের পুত্র। তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবী করিলেন; বলিলেন, এই বিষয়ে হেরল্ড তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এডোয়ার্ডের মৃত্যুকালীন শেষ ইচ্ছা ক্রমেই হেরল্ড রাজা হইলেন। যাহা হউক ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর সৈন্যসহ উইলিয়ম ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। বিখ্যাত সেন্‌লাকের যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হইলেন, ও ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই হেতু তিনি William the Conqueror বা বিজেতা উইলিয়ম এই নামে পরিচিত।

উইলিয়ম যেন এডোয়ার্ড কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজা হইয়াছেন, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বাহ্যতঃ ইংলণ্ডীয় আইন কানুন সমুদায় রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন্ কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তিনি কার্য্য করিতেন। এই বিজেতা নৃপতি প্রথমবার যখন ইংলণ্ড হইতে নর্ম্যাণ্ডিতে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতিনিধিদ্বয়ের কু-শাসনে ইংরাজগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিয়া তাহা নিবারণ করেন। যাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভূসম্পত্তি নৃপতি স্বাধিকারে লইয়া আইসেন।

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করিতে গেলে, উইলিয়ম-প্রবর্ত্তিত জায়গীর প্রথার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন। তিনিই ইংলণ্ডে জায়গীর প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তবে নর্ম্মান বিজয়ের পূর্ব্বে যে ইংলণ্ডে জায়গীর প্রথা বীজাকারে বিদ্যমান ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যৎকালে নর্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয় সংঘটিত হয়, তখন ফরাসী দেশে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। তবে ইংলণ্ডের জায়গীর প্রথা ও ফরাসী দেশের প্রথার মধ্যে বিভিন্নতা আছে। ক্ষুদ্র জোতের মালিকগণ জমিদারগণের অধীনে থাকিলে জমিদারগণের প্রভাব যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে, ফরাসী দেশেই উইলিয়ম তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এই হেতু এবার উইলিয়ম সতর্ক হইলেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে, কি বড় জমিদার, কি ক্ষুদ্র জোতের মালিক, সকল ভূমিপতিকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট সম্মান-জ্ঞাপন করিতে হইবে। এই সম্মান-জ্ঞাপনকে হোমেজ করা বলে। ভূমিপতিগণ হাঁটু গাড়িয়া নৃপতির হস্তদ্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া বলিবেন, 'অদ্যাবধি আমি আপনার ব্যক্তি হইলাম' Je deveigne votre homme। এই homme অর্থাৎ man বা ব্যক্তি শব্দ হইতেই হোমেজ কথার ব্যুৎপত্তি।

এই জায়গীর প্রথার দ্বারা নৃপতির ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু এই প্রথার বহুবিধ দোষও ছিল। নৃপতি প্রজার নিকট হইতে নানা প্রকারে অর্থ আদায় করিতে পারিতেন। এই হেতু উদ্ভূত দোষসমূহ ক্ষালনের নিমিত্ত অতঃপর নৃপতি জনের আশ্রয় জমিদারগণ তাঁহার নিকট হইতে গ্রেট চার্টার বা প্রধান দলিল সম্পাদন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

উইলিয়মের মৃত্যুর পর উইলিয়ম ও হেনরি নামধেয় তাঁহার দুইজন পুত্র যথাক্রমে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতঃপর ষ্টিফেন রাজা হন। প্রথম হেনরির আমলে সম্পাদিত Charter of Liberties বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্দ্বারা বহুপ্রকার অন্যায় কর গ্রহণ প্রথা রহিত হয়; এবং ইংলণ্ডে আইনসঙ্গত প্রজার স্বাধীনতা আছে ও রাজশক্তি সীমাবদ্ধ, ইহাও স্বীকার করা হয়।

ষ্টিফেনের পর প্রথম হেনরির দৌহিত্র দ্বিতীয় হেনরি ইংলণ্ডের নৃপতি হন। তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য ফরাসীর আনজু প্রদেশ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। ইংরাজ প্রজাগণও তাঁহার সবিশেষ অনুগত ছিল। ঐতিহাসিক ষ্টাবস্ বলেন, তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক নৈপুণ্যের গুণে তিনি ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আমলে অনেকগুলি আইন সম্পাদিত হয়। জুরির দ্বারা বিচারের প্রথার তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীনকালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধাদির দ্বারা যেরূপ বিচার করা হইত, এই প্রকারে তৎসমুদায় রহিত হইয়া যায়।

এই পরাক্রান্ত নৃপতির দুই পুত্র রিচার্ড ও জন যথাক্রমে ইংলণ্ডের রাজা হন; এবং দুইজনকেই বিভিন্ন কারণে অপমান ভোগ করিতে হয়। রিচার্ড বহু বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। একবার প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে তিনি অন্য নৃপতি কর্ত্তৃক বন্দী হন। অতঃপর প্রজাগণ বহু অর্থ দিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। আর জনের কু-শাসন যখন চরম সীমায় উঠে, তখন প্রজাগণ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া গ্রেট চার্টার বা প্রধান দলিল সম্পাদিত করিয়া লইয়াছিল।

ইংলণ্ডে সাধারণ ব্যক্তিগণ জমিদারগণের সহিত যোগ দিয়া রাজাকে এই দলিল দিতে বাধ্য করে। শুধু জমিদারগণের নিজ স্বার্থের নিমিত্ত অথবা সাধারণ সম্প্রদায়ের নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ইহা সম্পাদিত হয় নাই। সমুদায় রাজ্যেরই হিতকর ব্যবস্থা এই দলিলের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হ্যালাম বলেন, ইংলণ্ডীয় জনগণের যে স্বাধীনতা রহিয়াছে, এই দলিলই তাহার মূল ভিত্তি। আর্ক বিশপের নিয়োগ লইয়া

মতের অনৈক্য বশতঃ পোপ এই নৃপতির উপর অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর পোপ যখন ফ্রান্সের রাজাকে ইংলণ্ড দখল করিয়া লইতে আহ্বান করেন, তখন জন পোপের মতে মত দেন, এবং বড়ই অপদস্থ হন। অনন্তর প্রজাগণ যখন রাজার কু-শাসনে বিরক্ত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ করে, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি ম্যাগনা চার্টা বা গ্রেট চার্টার সম্পাদিত করিয়া দেন।

উপক্রমণিকায় লিখিত বিষয়টী বাদ দিলে দেখা যায়, গ্রেট চার্টারে ৬৩টী সর্ত্তের কথা বর্ণিত আছে। এই চার্টারের দ্বারা প্রথমতঃ ঘোষণা করা হয় যে, ইংলণ্ডের চার্চ স্বাধীন থাকিবে; চার্চের স্বত্ব ও স্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার স্বত্বাদির ব্যবস্থা হয়। যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়কে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) জায়গীর প্রথার বাধ্যতামূলক কার্য্যসমূহের আলোচনা: প্রজাবর্গের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদায় নিরূপিত হইয়াছে; ইতঃপূর্ব্বে নৃপতিগণ ও জমিদারগণ অর্থলোভে তাঁহাদের অধীন প্রজাগণের বিধবাগণকে পুনরায় পতিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। এই চার্টারের দ্বারা তাহা নিবারণ করা হইল। এই প্রকারে উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে ও অন্যান্য সমুদায় ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণের হিতকর ব্যবস্থা করা হইল।

(২) আইন ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ: গুরুতর অপরাধসমূহের বিচার সাধারণ বিচারকের নিকট হইবে না; নৃপতির প্রতিনিধিগণ এই সব বিচার করিবেন। কোন বেলিফ ভবিষ্যতে রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত মাত্র মুখের কথায় কাহাকেও তাঁহার আইনের অধীনে আনিতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৩) শাসন পদ্ধতির মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধীয়:—প্রজাগণের নিকট হইতে যখন তখন অন্যায় সাহায্য আদায় করা হইবে না। মাত্র তিনটী কারণে সাহায্য লওয়া যাইতে পারিবে—নৃপতির উদ্ধারার্থ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নাইট করণার্থ, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত (মাত্র একবার)। রাজ্যের আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, কারারুদ্ধ করা, নির্ব্বাসিত করা ইত্যাদি হইতে পারিবে না। কাহাকেও তাহার প্রকৃত অধিকার বা রাজকীয় বিচার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(৪) নগর, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক: লণ্ডন নগর ও অন্যান্য নগর বন্দর প্রভৃতি তৎসমুদায় সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইবে। একই প্রকারের ওজনের প্রণালী রাজ্যময় থাকিবে। যুদ্ধকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কোন প্রকার অন্যায় শুল্ক না দিয়া, এবং প্রচলিত শুল্ক দিয়া, বাণিজ্যার্থে যে কোন বণিক ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে, বাস করিতে ও যাতায়াত করিতে পারিবেন, এবং ইংলণ্ড হইতে প্রস্থান করিতে পাইবেন।

(৫) অন্যায় কর বিষয়ক: যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করিয়া না দেয় তাহা হইলে কোন কনষ্টেবল বা রাজকীয় বেলিফ কোন ব্যক্তির শস্য বা অন্য কিছু বিনামূল্যে লইতে পারিবে না। মালিকের সম্মতি ব্যতীত নৃপতি বা তাঁহার কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির অশ্ব বা শকট ইত্যাদি কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত লইতে পারিবেন না। এবংবিধ প্রজাসাধারণের হিতকর বহু বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা হউক, নৃপতি জন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই ম্যাগনা চার্টা বা প্রধান দলিল, এবং ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণের আমলে সম্পাদিত পিটিসন অফ্ রাইট্ ও বিল অফ্ রাইট্স্ ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির মূলভিত্তি স্বরূপ।

নৃপতি জন ২১৩ খৃষ্টাব্দে প্রজাগণকে এই ম্যাগ্না চার্টা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে প্রজাগণ এই যে সুবিধা ও অধিকার সকল লাভ করিল,—ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, অতঃপর বহু নৃপতি কর্ত্তৃক প্রধান দলিলের এই সর্ত্ত সমুদায় সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে কতিপয় নৃপতি মৌখিক সম্মান দেখাইয়া কার্য্যতঃ প্রধান দলিলখানিকে অবহেলা ও অমান্য করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রযত্ন স্থায়িভাবে ফলপ্রদ হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, রাজা তৃতীয় হেন্‌রি কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ ম্যাগ্না চার্টা সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ম্যাগ্না চার্টার প্রবল শত্রু ছিলেন; এবং কার্য্যতঃ তিনি ইহার অবহেলা করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নানা কারণে নৃপতি তৃতীয় হেনরির উপর প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তির প্রতি তিনি বিশেষ ভালবাসা দেখাইতেন। তাঁহার পুত্র এডমাণ্ডের নিমিত্ত শিশিলি রাজ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বহু ব্যয় করিতে থাকেন, বেআইনী কর সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইত্যাদি কারণে প্রজাগণ রাজার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। পরিশেষে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে পার্লামেণ্ট সম্মিলিত হইল। নৃপতি ব্যারনদিগের কথা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে চতুর্ব্বিংশতি জনের দ্বারা গঠিত একটী কমিটী নিয়োগ বিষয়ে নৃপতি সম্মতি দিলেন। কমিটীর হস্তে শাসন-সংস্কারের ভার দেওয়া হইল, এবং কমিটীকে অসীম ক্ষমতাও প্রদান করা হইল। তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিলেন; তৎসমুদায় Provisions of Oxford নামে খ্যাত।

যাহা হউক, ১২৬১ খৃষ্টাব্দে নৃপতি স্পষ্টভাবে বলিলেন, তিনি উক্ত Provisions অনুসারে চলিবেন না। ফলে রাজার সহিত প্রজাপক্ষের সমর ঘোষিত হইল। অবশেষে নৃপতি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং Simon de Montfortএর হস্তে সমুদায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। ইনি রাজার নামে পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেন। পার্লামেণ্টে রাজ্যের সমুদায় অংশ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ প্রথা ইঁহারই দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রতি কাউণ্টি হইতে চারিজন করিয়া সুবিজ্ঞ নাইটকে ইনি আহ্বান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে Simon de Montfortই হাউস্ অফ কমন্সের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত Simon de Montfortএর পার্লামেণ্টের

অনুকরণেই পার্লামেণ্ট আহূত হইত। নৃপতি প্রথম এডোয়ার্ডের আমলে ১২৯৫ অব্দে যে পার্লামেণ্ট আহূত হইল, তাহাতেই যেন নিশ্চিত ভাবে স্থিরীকৃত হইল, পার্লিয়ামেণ্টে তিনটি অংশ আছে, যথা, নৃপতি, জমিদার সম্প্রদায় ও সাধারণ সম্প্রদায়। অনন্তর ক্রমশঃই সাধারণ সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটিতে থাকে। নৃপতি তৃতীয় এডোয়ার্ডের আমলে সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণ রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদের যে অভিযোগ করার ক্ষমতা আছে, ১৩৭৬ অব্দে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই রাজার আমলে সাধারণ সভ্যগণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রায়ই লওয়া হইত। সমর ও সন্ধি বিষয়ে তাঁহারা সতত পরামর্শ দিতেন।

ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশীয় রাজগণের আমলে পার্লামেণ্টের সভ্যগণের নানাবিধ সুবিধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বক্তৃতার স্বাধীনতা ভোগ, গ্রেপ্তার না হওয়া প্রভৃতি অনেক সুবিধা এই সময়েই প্রথম প্রদত্ত হয়। এই নৃপতিগণের আমলে নূতন কোন মৌলিক স্বত্ব পার্লামেণ্ট প্রাপ্ত হয় নাই; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে সমুদায় স্বত্ব পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এই আমলে রক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অনন্তর টিউডর বংশীয় রাজগণের কথা। এই নৃপতিগণের রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দী (১৪৮৩—১৬০৩) পর্য্যন্ত। এই ষোড়শ শতাব্দীতে দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু রাজনীতির অবনতি ঘটিতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বহুল ভাবে পুস্তক প্রচার সংঘটিত হয়; ধর্ম্ম সংস্কারের বিরাট আন্দোলন চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু টিউডর রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতার প্রকোপে পার্লামেণ্টের শির অবনত থাকে। এই বংশের প্রথম রাজা সপ্তম হেনরি বড় অর্থশোষক রাজা ছিলেন। তবে তিনি ধনবান্‌দিগের অর্থ বহুল ভাবে গ্রহণ করাটাই সুবিধাজনক মনে করিতেন। সাধারণের উপর কর স্থাপন না করিয়া প্রায় তিনি এইরূপই করিতেন। তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বকালে সাতবার মাত্র পার্লামেণ্ট আহূত হয়। অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তই পার্লামেণ্ট আহ্বান করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অতঃপর নৃপতি অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজার আমলে পার্লামেণ্ট সতত রাজার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া থাকিত; রাজা পার্লামেণ্টের নাম দিয়া যখন যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই সম্পাদন করাইয়া লইতেন। অনন্তর রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলেও এতাদৃশ স্বেচ্ছাচারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজগণ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, রাজা অষ্টম হেনরির শাসনকালে স্বেচ্ছাচারিতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে প্রজাপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উক্ত বংশের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌এর রাজত্বকালে বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম প্রথম কার্য্যগুলির আলোচনা করিলে অনুমান হয়, স্বেচ্ছাচারী ভাবে তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একবার লণ্ডন যাইবার কালে তিনি আদেশ দিলেন, একজন চোরকে বিনা বিচারে বধ করা হউক। তাঁহার প্রথম পার্লামেণ্ট ভঙ্গের পর ১৬১১ অব্দ হইতে ১৬১৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিনা পার্লামেণ্টে শাসন-কার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তিনি পুনরায় পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই দ্বিতীয় পার্লামেণ্টের স্বাধীন আচরণে রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন। শিষ্টভাষা প্রয়োগের নিমিত্ত চারিজন সভ্যকে কারারুদ্ধ করা হইল। আরও কতিপয় সভ্যের প্রতি অন্যবিধ দণ্ডবিধান করা হইল। অনন্তর যখন তৃতীয়বার পার্লামেণ্ট আহ্বান করা হয়, তখন সভ্যগণ একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। যাহা হউক, জেম্‌স্‌ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করেন। অনন্তর চার্লস্‌ রাজা হইলেন। তিনিও পিতার ন্যায় স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য চালাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পর পনর মাসের মধ্যে দুইবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করা হয়, এবং দুইবারই খামখেয়ালি করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার প্রিয়পাত্র বাকিংহাম এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। প্রজাগণ বাকিংহামের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজা নিয়তই প্রজাপক্ষের রোষবহ্নি হইতে বাকিংহামকে রক্ষা করিতে থাকেন। অনন্তর তৃতীয় পার্লামেণ্টে সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণ তাঁহাদিগের যে সকল চিরন্তন স্বত্ব রহিয়াছে তৎসমুদায় একটী দরখাস্তের আকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইহারই নাম পিটিসন অফ রাইট্‌। প্রজাপক্ষের স্বত্ব সমুদায় এই দলিলের দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লওয়া হয়। প্রথমতঃ রাজা এই দলিলে নিজ সম্মতি প্রদান করেন নাই। অনন্তর যখন সভ্যগণ তাঁহার প্রিয়পাত্র বাকিংহামকে অনুযোগ করিতে যাইতেছিলেন, তখন রাজা সম্মতি দান করিলেন, এবং এই দলিল আইনে পরিণত হইল।

তৎকালে রাজ্য মধ্যে যে সকল অন্যায় অবিচার হইতেছিল, এই পিটিসন অফ্‌ রাইটে তৎসমুদায়ের আলোচনা করা হয়। ঋণ গ্রহণের নাম দিয়া অন্যায় অর্থ সংগ্রহ, যে সব প্রজা ইহাতে অসম্মত হইতেছিল তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার, সাধারণ লোকের স্কন্ধে সৈন্যগণের ব্যয়ভার বহন করান, সামরিক আইনের দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি প্রদান—এই সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করা হয়। যাহাতে এবংবিধ অত্যাচার না হয়, অন্যায় অর্থ সংগ্রহ, সামরিক আইন পরিচালনা ইত্যাদি না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করা হয়। প্রজাগণের যে সমুদায় চিরন্তন স্বত্ব সুবিধা আছে, কোন রাজকর্ম্মচারী তাহা লঙ্ঘন না করিয়া চলেন, ইহাই প্রার্থনা করা হয়। যাহা হউক, এই পিটিসন রফ্‌ রাইটের দ্বারা প্রজাগণের স্বত্ব-সুবিধাসমূহ সুদৃঢ় করিয়া লওয়া হইল।

নৃপতি প্রথম চার্লসের তৃতীয় পার্লামেণ্টে এই পিটিসন অফ্‌ রাইট্‌ আইনে পরিণত হইল। পার্লামেণ্ট্‌ ভঙ্গের পর হইতে রাজা পুনরায় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। আর পার্লামেণ্ট আহ্বান করিবেন না, ইহাই তিনি মনস্থ করিলেন। যে ওয়েণ্টওয়ার্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রজাপক্ষের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি রাজার পক্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ রাজ-সম্মান লাভ করিতে করিতে তিনি Earl of Stratford হইলেন; এবং রাজাকে নানাবিধ কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার অত্যাচার খুবই প্রবল হইতে লাগিল। ষ্টার চেম্বারের দ্বারা বিচার করাইয়া বহু লোককে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইতে লাগিল। শিপ-মনি নামক এক নূতন কর সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। ১৬২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪০ অব্দ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট্‌ আহ্বান করা হইল না। ১৬৪০ অব্দে পার্লামেণ্ট্‌ সভা আহ্বান করিয়া অল্প দিনের মধ্যে রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। ঐ বৎসর পুনরায় পার্লামেণ্ট্‌ আহ্বান করা হইল। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আর ভঙ্গ হইল না। এই পার্লামেণ্টের নাম লং পার্লামেণ্ট্‌। এক্ষণে প্রজাগণের অসন্তোষ চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ১৬৪৮ অব্দে লর্ডগণকে বাদ দিয়া সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ রাজার অত্যাচারের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। অনন্তর কয়েক বর্ষ যাবৎ সিংহাসন রাজশূন্য থাকিল। ক্রমওয়েল প্রজার পক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৬৫৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

এইরূপ ভাবে যে কোন সাধারণ লোকের দ্বারা রাজ্য শাসন করান প্রজাপক্ষ সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। এই হেতু প্রজাগণ ষ্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চার্লস্‌কে রাজা করিলেন। ইহাঁর রাজত্বে কু-শাসন চলিতে লাগিল বটে, তবে মধ্যে মধ্যে হিতকর আইন সকল প্রণীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ ১৬৮৫ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রজাপুঞ্জের চিরন্তন স্বত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন, ইনিও এইরূপ ইচ্ছা করেন। ফলে ১৬৮৮ অব্দে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৬৮৯ অব্দে উইলিয়ম ও মেরির রাজত্বের প্রারম্ভে বিল্‌ অফ্‌ রাইট্‌স্‌ নামক বিখ্যাত দলিল আইন রূপে গণ্য হয়।

এই বিল অফ্‌ রাইট্‌সে প্রথমতঃ নৃপতি দ্বিতীয় জেম্‌সের কৃত অন্যায় অবিচারের বিষয় উল্লেখ করা হয়। তিনি পার্লামেণ্টের মত গ্রহণ না করিয়া আইন সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায় যাঁহারা না মানিয়াছেন তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিয়াছেন, অন্যায় রূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, পার্লামেণ্টের সম্মতি না লইয়া শান্তির সময়ে রাজ্যের মধ্যে সেনা রাখিয়াছেন, বে-আইনী ভাবে সৈন্যগণের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রোটেষ্টাণ্ট্‌ মতাবলম্বীগণের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় সমুদায় আলোচনা করা হয়। অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে—প্রিন্স্‌ অফ্‌ অরেঞ্জ (উইলিয়ম) পার্লামেণ্টের সভ্যগণকে আহ্বান করায়, তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন, প্রাগুক্ত নিতান্ত বে-আইনী, এবং আপত্তিকর কার্য্যসমূহের প্রতিকারের নিমিত্ত ও আইনসমূহের সংশোধন, সুদৃঢ়ীকরণ ও পরিরক্ষণের নিমিত্ত পার্লামেণ্ট্‌ নিয়ত আহূত হইবে ইত্যাদি। অনন্তর বিল্‌ অফ্‌ রাইট্‌সে উল্লেখ করা হয়, উইলিয়ম ও মেরি ইংলণ্ডের রাজা ও রাজ্ঞী হইলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিদের বিষয়ও ইহার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়; এবং অন্যবিধ কতিপয় বিষয়েরও আলোচনা হয়।

ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ম্যাগনা চার্টা, পিটিসন অফ্‌ রাইট্‌ ও বিল অফ্‌ রাইট্‌স্‌—এই তিনটী দলিল ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। প্রজাগণের বহুকাল-লব্ধ স্বত্ব-সুবিধা সুদৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। এই স্থলে য়্যাক্ট্‌ অফ্‌ সেট্‌লমেণ্টের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বিল্‌ অফ্‌ রাইটস্‌ পাশের স্বল্পকাল পরেই Act of Settlement পাশ হইয়াছিল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

টেলিফোণের কথা

বহু দূর ব্যবধান সত্ত্বেও টেলিফোণে কথা চলা'তে, মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে টেলিগ্রাফের ব্যবহার আর থাক্‌বে না। সম্প্রতি জন জে কার্টি (John J. Carty) নামক একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার নূতন ধরণের টেলিফোণ উদ্ভাবিত করেছেন, যদ্দ্বারা তিনি নিউ ইয়র্ক (New York) সহর থেকে বিলাতের লণ্ডন সহরে যে কোনও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবেন। এই

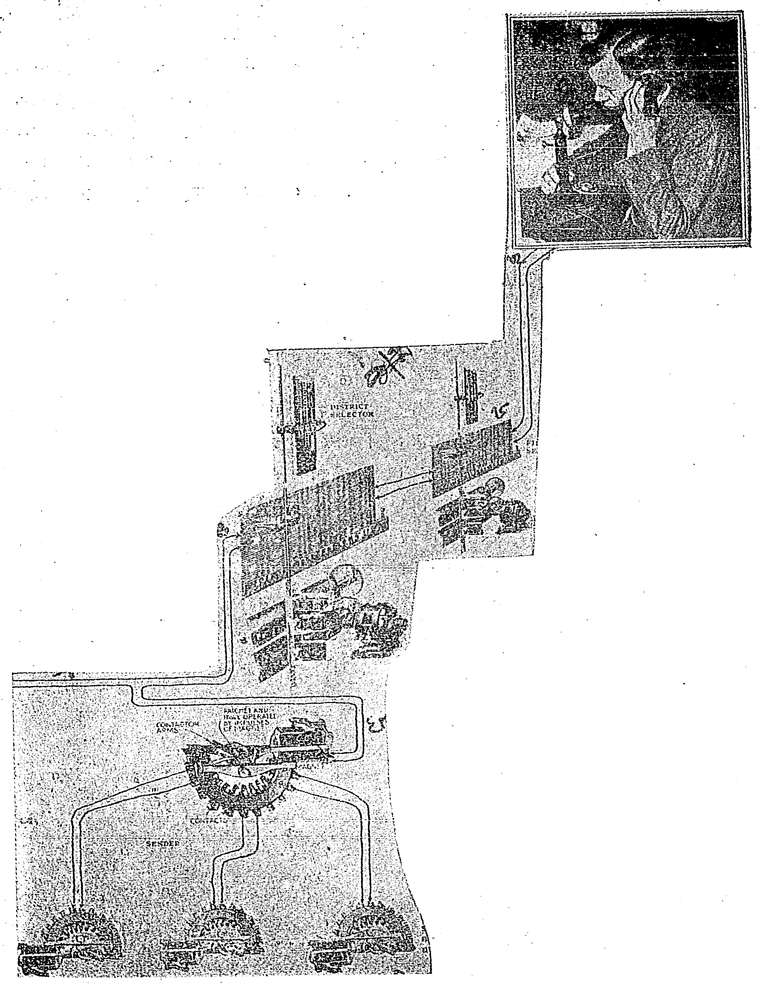

সংবাদ পাঠান। (ক চিহ্নিত স্থান থেকে সংবাদ প্রেরক নূতন টেলিফোণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সংযুক্ত করলে বার্ত্তা খ, গ, ঘ ও চ ছ চিহ্নিত স্থানের ভিতর দিয়ে গিয়ে সংবাদ-গ্রাহককে নিজের আগমন জানায় ; আর সংবাদ গ্রাহক জ চিহ্নিত স্থানের সাহায্যে সংবাদ শ্রবণ করে)

নূতন টেলিফোণের বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে, এতে আহুতের সহিত সংযোগ ক'রে দেবার লোকের কোনও প্রয়োজন নাই, আহ্বায়ক নিজেই নিজের ইচ্ছা মত সংখ্যায় টেলিফোণ সংযুক্ত ক'রে কথা বল্‌তে পারেন।

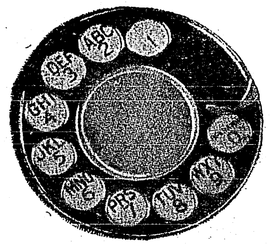

নূতন টেলিফোণের ডায়াল (Dial)

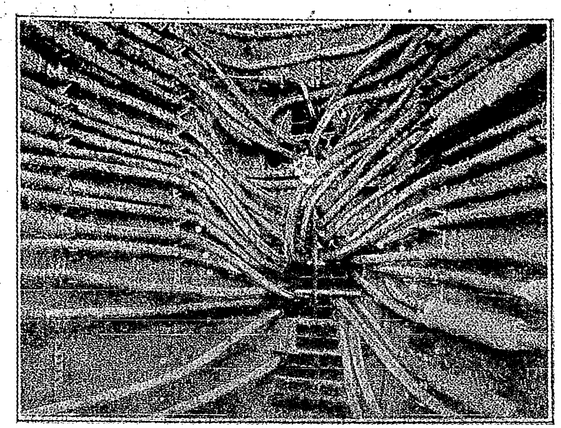

তারের কথা।
(নূতন টেলিফোণের আলমারীর পিছনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তার সংযুক্ত থাকে)

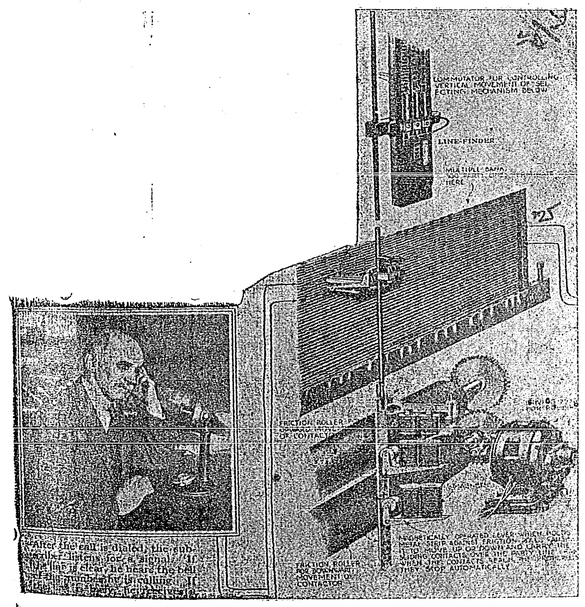

Commutator
(নীচেকার যন্ত্রপাতি সঠিক রাখবার যন্ত্র)

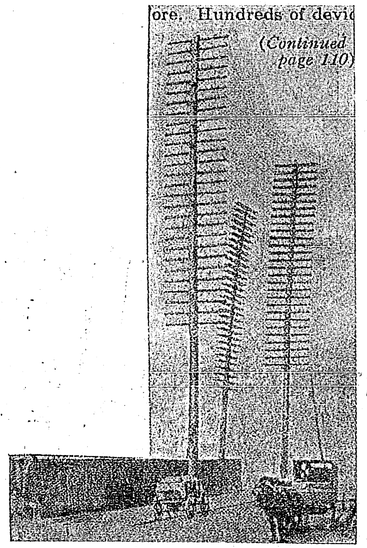

Post
নূতন টেলিফোণের পোষ্ট

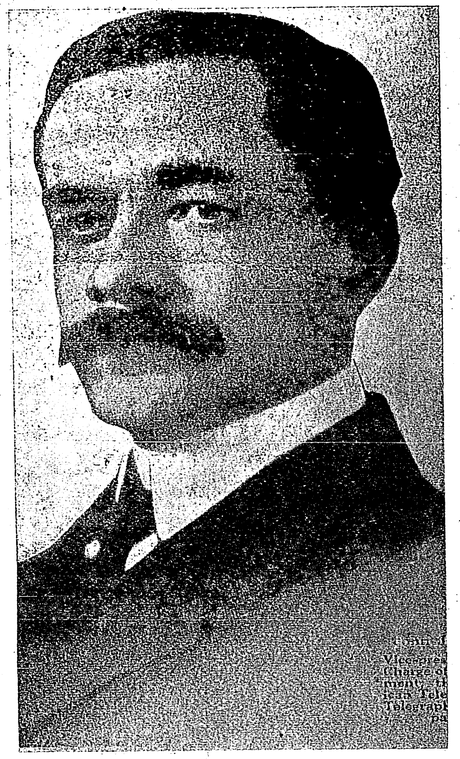

John J. Carty সাহেব

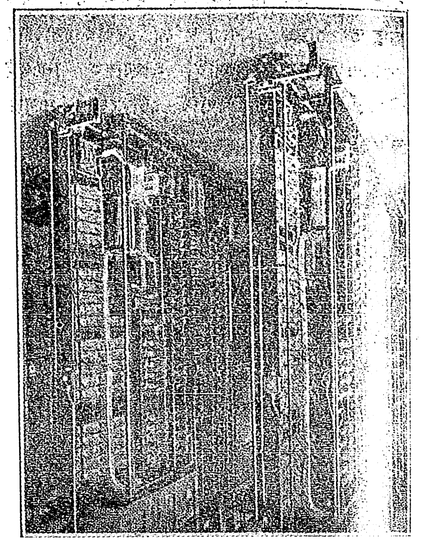

আলমারী

(এই আলমারিতে প্রত্যেক টেলিফোণের সংযুক্ত থাকে। প্রয়োজন হলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সংযুক্ত ক'রে দিলে বাক্যালাপ করা যায়)

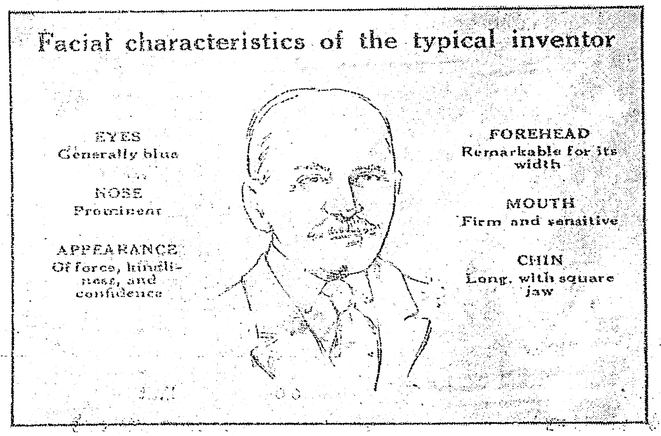

কুমেরু-যাত্রী

পৃথিবীর ইতিহাসে ভূগোলের বিস্তৃতি ও মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি ক'রবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক যে বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, তা' নির্ণয় ক'রা যায় না। স্যার আরনেষ্ট সেক্‌লটন্ (Sir Earnest Shakleton) সেই যে ১৯২১ সালে বিমানপোতে কুমেরু যাত্রা ক'রেছিলেন, বহুকাল অতীত হ'ল তাঁর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ কুমেরুতে তাঁর তুষার-সমাধি

হ'য়েছে। সেকেল্‌টনের পর সেদিন কাপ্তেন আমুন্দসেনেরও জন্ম-বীজ হ'চ্ছে স্বর্ণাদি ধাতু। কিন্তু তাঁর ধারণা সমস্তই সেই অবস্থা হয়েছিল,—তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে অমূলক বলে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন মিচিগান বিশ্ব-

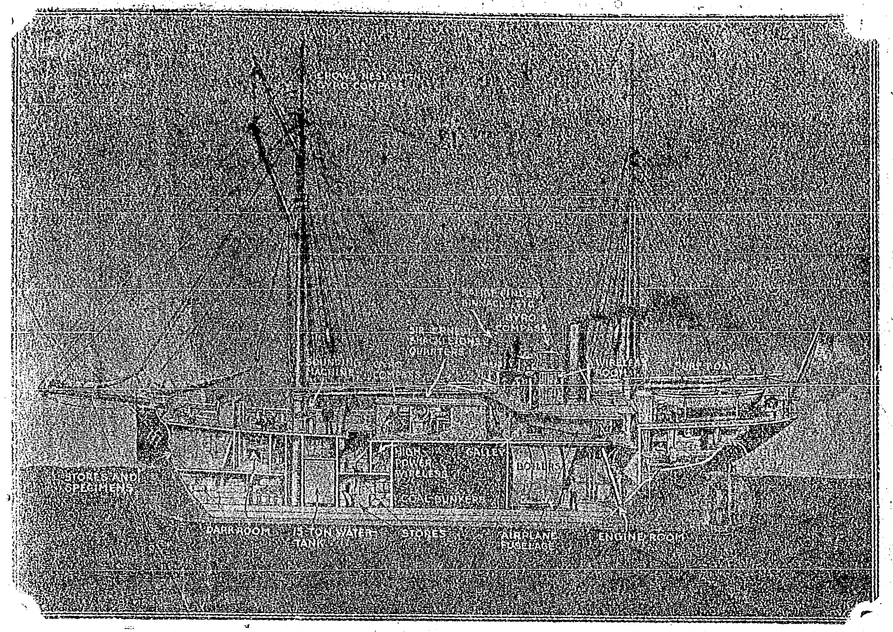

বিমানপোত। (Shakleteton সাহেব এই বিমানপোতে ক'রে কুমেরু-যাত্রা করেছিলেন।)

কিছুদিন হ'ল তাঁর নিরাপদে ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া গেছে।

পৃথিবীর জন্ম-রহস্য

প্রসিদ্ধ ভূততত্ত্ববিদ্ ওয়াশিংটন (Washington) সাহেব তাঁর "ভূততত্ত্বের ইতিহাসে" বলে গেছেন যে, পৃথিবীর আদি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ উইলিয়াম, এইচ, হব্‌স্ (Dr. William H. Hobbes)। তাঁর মতে পৃথিবীর আদি জন্মবীজ হ'চ্ছে লৌহ ও প্রস্তর। লৌহ ও প্রস্তর পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারে নিহিত থাকায় পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছে।

Hobbes সাহেব

Washingten সাহেব

Countstock) নামক একজন বৈজ্ঞানিক নূতন ধরণের এক প্রকার colour camera নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র মধ্য দিয়ে ছায়াচিত্র প্রতিফলিত হ'লে মুখভাবের সঙ্গে মুখের বর্ণ-পরিবর্ত্তনও সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যাবে।

সহরের হাওয়া

বর্ত্তমান কালে আমাদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য হ'বার কারণ হ'চ্ছে, সহরে বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত অভাব। যন্ত্র-রাজ্যের আধিপত্য আর কলকারখানার প্রাচুর্য্য প্রতি দিন এত

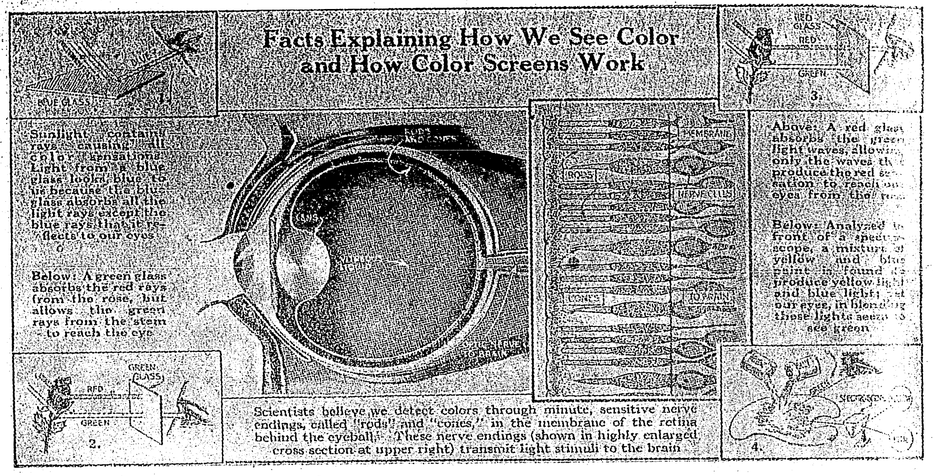

চোখের কাজ

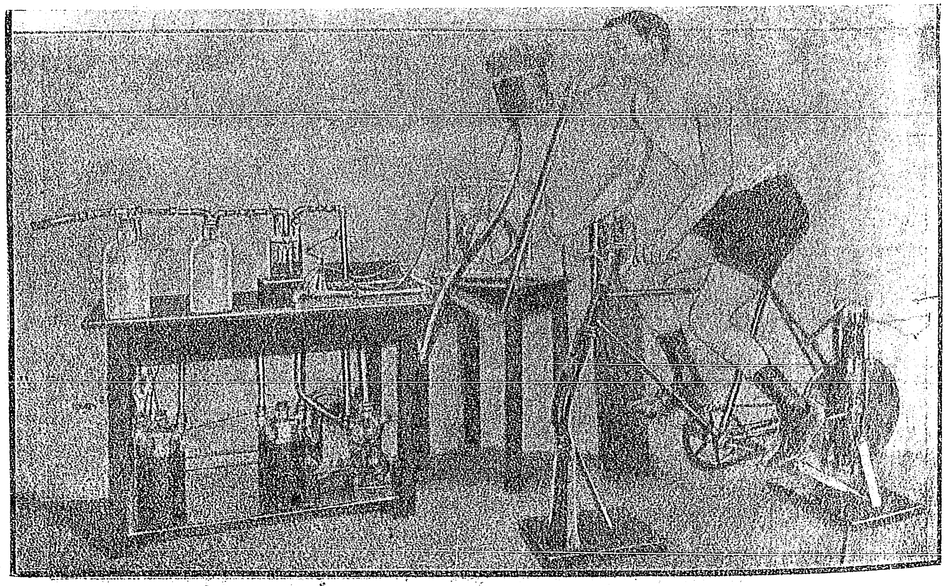

সহরের হাওয়া। (চিকিৎসক এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে থাকেন)

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'চ্ছে যে, সহরের বেশীর ভাগ স্থানই কারখানায় পরিণত হ'য়ে যা'চ্ছে। এই সব কারখানার চিমনী হইতে দিবারাত্রি দুর্গন্ধ ও দূষিত ধূম নির্গত হ'য়ে সহরের সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত ক'রে তোলে। এই বিষাক্ত বায়ু দিবারাত্রি নিশ্বাসের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে সহরবাসীর শরীর দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠে।

কর্ণের ব্যায়াম

একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলেন যে, বধিরতা প্রায় সমস্ত লোকেরই আছে; তবে কাহারও অধিক

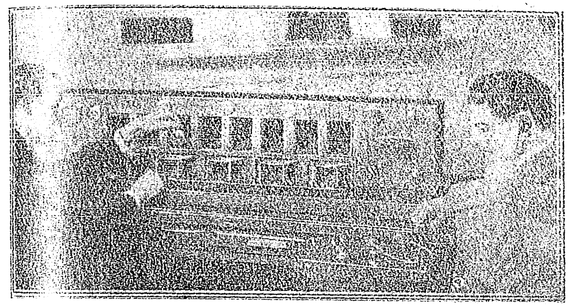

কর্ণের ব্যায়াম (বৈজ্ঞানিক 'কর্ণের ব্যায়াম' ক'রবার প্রণালী শেখাচ্ছেন)

কাহারও বা অল্প। তবে যাঁহারা অধিক মাত্রায় বধির, তাঁদের শ্রবণ-শক্তি বৃদ্ধি ক'রবার জন্য নিয়মিত ভাবে কর্ণের ব্যায়াম করা উচিত; এবং সেই জন্য তিনি এক প্রকার যন্ত্রও আবিষ্কার ক'রেছেন, যদ্দ্বারা অল্পাধিক বধির ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ক'র্‌লে শীঘ্রই নিরাময় হয়ে যায়। কিন্তু যাঁদের শ্রবণ-যন্ত্র একেবারে বিকল হ'য়ে গেছে—তাঁরা এই যন্ত্রে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ক'র্‌লেও কোনও সুফল পা'বার আশা যেন না করেন।

সংগ্রাম বনাম সভ্যতা

সংগ্রাম ও সভ্যতার মধ্যে চিরদিনের জন্য সাম্য থাকা অসম্ভব। আজ যে জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাল সংগ্রামের প্রকোপে সে জাতির সর্ব্বনাশ আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র বিশাল গৌরবের সমাধি হ'য়ে থাকে। শুধু

ক্ষুধায়

সন্তান পালনে

যুদ্ধের পরিণাম

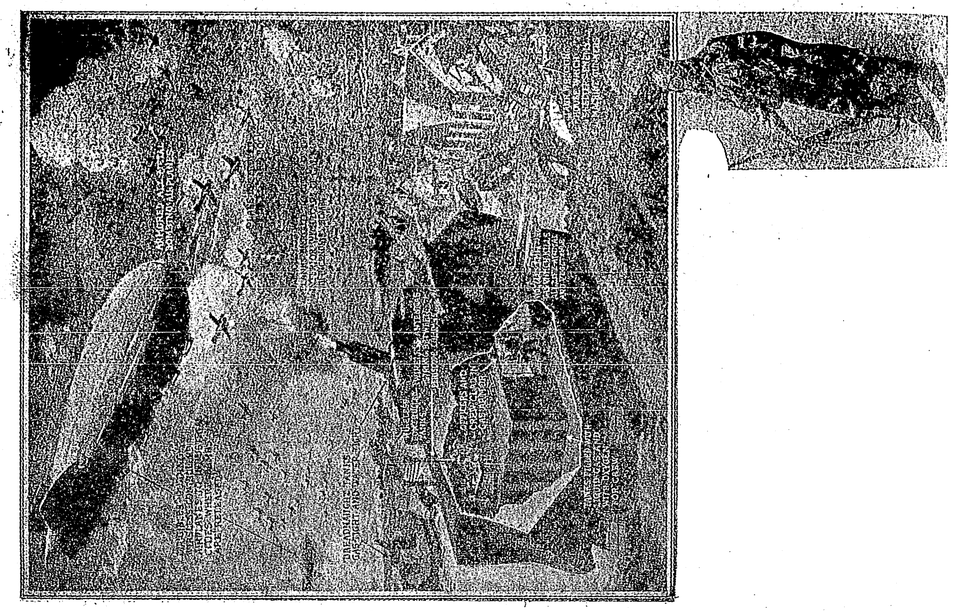

যুদ্ধের আরম্ভ

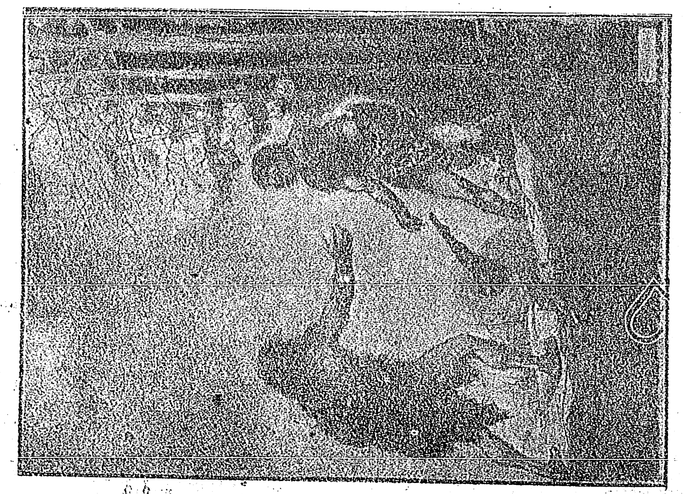

জিঘাংসা

তাই নয়। সভ্যতা আজ যে জাতিকে ধীরে ধীরে বর্ব্বর যুগের মধ্য থেকে আকর্ষণ করে সভ্যতার যুগে এনে ফেলেছে—যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, লোলুপতা, ও বাসনার তাড়নায় সে পুনরায় বর্ব্বর যুগে এসে পড়ে, আর তার উচ্চ-শির হয়ে দাঁড়াবার শক্তি থাকে না। রোমের অবনতি, মিশরের অবনতি এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

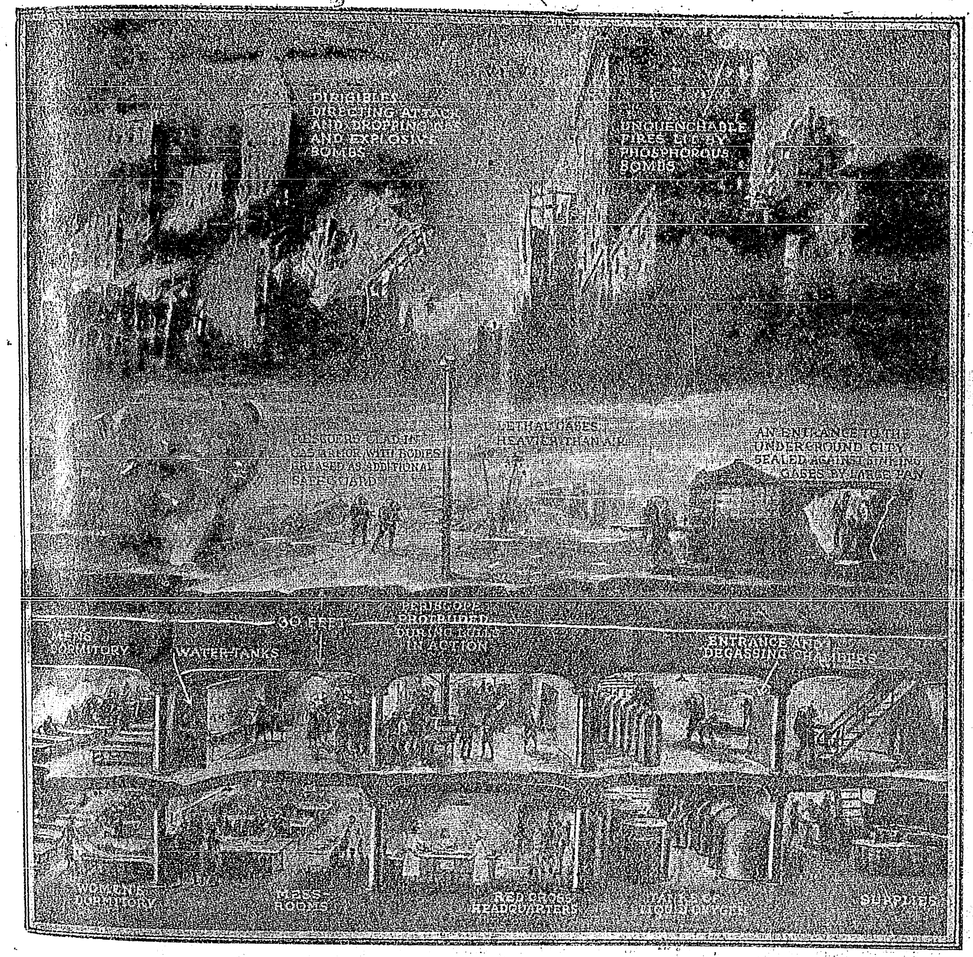

যুদ্ধের মধ্য অবস্থা যুদ্ধের মধ্য অবস্থার পরের অবস্থা যুদ্ধের শেষ অবস্থা

প্রাচীন চিত্রের নব কলেবর

প্রাচীন চিত্রের নবকলেবর (বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রপরীক্ষা ক'রছেন)

অনেক সময় বহু প্রাচীন চিত্র পাওয়া গেলেও সেগুলি নূতন অবস্থায় কিরূপ ছিল তা' বোঝা যায় না। কারণ চিত্রগুলি ধূলায় ও অযত্নে এরূপ বিকৃত হ'য়ে থাকে যে, তা' পরিষ্কার ক'রতে গেলেও প্রাচীন চিত্রটি আবার নষ্ট হ'য়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এম্, ল্যামবার্ট (M. Lambert) নামক একজন নবীন চিত্রকর একপ্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে, ধুলা থাকা সত্ত্বেও, পুরাতন চিত্রগুলি নূতন অবস্থায় কিরূপ ছিল, তা' ধরা যায়; এবং তদনুযায়ী পুরাতন চিত্রে নূতন রং দিয়ে তা'কে পূর্ব্বের ন্যায় নূতন ক'রা যায়।

সাপুড়ে

বিরহী দেওয়ানা

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

(১)

সমস্ত দিন সে নেবুতলার মোড়ে বসিয়া জুতা সেলাই করিত। কত গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্র তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত। কত বর্ষার ভীষণ প্লাবনে তাহার ছেঁড়া কূর্ত্তিটা ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু তাহার প্রাণটা ছিল খুবই উদার। রাস্তায় অন্ধ, আতুর দেখিলে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পয়সা ক'টা তাহাদের বিলাইয়া দিয়া, অনেক দিন সে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিত। তাই অনেকে অনুমান করিত, হয়ত চিরদিনই সে "মুচি" ছিল না। কে একজন বৃদ্ধ ফকির এক দিন বলিয়াছিল—'যৌবনে "বক্তার" খুব আমীর আদ্‌মি ছিল, তাই তা'র "দিল্" অত "পুরু"।'

ইহসংসারে তা'র একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। সে মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল "বেলা"। সমস্ত দিন জুতা সেলাই করিয়া যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিত, তখনই একরাশ বেলফুলের মত "বেলা" তা'র বাপের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেই মুহূর্ত্তে মুচির মনে হইত, যেন সে স্বর্গে আছে। বাস্তবিক মুচির ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না।

নদীর বাঁকে, নির্জ্জন পল্লীপথে, ছোট একখানা মেটে ঘরে, তা'রা বাপ আর বেটীতে, একটা ছোটখাট সংসার পাতিয়াছিল। সে সংসারে, তোমার-আমার সংসারের মত কলহ, কচ্‌কচি ছিল না। সেখানে উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়না ছিল না। মুচির ঘরে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিত। তখনকার দিনের কলিকাতা এত বড় ছিল না। তখন কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগ মাত্র; তখনও গঙ্গার ধারের রাস্তার উপর অনেক মেটে ঘরই ছিল।

(২)

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া স্তিমিত গোধূলির বুকে বিষাদের ছবি আঁকিয়া দিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, তখনও নেবুতলার মোড়ে, দুই একজন বাদসাহী ফৌজ বেড়াইতেছিল। "বক্তার" পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া বাটী ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে মাত্র, এমি সময়ে একজন ওমরাহ গোছের মুসলমান, একজোড়া জরির জুতা সারাই-বার জন্য লইয়া আসিল। "মুচির" কিন্তু মেয়েটার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে আসিয়াছিল, সে যে একজন ওমরাহ, তাই তাহার জুতা না সারিয়া ত উপায় নাই। তাই সে আবার ব্যাগ্‌টা খুলিল। ছেঁড়া কম্বলের টুক্‌রা-খানা বিছাইয়া, গাছের তলায় তাহার মিট্‌মিটে কেরো-সিনের ডিবাটা জ্বালাইয়া লইল। জুতা জোড়ার ছিন্ন স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেমালুম করিয়া ফেলিল। সৌখীন ওমরাহ জুতা জোড়াটা দেখিয়া, আহ্লাদে মুচির হাতে একটা আস্‌রফি গুঁজিয়া দিয়া বিদায় হইল। মুচি, ওমরাহকে সাত সেলাম ঠুকিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

(৩)

আকাশে তখন মেঘ উঠিয়াছে; কড়্ কড়্ শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। মুচির প্রাণের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। নিম্নে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, উপরে অশনিসম্পাত। গঙ্গার ধারে, কাঁচা রাস্তায় যখন সে পৌঁছিল, তখন গঙ্গায় বান ডাকি-য়াছে। "মুচির" ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে একগলা জল হইয়াছিল। মুচিপাড়ার শেষ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তখন ভাগীরথী-বক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। "মুচি" একটা মর্ম্ম-ভেদী চীৎকারে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

(৪)

পলাশীক্ষেত্রে তখন রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। কত আমীর-ওমরাহের তলব পড়িয়াছে; কত ইজারাদার, তহশীলদারের উপর নবাবের পরোয়ানা জারি হইয়াছে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য তখন মুর্শিদাবাদের বড় বড় রাজপথের উপর তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছড়াইয়া দিতেছিল। একজন ওম-রাহ সেই তপ্ত মধ্যাহ্নে, অশ্বারোহণে, পলাশী-প্রাঙ্গণে ছুটিয়াছিল। ওমরাহ যুবক। তাহার দীর্ঘ, উন্নত দেহে

লাবণ্যের লহর খেলিয়া যাইতেছিল। পথের পার্শ্বে সে দেখিল, একটা পাথরের উপর এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছে। তাহার গোলাপী গণ্ডের উপর মধ্যাহ্নের সূর্য্যরশ্মি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। ওমরাহ পথের মাঝে ঘোড়া থামাইল। সুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওমরাহকে কুর্নিশ করিল। ওমরাহের নাম ছিল "হামিদ খাঁ"। হামিদখাঁর মনে হইল যেন কত যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সে ঐ রকম একখানা মুখ কোথায় দেখিয়াছিল। সে মুখ বোধ হয় কোনও যুবতীর ছিল না, বোধ হয় কোনও বৃদ্ধের ছিল। সে বৃদ্ধ কে? কোথায় বসতি? তাহা কিছুতেই তাহার স্মৃতির দুয়ারে উদয় হইল না। সে কত চেষ্টা করিল, কত ভাবিল, কিন্তু সেই যে একটা যুগান্তের বিস্মৃতির কালো যবনিকা, তাহা কিছুতেই অপসারিত হইল না। যুবক সম্মুখের চটিতে যাইয়া পার্শ্বচর হোসেনকে কি ইঙ্গিত করিল। হোসেন ছিল "কাফ্রি খোজা"। সে বড়ই বিশ্বস্ত। "নসির খাঁ" নবাব আলিবর্দ্দীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একে একে অতীত স্মৃতিগুলি সবই মুছিয়া যাইতে লাগিল। পুরাতনের ধ্বংসের বুকে তখন নূতনের আহ্বান আসিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা-গড়ার দিনে মুসলমান ওমরাহ "হামিদ খাঁ", আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজের পার্শ্বে, পলাশীক্ষেত্রে যাইয়া দাঁড়াইল।

(৫)

খোজার হস্তে বিপন্না যুবতীর ভার ন্যস্ত করিয়া "হামিদ" ছুটিল মুসলমানের শেষ জীবন-যুদ্ধের শেষ-রক্ষার জন্য। বাঙ্গলার মসনদ তখন রাজনৈতিক ভূমিকম্পের তাণ্ডব সঙ্ঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। পলাশীক্ষেত্রে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। মধ্যাহ্নের মধ্যপ্রহরে অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা রক্তিম গোলা ছুটিয়া আসিল। দূরে, আমগাছের ফাঁকে একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। কে একজন অলক্ষ্যে থাকিয়া বন্দুক ছাড়িতেছিল। অব্যর্থ তার সন্ধান, একজন ইংরেজ সৈনিক হত হইল, দুইজন আহত হইল। "হামিদের" মাথায় তাহারাই তরবারি তুলিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

যুদ্ধশেষে "ওমরাহ" চটিতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষুদ্র কুটীরের মেঝেতে একখানা কাশ্মীরি শাল জড়াইয়া, রক্তাক্ত-কলেবরে যেন একছড়া রক্ত-করবীর মালা পড়িয়া ছিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে লোহিত রক্তের তরঙ্গ খেলিতেছিল।

ওমরাহ—কি কর্‌লে পিয়ারি!

পিয়ারি—কিছু নয় হামিদ। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে যে কত সুখ, তা' যে বোঝাবার যো নেই প্রিয়তম! এস আমার চিরবাঞ্ছিত, কাছে এস, মনে পড়ে আজ সেই অতীতের স্মৃতি;—তুমি যখন গঙ্গার ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যেতে, তখন ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় একটী ছোট মেয়ে ব'সে থাক্‌ত। মাঝে-মাঝে তুমি তাকে সোহাগ ক'রে গাল টিপে দিতে; খাবার কিনে দিতে। সাম্‌নে দিয়ে ভাদ্রের গঙ্গা তরঙ্গে তরঙ্গে, রঙ্গে রঙ্গে, হাসির লহর তু'লে, উজান ব'য়ে চ'লে যেত। ছোট মেয়েটির বাপ সমস্ত দিন পরে জুতো সেলাই ক'রে বাড়ী ফিরে আস্‌ত। তখন বাপে আর বেটীতে, সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটাকে স্নেহ-বাৎসল্যের করুণ সঙ্গীতে মুখরিত ক'রে তুল্‌ত। তুমি আমাদের সেই স্বর্গীয় সারল্যে মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌তে—"এ রত্ন কখনও মুচির ঘরে জন্মে না; এরা নিশ্চয় ওমরাহের ঘরে জন্মেছে।" বাবা তখন একটু মুচ্‌কি হেসে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তেন; যেন তার কত দিনের ব্যথার বোঝাটা হঠাৎ নূতন ক'রে বুকে চেপে বস্‌ত। তুমি হয়ত ভাব্‌ছ—আমি এত কথা শুছিয়ে বল্‌তে শিখ্‌লুম কোত্থেকে?

হামিদ—এ্যা! তুমি কি বল্‌ছ, রসো, একবার ভেবে দেখি। সে আজ কত যুগের কথা!

পিয়ারি—হ্যাঁ সাহেব। তার পর আমি বানের জলে ভেসে গিয়েছিলাম। বাবা আমায় খুঁজ্‌তে গিয়ে ম'রে গেলেন। "জাফরালীর" নকিব আমায় বাঁচিয়েছিল। সেই থেকে তাঁ'রই ঘরে মানুষ হয়েছিলাম। মহীয়সী "মণি-বেগম সাহেবা" আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাঁ'রই কাছ থেকে আমার লেখা পড়া এবং যা কিছু সামান্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা হয়েছিল। তার পর যেদিন জানলাম.....; যুবতী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হোসেন এক গ্লাস সরাব লইয়া আসিল। সরাব পান করিয়া যুবতী পুনরায় বলিল,—হামিদ, যে দিন জান্‌লাম,

তুমি নবাবকে কত ভালবাস, সেই দিন থেকে মীরজাফরের আশ্রয় ত্যাগ কর্‌লাম; মণিবেগমের স্নেহের ডোর ছিঁড়ে চ'লে এলাম এক অজানার সন্ধানে। গাঁয়ের লোকের সাহায্যে হাতের পুঁজি দিয়ে "গম্" আনিয়ে তাই পিষে বাজারে পাঠিয়ে দিতুম, তাতেই এক রকমে দিন চ'লে যেত। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হ'ত। নবাব মীরজাফরের "হারেমের" সুখ ঐশ্বর্য্যে বেড়ে উঠে, তার পর অতটা কষ্ট! কিন্তু যখনই আমার প্রিয়তমের মুখখানা মনে পড়্‌ত, তখন সব দুঃখ, সব কষ্ট আমার প্রাণে একটা আনন্দের মুক্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে যেত। সে আজ কত যুগের কথা। হঠাৎ তোমায় দেখ্‌লাম জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে। মণিবেগমের বাঁদির সঙ্গে খুবই ভাব ছিল, তা'রই সাহায্যে সেই মহালে যে সব ভাল বন্দুক, টোটা থাক্‌ত, তাই থেকে একটা ভাল বন্দুক আর টোটা নিয়ে ছুটে এলাম তোমার প্রাণ রক্ষা কর্ব্বার জন্যে। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে; আমার সাধ মিটে গেছে। তোমার কাছে আমার ইহজন্মের প্রার্থনা রইল, যেন পরজন্মে তোমাকেই পা'ই।

হামিদ খাঁর চোখ দুটো তখন লাল টক্‌টকে হইয়া গিয়াছে; তা'র বুকের ভিতরের একটা যন্ত্র বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে, "পিয়ারি" "পিয়ারি" বলিয়া পিয়ারিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

একটু পরেই হাকিম আসিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল; ঔষধ দিয়া গেল। কিন্তু "পিয়ারি"র যাত্রা শেষ হইয়া গেল। পলাশীর শেষ গরিমার সূর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হামিদের প্রেম-প্রতিমা অস্তাচলে ডুবিয়া গেল।

(৬)

সন্ধ্যার অন্ধকারে, ব্যথাভরা বুকে, পিপাসিত, আকুল চিত্তে হামিদ যখন একটা মস্‌জিদের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে দেখিল, এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সেই মস্‌জিদের নীচের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। রাস্তার আলোতে তার বড় বড় চোখ দুটা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল,—দেখিয়া মনে হয়, যেন সে এপারের সুখ-দুঃখের কোনই ধার ধারে না। হামিদ তখন শ্রমক্লান্ত দেহ, রণশ্রান্ত মন লইয়া মস্‌জিদের উপর হইতে মর্ম্মভেদী স্বরে ডাক দিল—বক্তার!

সে চমকিয়া উঠিল। এতকাল ত কেহ তাহাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকে নাই। তাহার বক্ষপঞ্জরের ভিতর হইতে কে যেন তা'র ইহ-পরকালের আপনার জনের সন্ধানের আশ্বাস দিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ওমরাহের হাত ধরিয়া উপরে উঠিল। হামিদের অতীত জীবনের কাহিনীটা শেষ হইয়া গেলে, সে "বেলার" কথা বলিয়া গেল। বক্তার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। হামিদ তন্ময় হইয়া বলিয়া যাইতেছিল। যখন তার কাহিনী শেষ করিয়া সে বেলার একখানা পত্র (যাতে তাদের বনেদী বংশ পরিচয়ের কথা এবং তুর্কির বাদসাহের মোহর চিহ্ন ছিল) তাহার হাতে তুলিয়া দিতে যাইবে, সে দেখিল বক্তার তখন সব বলা-কওয়ার পরপারে চলিয়া গিয়াছে। হামিদ দু'চারবার "বক্তার", "বক্তার" বলিয়া চীৎকার করিল, তখন সহরতলীর "ফটক" বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই নিশীথ নিস্তব্ধতায়, অদূরে পলাশীর পথে, একটা শান্ত কবর হইতে কি যেন করুণ সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল।

পরদিন হামিদ পিয়ারির কবরের পাশে "বক্তারের" কবর শেষ করিয়া, সেইখানে অল্প দিনের মধ্যে এক বিশাল মস্‌জিদ তৈরী করিয়া দিল। তার পর সে মক্কা চলিয়া গেল। সর্ব্বধ্বংসী কাল সেই মস্‌জিদের ভগ্ন দেউলে এখন শৃগালের আবাসভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু, এখনও মাঝে-মাঝে দূরাগত পথিক পলাশীর পথে, নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই জীর্ণ মস্‌জিদের মধ্য হইতে কি যেন করুণ সঙ্গীত শুনিতে পায়। কিংবদন্তী বলে,—কোন্ বিরহী দেওয়ানা বুঝি তা'র প্রেমিকের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারারাত, প্রেমসঙ্গীতে, নির্জ্জনে পুঞ্জীভূত ব্যথার বোঝা নামাইয়া রাখে।

নিষ্ফল নিশা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সাঁঝের প্রদীপ-শিখা যেই
একে একে এই
ধরণীর মন্দিরে মন্দিরে—
জ্বলে ওঠে ধীরে ;
গগনের নীল সভাতলে
দলে দলে
তরুণী তারার দল নিয়ে
তালি দিয়ে
যৌবন-উল্লাসে
চাঁদ আসে
জাগিতে বাসর ;
যামিনীর মিলন-আসর
আলো করি রূপে,
অলোক-ঐশ্বর্য্য হারে
আপনারে
ভরি চুপে চুপে,
জ্যোছনা নাচিতে যবে নামে,
নিত্য সে যে থামে
তোমারই এ বাতায়নে এসে,
উঁকি মেরে অতি স্নিগ্ধ হেসে
বলে, এসো সই—
তোমাতে আমাতে আজ প্রাণ খুলে দু'টো কথা কই ;
এস প্রিয় এস আজ
দূরে ফেলে সব লাজ—
ছিঁড়ে ফেলে সকল বাঁধন ;
নিশিদিন অকারণ বুকভরা ল'য়ে এ কাঁদন
কেন মিছে রচিতেছ ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ-খর-ক্ষুধানলে
প্রতি পলে পলে
ব্যাকুল বুকের চারিপাশে
তীব্র তপ্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
তৃষাতুর শুষ্ক মরুভূমি !

জানো না কি তুমি
ওগো বিশ্বপ্রিয়া,
নিখিল বিরহী-জন-হিয়া
তোমারে চাহিয়া
ফিরিতেছে কেঁদে !
তবু কি পাষাণে বুক বেঁধে—
ওগো মম
চির-প্রিয়তম,
মরমের মানসী মধুর,
জীবনে বিমুখ করি চিরদিন রবে হেন দূর ?
প্রেম যে দাঁড়াল' এসে
ভালবেসে
তোমার নিভৃত তরুতলে ;
পরাইয়া দিতে গলে
সে আজি আপন হাতে
মধুরাতে
গাঁথিয়া এনেছে ওলো বালা,
আকুল-বকুল-ফুল-মালা !
প্রতি দিবসের মতো আজও তার বুকে শেল হানি
ফিরাইয়া দিবে কি গো রাণী ?
নিরাধার জন-শূন্য পথে,
লক্ষ্যহীন সে কি কোনও মতে
অসাড় এ জীবনেরে টানি
নিয়ত চলিবে পাছে পাছে ?
এখনও সময় আছে,
এস কাছে,—
উদ্গত আঁখির জল রুদ্ধ করি মর্ম্ম-বেদনায়
জীবনের দিন সই অকারণ বৃথা বয়ে যায় !
সুদিন আসিয়াছিল যত
একে একে নিষ্ফল হইয়া ক্রমাগত
অনন্ত আঁধারে গেছে ডুবে !

হায় শুভে,
মিলন-যামিনী আসে যায়,
সে র'হেনা কারো প্রতীক্ষায় ;
খুলে দে' খুলে দে' বাতায়ন,
কথা শোন্,
ওরে ও অভাগী !
সকাতর আঁখি দু'টি তুলি কেন শুধু ক্ষমা নিস্ মাগি ?
প্রতিদিন বুকভাঙা দুঃখে
ম্লান মুখে
অসিত গুণ্ঠনখানি টানি
এ কোন্ দুর্ভেদ্য ব্যূহে আপনারে ঘেরিতেছ রাণী ?
আঘাত করিয়া যার
অন্ধকার
অবরুদ্ধ দ্বারে
ব্যর্থ হ'য়ে ফেরে বারে বারে
প্রেমের অনন্ত সাধা-সাধি !
তবে কি ও জীবনের যৌবনেই হ'য়েছে সমাধি ?
তাই কি পিঞ্জরে ঘিরে
শৃঙ্খলিত চিত্তটিরে
রাখিয়াছ সদা সঙ্গোপনে
প্রতিক্ষণে
অতি সাবধানে
শাস্ত্রের জটিল জালে আবরিয়া অন্তর শ্মশানে
সর্ব্বলোক-দৃষ্টি-অন্তরালে !
কোনও দিন কভু কোনও কালে
কাহারও চরণ ধ্বনি—করুণ আহ্বান
উদ্বেলিত করি তব প্রাণ
পশিবে না সেথা একেবারে ?
নিষেধ-নিগড়ে নিপীড়িত অসহায় দীর্ণ হাহাকারে
চিরনিশি একা সে কি যাপিবে যামিনী ?
লো সুর-কামিনী,
তা কি কভু হয় ?
সৃষ্টির বিচিত্র লীলা মানবের ছেলে-খেলা নয় ;
বন্যা যবে আসে উন্মাদিনী,
শীর্ণ স্রোতস্বিনী
সহসা হইয়া স্ফীত, উচ্ছ্বসিত মত্ত কুতূহ'লে
দুকূল প্লাবিয়া ছুটে চলে !
তারে কি গো ধ'রে রাখা যায়
পরমার্থ তত্ত্ব দিয়া, স্তূপাকার নীতির কথায়
প্রাণপণে বেঁধে চারিধার ?
নিশ্চিত এ মরণের অনিশ্চিত গ'ড়ে পরপার
উপবাস-ক্ষিণ্ণ কল্পনায়
কে বাঁচে কোথায় ?
তুমি তবে অকারণে চিরদিন রবে বলো কেন
জড় হেন
অচল অটল ?
মাটির-প্রতিমা সাজি প্রাণ-দেবতারে দেবী কোর না বিফল !

* * *

জ্যোছনা মিলায়ে যায়
আপনার রূপের আভায়
নিশান্তে নিদ্রিত চাঁদে চুমি ধীরে ধীরে,
গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া অনুরাগে প্রভাত-সমীরে
প্রণয়িনী সম,
অধীর অধর-প্রান্তে ফুটাইয়া অতি অনুপম
বিদায়ের ক্ষীণ হাস্য-রেখা
ঊষার উদয়-লেখা
গগনের ভালে
দুখ-দীপ্ত দিনের মশালে
ঢেকে দেয় ম্লান শুক-তারা ;
অশান্ত বালক সম বালসূর্য্য চির-ধৈর্য্য-হারা
মুছে দেয় ধরণীর সীমন্তের সমুজ্জ্বল টিপ
রজনীর আনন্দের অনাদৃত আরতি-প্রদীপ
একে একে কেঁদে নিভে যায়
পাণ্ডুর শোভায়
নিভিত যেমতি প্রতি রাতে,
নিবিড় নিষ্ফল বেদনাতে !

নিরঞ্জন

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ক'দিন ধরিয়া খুব চাপিয়া শীত পড়িয়াছে। একটু আগেই চারিদিক নিবিড় কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের বাগানে পাতা-বাহারের গাছগুলি হইতে মুক্তার মত শিশির-বিন্দু তখনো ঝরিতেছিল। বেলা প্রায় আটটা বাজে। দোতালার ঘরে খাটের উপর বসিয়া অমিয় কি লিখিতেছিল···সামনে একখানা খোলা "নিমন্ত্রণ পত্র"। লেখা শেষ হইলে, অমিয় পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়া নীল আকাশের একখণ্ড ছোট শুভ্র সঙ্গি-হারা মেঘের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কখন যে প্রভাত-অরুণের হেমরশ্মি তাহার সোণালী পা ফেলিয়া চুপে চুপে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে খেয়ালই করে নাই।

পাশে টিপয়ের উপর পেয়ালাপূর্ণ চা—চাকর কখন রাখিয়া গিয়াছে, সেই জিনিসটির সদ্ব্যবহার করিবার কথা কেহ তাহাকে মনে করিয়া দেয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহা জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এ সত্যটি সরযূ বিশেষ করিয়াই জানিত। তাই এই আপন ভোলা স্বামীটির ক্ষুধা পাইবার কথাও মনে করিয়া দিবার ভার ইচ্ছা করিয়াই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। এ দায়টি যে নিতান্ত তাহারই, এ কথা তাহার চেয়ে আর কেহ বুঝিত না। সকল কাজের মাঝেও তাহার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি এই ভোলানাথ স্বামীর অভিমুখে সদাই সজাগ হইয়া থাকিত।

সরযূ পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এবং হাতের কলমের একটা দিক দাঁতে কাটিতেছে! নিঃশব্দে খাবারের রেকাব ও জলপূর্ণ গ্লাসটা রাখিয়া যেমন সে বাহির হইবে, অমনি পশ্চাৎ হইতে দুইখানি বলিষ্ঠ পরিচিত প্রিয় হাত তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

"তবে রে দুষ্টু.....ভেবেছিলে চুপে চুপে পালিয়ে যাবে···কেমন?···এখন··· ?"

"লক্ষ্মীটি ছাড়, ছাড়...এখুনি কেউ এসে পড়বে... দরজা খোলা···কেউ দেখ্‌লে ভারি ঠাট্টা করবে...না... সত্যি···উঃ···আঃ—"

সরযূর মুখ বন্ধ হইল। তাহার দেহখানি এখন সম্পূর্ণরূপে অমিয়ের আয়ত্তের মধ্যে দেখিয়া, নিতান্ত অসহায় ভাবে সে কহিল "এমন করলে আর কথ্‌খনো দিনের বেলায় তোমার ঘরে আসব না কিন্তু···খাবার দিয়ে এসে মা আমায় চন্দন ঘষে রাখতে বলেছেন...দেরী হলে কি ভাববেন বল ত?"

সরযূর হৃদয়ের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বুঝি তখন অমিয়ের হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিতেছিল। স্নিগ্ধ পুষ্প-সৌরভপূর্ণ অলকগুচ্ছ শিথিল ভাবে তাহার বাহু-পার্শ্বে দুলিতেছিল, মৃদু সুগন্ধ প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়খানিকে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। অমিয় হাসিয়া কহিল, "মা কি ভাব্‌বেন শুনি?"

উঠিয়া যাইবার কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া সরযূ কহিল, "ভাববেন—কি বেহায়া মেয়ে...তোমার আর কি! ···সব দোষ আমার ঘাড়েই পড়বে!"

মুচ্‌কী হাসিয়া অমিয় বলিল, "মিথ্যা বল্‌তে যখন তুমি নারাজ, তখন সত্যি কথাই বোলো...বোলো যে আমায় ছেড়ে দেয়নি!"

—"আহা কি কথাই বল্লেন!···ঐ কথা মাকে বলা যায়?...পাস্ করলে লোকে বলে বুদ্ধি হয়...ছাই হয়... মাথা হয়···সত্যি ছাড়···কাজ আছে। তুমি খাবারটা খেয়ে নাও, আমি রেকাবীটা নিয়ে যাই।"

"খালি যাই যাই, আর কাজ কাজ! কি তোমার এত কাজ শুনি?...গণ্ডাখানেক ঝি-চাকর রয়েছে, তবু তোমার কাজই ফুরোয় না!...বেস্ বল, আর ক'জন

ঝি-চাকর চাই—আমি না হয় আজই এনে দিচ্ছি!··· প্রাণভরে এক মিনিট যে কথা কইব—"

"এক মিনিট!·····এই বুঝি তোমার এক মিনিট!··· সারা রাত্রেও বুঝি এক মিনিট হয় না!"

অমিয় কহিল, "তা না-ই হোক, তোমায় কাজ করতে হবে না। কাজ করাবার জন্যে তোমায় বুঝি বিয়ে ক'রে এনেছি?"

"না, তা কেন, রাত-দিন তোমার কাছে হাজির থাকলেই বুঝি কাজ হবে!···লোকে তাহ'লে আমায় খুব সুখ্যাত করবে, না?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া অমিয় কহিল, "তাই ত! বেজায় নিন্দা করবে তাহ'লে...আর মুখ দেখাতে পারবে না...কি অপকর্ম্মই কচ্ছ!—"

"যাও, তুমি ভারি ই'য়ে—আচ্ছা, তোমার কি ক্ষিধে তেষ্টাও পায় না?···চা-টাও ত পড়ে আছে দেখছি!"

অমিয় উদাস কণ্ঠে কহিল, "ক্ষিধে-তেষ্টা ত সকাল থেকেই পেয়েছে, কিন্তু তাতে কারই বা কি এসে যায়··· কেউ ত তা দেখবার জন্য এ দিকও মাড়ায় না·····এলেও কাজ আর কাজ, যাই আর যাই....."

"খুব সত্যি কথাগুলো বল্‌ছ, যা'হোক্! কখন থেকে খাবার এনে খোসামোদ করছি, সে কথা কাণেই তুলছ না! ক্ষিধে যে পেয়েছিল, এ কথা একটুও বোঝা যাচ্ছে না!"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "ক্ষিধেটা এখন মিটে গেছে। তোমার ঐ অধরের—"

সরযূ অমিয়র মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "থাক্ থাক্ কবি মশাই!···কবিত্ব রেখে এখন ঐ রেকাবীর দিকে নজর করুন।...জানি না বাবু, কি যে রাত দিন ছাই-পাশ লেখা হচ্ছে! আমি এক দিন টেনে ওসবগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দোব!"

"কেন, ওদের অপরাধ?"

"অপরাধ! অপরাধ ষোল আনা—ওরাই হয়েছে আমার—"

—"বল, বল, ওরা তোমার কি হয়েছে—"

"যাও—আমি জানি না!" একটুখানি থামিয়া সরযূ পুনরায় কহিল "ওরা হয়েছে যেন আমার সতীন!"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "ওঃ! তাই বুঝি এত হিংসে?··· আচ্ছা সরযূ, বলতে পার, মেয়েমানুষের সতীনের ওপর এত হিংসে হয় কেন?···আমাদের যদি সতীন হবার ব্যবস্থা থাকতো, সত্যি বলছি সরযূ, তাহ'লে দুজনে মিলে তোমায় যা ভালটা বাস্‌তাম..."

রাগে অভিমানে সরযূর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল "ফের! ফের...ওরকম বল্লে সত্যি আমি আসব না···কখ্‌খনো না···কথার ছিরি ছাখো!"

"কেন, কিছু অন্যায় বলেছি কি? পুরুষ মানুষ যখন দুটো বিয়ে কর্‌তে পারে, তখন মেয়েরাই বা না পারবে কেন?"

"তাই বুঝি মেয়েদের করতে আছে?"

"নেই কেন?"

—"জানি না বাবু! মেয়েদের কথা, মেয়েরা বুঝবে... তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?.....হ্যাঁ, দেখ, একটা কথা তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি। সবিতার বিয়ের ত আজও কিছু ঠিক হ'ল না!...সবিতা গো!...সেই যে আমার খুড়তুত বোন...তুমি ত দেখেছ তাকে, মনে পড়ছে না?"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "মনে আর পড়ছে না,...খুবই মনে পড়ছে...বিশেষতঃ যখন সম্পর্কে শালি!··· তাতে আবার বেস্ ডাগোর ডোগর!"

"সব সময়েই তোমার ঠাট্টা...শোন...না হলে আমি চলে যাই।"

সরযূর হাত ধরিয়া অমিয় বলিল, "বল, বল।"

"কাকা লিখেছেন, যদি তোমার সন্ধানে কোন ভাল পাত্র থাকে।...বেশী কিছু দিতে পারবেন না...আর ত রাখাও চলে না! দেখতে শুনতে ত আর মন্দ নয়···ঐ রংটাই যা..."

"বেস্ ত, বেস্ ত···আমি ত আর নেহাৎ অপাত্র নই···আর দেখতে শুনতেও যে একেবারে লোহার কার্ত্তিক, এ কথাও তুমি বল্‌তে পার না!···আমার সঙ্গেই কেন হ'য়ে যাক্ না—"

"সব তাতেই তোমার ঠাট্টা—যাও!"

"যেও না, যেও না, সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়···একবার ত একটা মেকা জিনিস দিয়ে—"

"থামো থামো, আর বলতে হবে না···এই মেকীর

জন্যই হেঁটে হেঁটে তোমাদের পায়ের জুতো ছিড়ে গিয়েছিল—"

"সেই জন্যই ত বলছি যে, এবার এমন একজনকে আনা যাবে, যার ওমোর থাকবে না...আর সুন্দর যা, তা ত দেখাই যাচ্ছে...একবার কালই না হয় পরখ করা যাক্।"

"বেস্ ত, বেস্ ত...কর না...সত্যি বলছি, একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর না। সে কত তোমার কাজ করবে...কত সেবা-যত্ন করবে...তোমার ঠিক উপযুক্ত... মনের মতনটি হবে—আমি সত্যি খুব খুসী হব।" শেষের দিকে সরযূর গলা ধরিয়া আসিল।

অমিয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "বড় সাহস দেখছি যে···ভাবছ, আমি বুঝি আর বিয়ে করতে পারি না...কেমন!"

—"কেন পারবে না! পুরুষ মানুষদের ঐখানেই ত বিশেষত্ব।...থাক্ সে কথা! সত্যি···মানুষ কে ক'দিন বাঁচে, সে কথা ত কেউ বলতে পারে না।···ধর, যদি আমি হঠাৎ মরেই যাই, তবু জানব তোমার অযত্ন হবে না!... আমি কিন্তু মেয়ে দেখে দেব!...আচ্ছা···হাঁগা, আমার কথা তা হলে তুমি ভুলে যাবে?" একটা অনিশ্চিত বেদনার আঘাত সরযূর অন্তরে বাজিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার আর্দ্র চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অমিয় ক্ষণকালের জন্যও মনে মনে সরযূর অভাব কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সরযূ, তোমাকে হারাবার কথা মনে হলেই আমার বড় ভয় হয়,···মনে হয়, আমার চারি ধারের আলো যেন নিভে গেছে। কাল রাত্রে যখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে তোমার মুখের ওপর পড়েছিল! সে কী সুন্দর! মনে হল, এই আমার সরযূ, একে যদি আমি হারাই, তা'হলে আমি বাঁচব না! বুকের ভিতর যেন কেমন করে উঠল, তাই তোমায় ঠেলে তুলেছিলুম।"

সরযূ কহিল, "ওমা, আমি মনে করেছিলুম, সকাল হয়েছে বলে তুলে দিচ্ছ!"

"সরযূ, আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না বল?"

"কোথায় যাব? তোমায় ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হবে না? এখন খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি, মা হয় ত আমার জন্যে বসে আছেন!"

অমিয় অনিচ্ছার সহিত সরযূকে মুক্তি দিয়া খাবারের রেকাবীটা টানিয়া লইল। "এখন এত খাব না, বেলা হয়েছে, তুমি কিছু খাও!"

সরযূ হঠাৎ হাসিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যাও, সত্যি, খেয়ে নাও, আমার কাজ আছে।"

"—'যাও' কেন, তোমাদের বুঝি ক্ষিধে পেতে নেই, হাওয়া খেলেই বুঝি চলবে?"

"হাওয়া খেয়ে না চলুক, বেটা ছেলের মতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেলে আমরা—"

"খেতে দিয়ে আবার বদনাম করা হচ্ছে? আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাই, আমি পেটুক, আমি রাক্ষস—"

সরযূ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি সে কথা বলিনি! যাদের যা অভ্যাস, তা না করলে চলবে কেন? এই যে, তোমরা সিগারেট খাও, আমাদের কি তাই বলে খেতে হবে?"

অমিয় সরযূর হাত ধরিয়া কহিল, "এইটুকু খাও; কিছু দোষ হবে না, তার পরে যত কাজ আছে গিয়ে কর..... ও "না না" আমি শুনব না। বেস্, আমিও খাব না..... সত্যি, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, এইটুকু খেয়ে নাও।"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "বেশ মজার লোক ত তুমি,—ক্ষিধে পেলে তোমার, খাব আমি?"

"হ্যাঁ, খাবে তুমি। সত্যি, নাও বলছি; একটা কথা রাখবে না? খাও লক্ষ্মীটি, সেই ফুলশয্যার রাত্রের মত একসঙ্গে—"

"ধেৎ! আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও; তার পর পাতে থাকলে—" অমিয় একটা সন্দেশ সইয়া সরযূর মুখে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "খাও বলছি—"

সরযূ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। অমিয় সন্দেশের অর্দ্ধেকটা মুখে ফেলিয়া দিতেই কহিল, "ওমা, তুমি আমার এঁটো খেলে?"

"তাই ত, জাত গেল যে! কি লোকের বোন—"

"নাও, শিগ্‌গির খেয়ে নাও, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন, আজ তোমাদের কেরানী বাবুদের মতন "মেল ডে" না কি?"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ! এই নাও, পান নাও!"

"এটিও প্রসাদ হয়ে যাক্।"

"না, তাহ'লে ধরা পড়ে যাব! ওরা সব বলবে, বৌ দাদার মুখ থেকে পান খেয়েছে।"

"তা বলুক, তোমায় খেতে হবে!"

"আচ্ছা, এ কি জুলুম বল ত?"

"হ্যাঁ, জুলুমই ত! তুমি যে আমার নিজস্ব! এই তোমার চাঁপার মতন আঙুলগুলি, এই কোঁকড়ান কাল চুলগুলি, এই সুন্দর চোখ দুটি—এ সব আমার! এই যে সরযূ, এ আমার!"

"ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি, আমার কাজ আছে।"

"আচ্ছা, আর পাঁচ মিনিট থাক।"

"পাঁচ মিনিট অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

"না, সত্যি, পাঁচ মিনিট হলে নিশ্চয়ই তোমায় ছেড়ে দেব। দেখছ, ঘড়ীর বড় কাঁটাটা এখানে রয়েছে, এটা যখন সরে এই ঘরটায় আসবে—"

"আমায় বোকা পেয়েছ কি না! সত্যি, ছাড়, কি মনে করছে!"

"আচ্ছা, ছেড়ে দেব, তুমি যদি আর একটি—"

"কি জ্বালাতনে পড়লুম বাপু! আচ্ছা, আমায় ছুঁয়ে দিব্যি কর যে ছেড়ে দেবে!" এমন সময় বাহির হইতে এককালীন চাপা হাসির শব্দে উভয়ে চমকিত ও অপ্রস্তুত হইল! সরযূ বাহির হইয়া গেল!

"তোর মুখে কি লেগে রয়েছে লা বউ? সন্দেশের গুঁড়ো বুঝি? মা যে তোকে দাদার জন্যে নিয়ে যেতে বল্লে? ওমা গালে আবার লাল দাগ কিসের?"

সিঁড়ীর পাশ থেকে কে একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল "ওটা খাজনা আদায়ের চিহ্ন!"

সর সর ভাই, হ্যাঁ রাতদিন তোমাদের ইয়ারকি ভাল লাগে না!" সরযূ নীচে নামিয়া আসিয়া ঘরের ভেতর দেওয়ালে ঝুলানো বড় আর্সির সম্মুখে আসিয়া গামছা দিয়া মুখখানা মুছিয়া শাশুড়ীর নিকট যাইয়া নতমুখে সুপারি কাটিতে লাগিল।

২

অমিয়র ছোট ভাই নীলু কয়েকখানা ডাকের চিঠি লইয়া আসিয়া নকিবের ন্যায় চীৎকার করিয়া এক একখানি পড়িতে লাগিল। শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী—.....সরযূ উন্মুখ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল যদি তাহার কোন চিঠি থাকে। আগের চিঠিতে সে ছোট ভাইটির অসুখের কথা শুনিয়াছিল; সে জন্য কিছু চিন্তিত ছিল। তাহার নাম ডাক হইতেই সে কম্পিত আগ্রহে হাত বাড়াইল। কিন্তু সরযূর চিঠির উপরেই সকলের উপদ্রব চলিত। তাহার ননদ চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইতেই, সরযূর শাশুড়ী বলিলেন "তোরা কি বল্ ত? ওকে তোরা ভারী জ্বালাতন করিস। দে ওর চিঠি! ওঁরা কি লিখেছেন পড় ত মা। সব খবর ভাল ত?"

সরযূ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ···আর দাদার মেয়ের বিয়ে, তাই যাবার কথা লিখেছেন!" কম্পিত আগ্রহে সরযূ শাশুড়ীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাই ত! এই মাসের ২৬ শে আবার হিমুর ভাত দিতে হবে! দুটো কাজই এক সময়ে প'ড়ে গেল যে!"

সরযূর মুখখানি বিষণ্ণ হইল। শাশুড়ী তাহা লক্ষ্য করিয়া বধূকে বলিলেন, "দেখি অমিয়র সঙ্গে পরামর্শ করে, সে কি বলে! তোমার ভাইঝির বে, না গেলে তাঁরাই বা কি ভাববেন!"

সারাদিনের মধ্যে সরযূ অমিয়র দেখা পাইল না। রাত্রে সকলের খাওয়ার পর—সরযূ যখন ঘরে আসিল, দেখিল, অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে মশারী ফেলিয়া স্নেহভরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে তাহার কপালের উপর একটি স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিল।

অমিয় হো হো শব্দে হাসিয়া কহিল, "চুরি করা বড় দোষ!"

"হ্যাঁ, তাই ত, কি চুরি করেছি, কখ্খনো না—এত মিথ্যে কথাও কইতে পার!"

"মিথ্যে কথা হল!..."

"ক'রে থাকি বেশ করেছি!···নিজের জিনিস নিলে বুঝি চুরি করা হয়?···চালাকী!"

"সরযূ তুমি আমায় এত ভালবাস! আমায় ছেড়ে তুমি একটুও থাকতে পারবে?" বাপের বাড়ী যাবার কথাটা মনে হওয়ায় সরযূ একটু চঞ্চল হইল!

"বল না সরযূ!"

"মা লিখেছেন দাদার মেয়ের বিয়ে—যাবার জন্যে!"

"হ্যাঁ, তোমার দাদা আমাকেও লিখেছেন বটে! কিন্তু মা বলছিলেন, যদি হিমুর ভাত দেওয়া হয়, তা'হলে তোমার কি করে যাওয়া হ'তে পারে!"

"বলেছেন তাই? আমি আর কিছু শুনিনি বুঝি? তোমার মতলব আমাকে না যেতে দেওয়া!···তাই বল্লেই হয় স্পষ্ট ক'রে!"

"হ্যাঁ, আমার যে তাতে স্বার্থ আছে!"

"বলতে লজ্জা হল না! এই কটা দিন বুঝি আর একলা কাটাতে পার না? কেবল নিজেদের সুখটাই দেখবে—আমার মনের সুখ দুঃখ কিছুই বুঝি থাকতে নেই? এমন ত কিছু লিখে পড়ে দেওয়া হয়নি যে, এক রাত্রি ঘরে না শুলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!"

অমিয় বিস্মিত ভাবে বলিল, "এ সব কি বলছ সরযূ! আমি তোমায় স্বার্থের জন্যে ভালবাসি! তুমি যাও সরযূ, তোমায় কেউ বারণ করবে না! আমি মাকে বলে কালই তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!" অমিয় পাশ ফিরিয়া শুইল।

সরযূ বুঝিল, কথাটা বড় কঠিন ভাবে বলা হইয়াছে। তাই সেটাকে সরল করিয়া লইবার জন্য বলিল, "কি গো, বড় গম্ভীর হয়ে উঠলে যে! অমন করে চাইছ যে, মারবে না কি?" অমিয়র মুখখানা হইতে যেন সমস্ত রক্ত চলিয়া গেল! সরযূ ঠাট্টা করিতে যাইয়া এ কি অন্যায় ভাবে স্বামীকে আঘাত করিল! সে ইচ্ছা করিয়া এ কথা বলে নাই; কিন্তু তথাপি তেজী ঘোড়া যেমন দুই পা তুলিয়া অগ্রসর হইলে আর পিছাইতে পারে না, সরযূও পারিল না—চুপ করিয়া রহিল!

অমিয় ভগ্ন স্বরে কহিল, "এখনও এত ছোট হইনি সরযূ! জ্ঞান থাকতে যে কোন রকমে বাক্য মন বা কার্য্যের দ্বারা তোমার ওপর অন্যায় করতে পারি, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়? কিসের জন্যে আমায় আজ এতখানি নীচ ভাবলে তা জানি না। আমার চোখের পানে চেয়ে দেখ, আমি কোন নেশা করিনি! আমার মনে হয়, নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে, তা না হলে তুমি সেই সরযূ—তুমি আমায়—" অমিয় আর বলিতে পারিল না!

সরযূ অমিয়র পা ধরিয়া কহিল, "আমায় মাফ কর! আমি না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি! বল, মাফ করলে কি না—চুপ করে থেক না—বল—বল আমায়—তা না হলে আমার মন মানবে না!" অমিয় অভিমানের সুরে কহিল "তুমি ত কিছু দোষ করনি, দোষ আমিই করেছি, তুমি বরং আমায় ক্ষমা কর। আমার মত অযোগ্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি! যদি কোন রকমে তোমায় মুক্তি দেবার উপায় থাকত সরযূ, তাহলে আমি তাই দিতুম! আমার মরণ হলে তোমায় এক নিষ্কৃতি দেবার উপায় আছে—বল—আমি মরলে তুমি সুখী হও?" সরযূ মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি রহিল। অমিয় দেখিল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে! অমিয়র ইচ্ছা হইল সরযূর মাথাটা বুকে টানিয়া লয়; এই মিথ্যা অভিমান—অভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া যায়; কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। অমিয় বলিল, "আমার মতন হতভাগা জগতে নেই, না হলে তোমার মতন স্বর্গের দেবীর ভালবাসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হব কেন? আমি আশ্চর্য্য হই যে, আমাকে স্বামী ভাবতে তোমার মনটা ঘৃণায় ভর্ত্তি হয়ে যায় না কেন? সত্যি, তুমিই বল না—আমার ময়া কি উচিত নয়? তাহ'লে তুমি একটু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে পার! আমি তোমায় বেঁধে রাখতে চাই না সরযূ!"

সরযূ তাহার শান্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া স্থির নিথর ভাবে স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কাঁদনভরা সুরে কহিল, "থামলে কেন, বলে যাও,—যতক্ষণ না তৃপ্ত হও, আমায় দুঃখু দাও,—এ আমার প্রাপ্য! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, না বুঝে অসাবধানে একটা কথা বলে ফেলেছিলুম—তার শাস্তি আমায় ভাল করে দাও! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভাল করে গুছিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে যাও, যাতে আমার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙ্গে যায়! আমার প্রাণে যত লাগুক, তাতে ক্ষতি নাই, তুমি যে তাতে সুখী হবে সেই ভাল!" সরযূ মাথার বালিসটা লইয়া ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া মেঝেয় গিয়া শুইয়া পড়িল। অমিয় গভীর বিস্ময়ে সরযূর পানে চাহিয়া ভাবিল, এ কি হইতে কি হইল! দুই জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র মিথ্যার গায়ে রং ফলাইতেছিল; কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই—তাহারই মধ্য দিয়া কত বড় সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সরযূ যে কথাগুলো এই মাত্র বলিয়া গেল, সেগুলো

তাহার নিজের কথা নয়—সে তাহা ভাল রকমই জানিত! কিন্তু আজ দুই দিন হইল কি একখানি ভাল নভেলে এই কথাগুলো সে পড়িয়াছিল, এমনি একটা অভিমানের পালা—তাহার পর মিলনের মহানদী—তাই সে ভাবিল দেখি, কেমন দাঁড়ায়!

অমিয় সরযূর কাছে গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া কহিল "আমায় ক্ষমা কর সরযূ! চল, বিছানায় শোবে চল!"

"আমি বেশ আছি, আমায় ছেড়ে দাও!"

"আমি মাফ চাচ্ছি, ওঠ, আমায় আর কষ্ট দিও না, লক্ষীটি—তুমি কালই বাপের বাড়ী যেও, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না বলেই...কিন্তু সত্যি তোমার কি আর বাপ মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না! আমি ভয়ানক স্বার্থপর! আমায় এবারটি ক্ষমা কর সরযূ! তোমায় কালকেই পাঠিয়ে দেব!"

"আমি যাব না!"

"যাবে না কেন?"

"আমার ইচ্ছে!"

"এ ইচ্ছে ত এতক্ষণ ছিল না!"

"এখন হল!"

"কি কারণ শুনি?"

"সব জিনিসের কি কারণ থাকে?"

"তবু—"

"আমায় বকিয়ো না—আমার ঘুম পেয়েছে! আমি তোমার দাসী, দয়া করে তোমরা আমায় কিনে এনেছ! কাজেই আমার কোন সুখ সুবিধা থাকতে নেই, থাকা উচিত নয়! এখন যদি দয়া করে অনুমতি দাও, তাহ'লে একটু ঘুমুই—আর না হলে বল তোমার—"

অমিয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, তুমি ঘুমোও সরযূ, কিন্তু মিনতি করছি, বিছানায় গিয়ে শোও!" সরযূ উঠিয়া বিছানায় গিয়া অমিয়র দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল! অমিয় বলিল,—"এই মিথ্যে অভিমানের ঝগড়া করতে গিয়ে মনে হচ্ছে সরযূ, সত্যি তুমি আমার হাতে পড়ে দুঃখ পেয়েই এসেছ! যদি যোগ্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত, তাহ'লে সুখী হতে তুমি! মা বাপ তোমার আপনার, কিন্তু আমার ধারণা ছিল স্বামী স্ত্রীলোকের বেশী আপনার হয়। তুমি আমাকে আপনার ভাবতে পারনি, মনে মনে ভালবাসতে পারনি, তাতে তোমার কোন দোষ নেই! স্ত্রীর কর্ত্তব্য তুমি ঢের করেছ, কিন্তু ভালবাসা ত সত্যি হাত ধরা নয়!" সরযূ দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, এই মিথ্যা কথাগুলোর জবাব দেয়; কিন্তু আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। সরযূ যখন এই তাহা মিথ্যা কথাগুলোর প্রতিবাদে কিছুই বলিল না, তখন অমিয় তাহাকে কথা কহাইবার জন্য নূতন কথা মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। একটু পরে হাসিয়া কহিল, "হয় ত বা এমন কেউ আছে, যাকে আমার চেয়ে ভালবাসতে পারবে—হয় ত বা—"

"কি? কি?—কি বললে?—"

"বলছি, যদি এমন কেউ থাকে, যার জন্য আমায় হয় ত ভালবাসতে—তাতে তোমার কোন দোষ নেই..."

"ওঃ—এমন যার মন সে বিয়ে করেছিল কেন?" সরযূ দুই হাতের মধ্যে মুখ চাপিয়া রাখিল।

"রাগ করলে না কি? সত্যি, ফেরো, তোমায় রাগাবার জন্যে,...আমায় ক্ষমা কর!" অমিয় সরযূর হাত দুটো সরাইয়া একটী চুম্বন করিল!

"আঃ সর—"

অমিয় আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। চুপ করিয়া রহিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে অমিয় দেখিল, সরযূ পার্শ্বে নাই! দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখে, সরযূ মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহার চোখের কোণে অশ্রুর দাগ তখনও শুকায় নাই! সেই ম্লান মুখখানির দিকে অমিয় মুগ্ধ ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সরযূ চোখ চাহিয়াই দেখে, অমিয় একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দুয়ারের দিকে চলিয়া গেল! অমিয়র ইচ্ছা হইল ডাকে, কিন্তু সরযূ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। অমিয় উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ কাটিয়া গেলে, একটি ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকিতেই, অমিয় সচকিতে মুখ ফিরাইল! বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "এখানে কি?"—কণিকা ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "মামীমার কাপড়—" অমিয় আলনা হইতে একখানা সাড়ী লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, "যাঃ, বেরো!"—সরযূ সিঁড়ীর পাশে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইতেই

সরযূ হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল। কিন্তু পরক্ষণেই অমিয়র চটি জুতার শব্দ পাইয়াই দ্রুত নামিয়া গেল। অমিয় সিঁড়ীতে জলের ছিটা ও পায়ের ভিজা দাগ দেখিয়া জানিল, সরযূ আসিয়াছিল, কিন্তু ঘরে যায় নাই! তাহার মন ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইল। সে বাহিরের ঘরে আসিতে, একটি স্ত্রীলোক, তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমিয় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "আবার কি চাও?" স্ত্রীলোকটি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিল, "বাবা, আপনার দয়াতেই ছেলেটা প্রাণে বেঁচেছে; কিন্তু বাবা, হাতে একটি পয়সাও নেই, ওর পথ্যির জন্যে—তাই বউমা বলেছিল—"

অমিয় বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছু মিলবে না, যাও।" সৈরভী ঝি আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে দরজার পাশ হইতে হাত নাড়িয়া ডাকিল, এবং নিকটে আসিলে কহিল, "বউমা ডাকছেন—"অমিয় ঘরে আসিয়া দেখিল, সরযূ বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিতেছে। সরযূ অমিয়র পাশ দিয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং স্ত্রীলোকটির হাতে দুটি টাকা দিতে, সে বলিল, "মা, তোমার দয়া—" সরযূ বাধা দিয়া কহিল, "এখন যাও, আবার এস।" উপরে ঘরে আসিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই, অমিয় গম্ভীর ভাবে ডাকিল, "শোন—এমন ভাবে সকলের সামনে আমায় অপমান না করলে হত না?"

সরযূ গভীর বিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "আমি তোমায় অপমান করলুম? কেউ মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলে অমঙ্গল হবে, তাই—"

"অমঙ্গল হয় আমার হবে—তোমার ত হবে না, তোমার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই—"

সরযূ স্বামীর দিকে ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, "স্পষ্ট এসব বলতে মুখে আটকাচ্ছে না? উঠতে বসতে আমায় এমন করে বিঁধছ কেন বল ত? আমি কি করেছি—" সরযূ আঁচলে চোখ মুছিল!

"তোমাদের ওই ত প্রধান অস্ত্র!" সরযূ কোন কথা বলিল না। সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই অমিয় কহিল, "শোন, কথা আছে—" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সরযূ কহিল "তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই! আমি তোমার শত্রু, আমি তোমার কেউ নয়; তোমার অমঙ্গল হলে আমার কিছু ক্ষতি হয় না, আরও যা বল তাই—" চক্ষে আঁচল দিয়া সরযূ চলিয়া গেল।

৩

আজ কয়দিন ধরিয়া দুই জনের কথা বন্ধ! অমিয় ঘরে থাকিলে সরযূ সহজে সে ঘরে আসিত না। যদি বা কোন দরকারে তাহাকে আসিতে হইত, তাহা হইলে অমিয়র দিকে পিছন ফিরিয়া আলমারী খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া চলিয়া যাইত। আর কেহ যে সে ঘরে আছে বা তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিয়াছে, এমন কোন চিহ্নই সরযূর মুখে প্রকাশ পাইত না। অমিয় ইহা লক্ষ্য করিত এবং দুঃখ ক্ষোভ ও রাগে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিত। নিজের দুর্ব্বলতাকে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া জেদের বশে সেও মুখ ফিরাইয়া লইত! এমনি মান-অভিমান, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দুই জনের দিন কাটিতেছে। সরযূর ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্য কোথাও শয়ন করে। কিন্তু তাহাতে বাড়ার সকলে কি বলিবে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়া সে মেঝের উপর আলাদা বিছানা পাতিয়া শয়ন করিত। তাহার শাশুড়ী ও বাড়ীর দু'তিন জন মেয়ে সরযূর মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিল, যেন কোথায় একখানা বড় মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে; আর তাহারই ছায়া আসিয়া চিরহাস্যময়ী সরযূর মুখটি মলিন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সরযূ সে কথা স্বীকার করে নাই—হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সরযূ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অমিয় ঘুমাইতেছে। সে অমিয়র ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, না, সে আর এমন করিয়া অমিয়র কাছ হইতে তফাৎ হইয়া থাকিতে পারিবে না! সে যে স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও জানে না! তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয় যেন এখনি জাগিয়া উঠে; জোর করিয়া তাহার সর্ব্ব গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয়, দুইখানি বলিষ্ঠ বাহুর.....ঘুমের ঘোরে অমিয় একটু নড়িয়া উঠিতেই সরযূ চমকিয়া দেখিল, সে একেবারে বিছানার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়াছে! সে সরিয়া আসিল। ছিঃ ছিঃ! অমিয় কি ভাবিবে! নারীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে

কত দিন সে স্বামীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছে... কিছুতেই, কোন মতেই তাহা স্বীকার করে নাই। আর আজ—সরযূ আর ভাবিতে পারিল না—ধীরে ধীরে মেঝেয় আপনার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

৪

কয়দিন হইল হারাণ বাবুর পত্নী বিমলা কন্যা সবিতাকে লইয়া অমিয়দের বাড়াতে আসিয়া রহিয়াছেন। যে দিন সরযূ অমিয়কে সবিতার জন্য পাত্রের সন্ধান করিতে অনুরোধ করে, অমিয় সেই দিনই তাহার শ্বশুরকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল যে, সবিতাকে তাহাদের বাড়ীতে দুই চারি দিনের জন্য পাঠাইয়া দিলে, সে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিবে। বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে পাত্রপক্ষকে 'কনে' দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা দরকার। হারাণ বাবু তদনুসারে স্ত্রী-কন্যাকে জামাতৃ-ভবনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন হইলে তিনি স্বয়ং কর্ম্মস্থল হইতে দিন কয়েকের ছুটী লইয়া আসিয়া কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

সবিতা খুব সপ্রতিভ মেয়ে। সে ভগিনীপতির গৃহে পদার্পণ করিয়াই সরযূকে প্রায় বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। স্বামীর প্রতি সরযূর মন এখনও প্রসন্ন হয় নাই। সে পূর্ব্বের মত স্বামীর সকল কাজ নিজ হস্তে করিতে আর তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। সুচতুরা সবিতা এ বাড়ীতে আসিয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং সরযূর পরিত্যক্ত কর্ম্মভার নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছিল। ভগিনী আসা অবধি সরযূ স্বামীর সঙ্গে প্রয়োজন বুঝিয়া দুই একটা কথা কহিত—নচেৎ, সবিতা কি মনে করিবে! কিন্তু মনে যা করিবার তা সবিতা অনেক আগেই করিয়া ফেলিয়াছিল; তবে সরযূ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

৫

সে দিন সকালবেলা অমিয় নিজের ঘরে বসিয়া তাহার চিরাভ্যস্ত লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। সরযূ তাহার আলমারি খুলিয়া একরাশ কাপড় চোপড় বাহির করিয়া তাহা পুনরায় গুছাইয়া আলমারীতে তুলিতেছিল। এমনি সময়ে এক হাতে চায়ের পেয়ালা আর অপর হাতে জল-খাবারের রেকাবী লইয়া সবিতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ আমি অন্য কাজে যোড়া ছিলুম, তাই আপনার চা আর জলখাবার আনতে দেরী হয়ে গেল।..... তা দিদি, তুমিই কেন জামাইবাবুর চা-জলখাবারটা এনে দিলে না?"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "তোমার জামাইবাবু এখন তোমার দিদির সতীনকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন কি না, তাই তোমার দিদি এদিকে ঘেঁসবেন না!"

অমিয় ঠাট্টা করিয়া কথাটা বলিলেও সবিতার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, অমিয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথাটা বলিয়াছে। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যান্—কি যে ঠাট্টা করেন!"

স্বামীর কথা শুনিয়া সরযূও চমকিয়া উঠিয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সবিতার লজ্জারক্ত মুখের ভাব তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অমিয় দেখিল, সবিতা তাহার কথা উল্টাভাবে বুঝিয়াছে। বস্তুতঃ সে এখন সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া সতীন কথাটি ব্যবহার করে নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে সরযূ যে তাহার লিখিত কাগজপত্রগুলিকে সতীন আখ্যা দিয়া সেগুলি পোড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়াই, তাহার কাগজপত্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই, সে এখন সতীন কথাটি ব্যবহার করিয়াছিল। তাই সে সবিতার ভ্রম সংশোধনের জন্য তাড়াতাড়ি কহিল, "তোমার দিদির সতীন কে, তা জান না বুঝি! তোমার দিদিকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ না—উনি কি বলেন? কেমন গো, তুমি কাকে তোমার সতীন বলে পোড়াতে চেয়েছিলে, বলে দাও না তোমার বোনকে!"

সরযূ অমিয়র এই কৈফিয়তের এক বর্ণও বিশ্বাস করিল না, কোন কথাও কহিল না, শুধু কেবল উভয়ের দিকে একটা তীব্র রক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আবার গম্ভীরভাবে কাপড় চোপড় গুছাইতে লাগিল। দিদির কাছ হইতে কোন জবাব না পাইয়া, কতকটা আত্মরক্ষার জন্য, সবিতা অমিয়কেই প্রশ্ন করিল, "দিদির সতীন কে জামাইবাবু?"

অমিয় তাহার লিখিত একগোছা কাগজ হাতে তুলিয়া লইয়া, সবিতার দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া কহিল, "এই এরাই গো—এরাই তোমার দিদির সতীন! বেচারীদের

ওপর ওঁর এমন রাগ যে উনি এদের অগ্নিসৎকার করতে চেয়েছিলেন।"

সরযূ যে রাগিয়াছে তাহা অমিয় বুঝিতে পারিয়াছিল এবং বিলক্ষণ কৌতুক বোধ করিতেছিল। তাহাকে আরও রাগাইবার জন্য সে সবিতাকে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু তুমি নিজে কি মনে করেছিলে বল দেখি?"

সবিতা লজ্জায় আবার রাঙা হইয়া উঠিল। কোন জবাব তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অমিয় তখন হাসিতে হাসিতে কহিল, "না, সত্যি,—তোমার জন্যে পাত্রের সন্ধান করবার ভার নিয়েছি বটে, কিন্তু তেমন সুপাত্র ত চোখে পড়ছে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, আর বাইরে খোঁজাখুঁজির দরকার কি। তুমি যখন এ বাড়ীতে এসে পড়েছ, তখন এইখানেই থেকে যাও। কেন, আমি কি নেহাত অপাত্র? কি বল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?"

সরযূ তাহার হাতের কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া উভয়ের দিকে আর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সবিতা ভয় পাইয়া কহিল, "কি করলেন জামাইবাবু! আপনার কি একটু বিবেচনা নেই—অমন করে ঠাট্টা করতে আছে?"

অমিয় কহিল, "ঠাট্টা চিরকালই ঠাট্টা,—তাতে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার দিদি ঠাট্টা বোঝে না—তাই ওর অল্পেতেই বড় রাগ হয়।"

সবিতা কহিল, "আপনি দিদিকে এখনও ভাল ক'রে চিনতে পারেন নি। নিন, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেয়ে ফেলুন" বলিয়া সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

রাত তখন প্রায় তিনটা—হঠাৎ কি একটা শব্দে অমিয়র ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে দেখিল সরযূ পাশে নাই। তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; কিন্তু সে মনে করিল, সরযূ হয় ত কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছে—এখনই ফিরিয়া আসিবে। এই ভাবিয়া সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। কিন্তু মিনিট দশ বারো কাটিয়া গেল, অথচ সরযূ এখনও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে কোলাহল, ছুটাছুটির শব্দ ও একটা গোঙানির অস্পষ্ট আওয়াজ তাহার কাণে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জননীর কণ্ঠস্বরে সে শুনিল, "ওরে অমিয়, ওঠ—ওঠ, বৌমা যে পুড়ে মোলো!"

"কি হয়েছে মা" বলিতে বলিতে তড়াক করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া অমিয় দেখিতে পাইল, দালান পার হইয়া ওদিককার একতলার ছাদে প্রচণ্ড একটা অগ্নিশিখা, এবং বাড়ীশুদ্ধ লোক সেই ছাদে আসিয়া জমা হইয়াছে!

সাময়িকী

দুর্গোৎসবের পর হিন্দুর প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমরা 'ভারতবর্ষের' গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও লেখক মহোদয়গণকে বিজয়ার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করি, আজ দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল তাঁহাদের নিকট হইতে যে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে অধিকতর নববলে বলীয়ান করুক।

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনামধন্য মনীষী, বারিষ্টার-প্রবর, পরলোকগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়। বাঙ্গালীর মধ্যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রদান করিবার জন্য যে দুইটী যুবক প্রথম বিলাত গমন করেন, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতর; তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। ঠাকুর মহাশয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন; কিন্তু দেশের সৌভাগ্যক্রমে মনোমোহন ঘোষ মহাশয় উক্ত

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া বারিষ্টার হইয়া এদেশে আগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার অসাধারণ প্রসার হয়; ফৌজদারী মোকদ্দমায় তিনি কত আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মনোমোহন ঘোষ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা দেশমাতৃকার সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, মনোমোহন ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। এখনও লোকে তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষের নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করে। আমরা 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার দেশহিতৈষণা, তাঁহার দরিদ্র-বাৎসল্য ও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

পূজার পূর্ব্বে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতি অনেক দিন পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিকগণের ঔদাসীন্যে এই সমিতি এত দিন মৃতবৎ অবস্থায় ছিল। বঙ্গীয় মুসলমানগণের এ ঔদাসীন্য যে বড়ই গর্হিত কার্য্য, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহারা এই সমিতিকে সঞ্জীবিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষার উন্নতি সাধন তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিছুতেই আমল দিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে পারে না। কিন্তু, তাঁহাদের এ মত সহৃদয় মুসলমান যুবকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সেবার দ্বারাই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বন্ধন দৃঢ় হইবে, তাঁহাদের মধ্য হইতে হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হইবে, তাঁহাদের জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা মুসলমান সাহিত্যিক ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেই হইবে। আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যে অল্পসংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। মুসলমান সাহিত্য-সমিতির চেষ্টায় আরও অধিক সংখ্যায় মুসলমান যুবকগণ মাতৃভাষার সেবায় অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে, আমরা তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সেইজন্য কবির ভাষায় বলিতেছি

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষাকে অধিকতর ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মহাত্মা সার আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন কেবল পরীক্ষারই ব্যবস্থা হইয়াছিল, এম-এ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছিল; আর প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ প্রভৃতিতে পরীক্ষার সামান্য ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলিলেই হয়; কোন কোন কলেজে সপ্তাহে এক কি দুই ঘণ্টা বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। ছাত্রেরাও বাঙ্গালা শিক্ষার দিকে তেমন মনোযোগ দিতেন না, এমন কি অনেকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্তও কিনিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে পঠিতব্য অধিকাংশ বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং এখনও যাহাতে বিদ্যামন্দির-সমূহে যথারীতি বাঙ্গলা সাহিত্য পঠনের ব্যবস্থা হয় তাহাও করিয়াছেন। এখন আশা করা যাইতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মন বাঙ্গালা শিক্ষার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যের গোল এখনও মিটে নাই। পরলোকগত সার আশুতোষের

সময় হইতে যে গোল আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে। যত গোল ঐ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ লইয়া। তাহারই ব্যয় অধিক, এবং সেই অত্যধিক ব্যয়ভারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রপীড়িত। এই ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য এবং উক্ত বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার জন্য একটী প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইয়াছিল। সেই সভার অধিকাংশ সদস্য উক্ত বিভাগের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই, ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধেও তেমন কিছু করেন নাই। উক্ত প্রতিনিধি-সভার অল্পসংখ্যক সদস্য অধিকাংশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা যথেষ্ট ব্যয়-সংকোচের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ দিকে বাহিরেও দুইটী দল হইয়াছে। অধিকাংশ সদস্যের অভিমত অনুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকা স্থায়ী সাহায্যের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অপর পক্ষ বলেন, এত টাকার কোন প্রয়োজন নাই; বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক অধ্যাপককে বিদায় করিয়া দিলেও উক্ত বিভাগের শিক্ষার কোন অসুবিধা হইবে না, ব্যয়ও কম হইবে। এই দুই মতের মাঝখানে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তাই, তাঁহারা পূজার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে দারজিলিংয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। আলোচনাও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে কোন মত প্রকাশিত হয় নাই। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ আশা করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের যে ব্যয়-সংক্ষেপ প্রয়োজন এবং উচ্চশিক্ষার সংকোচ-সাধন না করিয়াও যে ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, এ কথা আমরাও বলি। দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ভ্রম-সংশোধন—বিগত সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' 'সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভ্রম আছে; তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছি। (১) ৬২৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমে ৫ম ছত্রের পরে 'মাল্লগুলে' কথার পরিবর্ত্তে 'সাল্মগুলে' হইবে। (২) ৬২২।৬২৪।৬২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'জটার দেউল' 'বাইষ হাটার মঠবাড়ি' প্রভৃতি ছবির নিম্নে 'জাতের দেউল' 'বৈশাটা হইবে। (৩) ৬২৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেবী মূর্ত্তির নিম্নে 'দেবী কালীমাতার পরিবর্ত্তে 'দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী' হইবে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত আত্মানুসন্ধান; ।০ আনা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল প্রণীত বৈষ্ণব সাহিত্য; মূল্য ॥০

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত দেশবন্ধুর বজ্রবাণী মূল্য ॥০

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চীনের জুজু মূল্য—প্রত্যেক খানি ৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী প্রণীত পরীর দৃষ্টি—মূল্য ।৵০

স্বামী সদাশিবানন্দ প্রণীত ৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মূল্য ৸০ আনা।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত ছায়ানট—মূল্য ১।০

শ্রীমতী সুধাদেবী প্রণীত ভুলের কারসাজী; মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী প্রণীত 'স্ত্রীর অধিকার'; মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেব প্রণীত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—মূল্য ৶০

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্রোহী; মূল্য—১।০

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দুনিয়ার দান; মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা; মূল্য—১।০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস মূল্য—৪৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত শিকার ও শিকারী—মূল্য ২৲ টাকা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA

কচ ও দেবযানী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেনচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works